প্রকাশক :
শ্রীসুনীল ঘোষ এম. এ
পপুলার লাইব্রেরীর পক্ষে
১৯৫/১ বি, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেসন (প্রাঃ) লিমিটেড
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,
কলকাতা-৬

অগ্নিযুগের অজানা কাহিনী

উৎসর্গ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকদের
প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে "অগ্নিযুগের অজানা
কাহিনী" গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হল।

সূচী

প্রথম পর্ব : স্মৃতিচারণ ১—২১৬

প্রথম পর্ব

স্মৃতিচারণ

স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা

শ্রী সুকুমার মিত্র

গান্ধীজী যেদিন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন সেদিন আসমুদ্র হিমাচল উত্তাল হয়ে উঠল। বাঁধ ভেঙ্গে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহরে নগরে গ্রামে গঞ্জে। "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে সমস্ত দেশ কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল যশোর জেলাও। আমি তখন সম্মিলনী ইনিশষ্টিটিউশনে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি। যশোর শহরে যখন আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল দলে দলে ছাত্ররা গোলামখানা (মহাত্মা গান্ধী তখন সমস্ত স্কুলকেই গোলামখানা বলতেন কারণ লেখাপড়া শিখে সকলেই সরকারের গোলাম হবে) ছেড়ে বেরিয়ে এল। আমরা অনেকে তখন গোলামখানা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলাম। সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন জাতীয় বিদ্যালয়। আমরা সেই বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। আমার দিদিমা (শ্রীযুক্তা সৌদামিনী ঘোষ) সম্মতি দিবেন একথা জানাই ছিল। কারণটা এখানে বলে নেওয়া দরকার। দেশপ্রেমের ঐতিহ্য ছিল দিদিমা ও দাদামশায়ের দুই পরিবারেই। দাদামশায় (শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ) স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাহেব সুবাদের তিনি আমলেই আনতেন না। অ্যানটি সার্কুলার সোসাইটির নেতা শচীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে (পরে সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের জামাতা) তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পুলিশ কড়া নজর রেখেছিল এবং বিপ্লবীদের তিনি সাহায্য করেন সন্দেহ করে তাঁর বন্দুক ও রিভলভার কেড়ে নেওয়া হয়। দিদিমা যে পরিবারের মেয়ে সে পরিবারেও দেশপ্রেম ছিল দৃঢ়মূল। জাতীয় কংগ্রেস যখন মহিলা প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে যোগদেবার অনুমতি দেয় তখন যে মহিলা প্রতিনিধিরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন দিদিমার দিদি ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি স্বাগত ভাষণ দেন। তাঁর এক কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী (আমার চামী মাসিমা) এবং প্রভাত গাঙ্গুলী (আমার জংলী মামা) একাধিকবার কারাবরণ করেন।

আমি দিদিমার কাছেই মানুষ হয়েছিলাম। কাজেই দেশপ্রেমের আবহাওয়া আমাকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত করে। জাতীয় বিদ্যালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় শতাধিক। নানা অঞ্চল থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা কাজে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যতীন সেনের ভ্রাতা বীরেন সেন (পরবর্তী কালে ইউ. পি-র পদস্থ কর্মচারী), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এঁর কাছেই সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি)। ইনি একটি সাহিত্য সভা গঠন করেন। সেখানে সাহিত্য আলোচনায় যোগদেবার আমি আমন্ত্রণ পেতাম। আমি সভায় একদিন রবীন্দ্র সাহিত্যে দেশপ্রেম নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। প্রবন্ধটি পরে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দিদিমার দোতালা বাড়ীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হলে আমাদের পড়াশুনা খেলাধুলা ব্যবস্থাদির খুব সুবিধা হয় কারন, বাড়ীর সামনে খোলা মাঠ। সেখানে বড় বড় জনসভাও অনুষ্ঠিত হত।

যাইহোক আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে দিদিমা ও তাঁর কন্যারা সক্রিয় ভাবে তাতে অংশ নেন। দিদিমা তাঁর শেষ সঞ্চয় কয়েক হাজার টাকায় খদ্দরের কাপড় গামছা ইত্যাদি তৈরী করার জন্য দুটি তাঁত কেনেন এবং আন্দোলনে যোগদানকারী কয়েকজনকে তাতে নিয়োগ করে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সস্তায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। চৌরিচোরার (u.p) ঘটনার পর গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় দিদিমারও প্রচুর ক্ষতি হয়। যার জন্য শেষ জীবনে খুব কষ্টে পড়তে হয়েছিল। এই সময় বিদ্যালয়ও উঠে যায় এবং আমরা আবার সম্মিলনী স্কুলে ভর্তি হই। জাতীয় বিদ্যালয় বর্তমান থাকার সময় দিদিমা শিক্ষকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে মা বলে ডাকতেন।

এদিকে আবার আন্দোলন শুরু হলে পুলিশ সুপার এলিসনের অত্যাচার চরমে ওঠে। তারই প্রতিবাদে আমাদের বাড়ীর পাশেই কংগ্রেস ভবনের প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশের চক্রান্তে জনসভা ভেঙ্গে যায় এবং পুলিশ এই লেখককে গ্রেপ্তার করে। আমি এই সময় কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তাম। ছুটিতে যশোরে গিয়েছিলাম। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়িয়ে ফেরার সময় একজন খবর দেয় 'সাবধান' এখনই আত্মগোপন কর, পুলিশ যাকে পারছে ধরছে। তখন আমরা থানার সামনে আমার বন্ধু গোবিন্দ কুণ্ডুদের দোতালায় লুকিয়ে থাকি। থানা সামনেই—দেখলাম অনেক লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে থানার প্রাঙ্গণে ঢোকাল। তারপর চলল প্রচণ্ড মারপিট, চিৎকার

ও আর্তনাদে ভরে গেল শহর। সমস্ত শহর আতঙ্কে নিস্তব্ধ। অনেক রাতে আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালম। চলতে চলতে মনে পড়ল কয়েকদিন আগে আমরা পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে হাটে বাজারে দোকানে দোকানে পুলিশের কাছে কোন জিনিষ বিক্রি না করার আবেদন জানিয়ে ছিলাম। খুব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় দুই তিন দিন অর্ধসনের পর পুলিশ নতি স্বীকার করে আপস করার কথা ভাবে। ভূধর হালদার খুব নিরীহ মানুষ। এরা ভেবেছিলেন বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে এনিয়ে সাংঘাতিক কিছু করতে পারে। তাই তিনি দারোগাবাবুদের কাছে আপসের ব্যাপারে মধ্যস্থতার কথা বলেন। দারোগাবাবুরা রাজী হন। তখন কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গনে উভয় পক্ষের বৈঠক বসে। ভূধর বাবুর প্রস্তাব মত পুলিশ আর অত্যাচার করবে না বলে কথা দেয়। কংগ্রেস নেতারাও বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। আমাদের দাদারা এতে দারুণ চটে গিয়ে দিদিমাকে খুব তাতিয়ে বৈঠকে নিয়ে যান। দিদিমা তখন খুব উত্তেজিত। তিনি ভূধর বাবুকে ডেকে বলেন 'পুলিশ জুলুম করবে আর তুমি তাদের খাবার যোগানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ। তোমার লজ্জা করে না। তোমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেওয়া উচিত।' পথে যেতে যেতে বুঝলাম আজ পুলিশ তার বদলা নিয়েছে। নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার পায়ের জুতোর শব্দ শুনেই দিদিমা দরজা খুলে বললেন "ভিতরে আয়, এই কিছুক্ষণ আগে পুলিশ এসে তন্নতন্ন করে তল্লাসী করে চলে গেছে। আমরা প্রথমে দরজা খুলতে রাজী হইনি। তারপর একজন ভদ্রলোক বললেন "আমি বাইরের লোক পুলিশের সঙ্গে এসেছি সঙ্গীরূপে। আপনাদের কোন ভয় নাই। দরজা খুলুন"। তখন দরজা খুলি। দিদিমা আরও বলল গোয়েন্দা এমদাদ হোসেন (এমদাজ হোসেন নাকি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় খুব কেরামতি দেখিয়েছিল তাই তাকে যশোরে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বময় কর্তা করে দিয়ে এবং প্রকৃত গোয়েন্দা বড়কর্তা জ্যোতিষ সেন কে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছিল) ইংরেজ অ্যাসিসটেন্ট পুলিশ সুপার আর কয়েকজন পুলিশ এসেছিল। দিদিমা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কথাই বলতে পারছিলেন না। তোর জামা কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করে তুই কোথাও পালিয়ে আছিস। আমি বললাম পালাবে কেন। বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। গোলমাল দেখে হয়তো অন্য কোথাও রয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না করে ওরা সারা বাড়ী তল্লাসী করে। পরদিন শহরের উকিল, মোক্তার সব ঘটনা জিজ্ঞাসার জন্য আমাদের বাড়ী এসে হাজির হলেন।

সব শুনে তারা দিদিমাকে বললেন— আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা থাকতে আর কোন উপদ্রব হবে না।

সকলেই সরকারের খয়ের খাঁ। জর্জ ম্যাজিসট্রেট পুলিশ সুপারের সঙ্গে দহরম মহরম আছে। কাজেই উপদ্রব বন্ধ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু দিদিমা তাঁদের কথায় আশ্বস্ত হলেন না। পরদিন আমাকে বললেন "সামনে তোর বি. এ পরীক্ষা। তুই চলে যা। আর তোর মাকেও নিয়ে যা।" বুঝলাম আমাকে ও মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে এই ভয় তাঁর হয়েছে। দিন দুই পরে আমি মাকে (শ্রীযুক্তা নলিনীবালা বসু, যাঁকে আমি ছোটবেলা থেকে মা বলে জানতাম) নিয়ে কলকাতা চলে গেলাম। মাকে ছোট মাসিমার (শ্রীযুক্তা বকুলবালা সিংহ) বাড়ী গ্রে ষ্ট্রীটে রেখে আমি বোর্ডিং এ চলে গেলাম। বি. এ পরীক্ষা পাশ করে এক বছর পরে যশোরে পা দিলাম। দিদিমা এ সময় বাড়ীতে একা ছিলেন।

যখন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হলাম তখন গান্ধীজীর আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। তখন আমি কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছি। সেই সময় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। রাধারমন মিত্র, মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ নেতাদের বিবৃতি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়ে নানা দেশের ইতিহাস পড়ে আমি বুঝতে পারি দেশ স্বাধীন না হলে কমিউনিজম প্রচার সম্ভব নয়। ১৯৩২ সালে গান্ধীজীর তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে তখন আমি আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করি। কয়েকদিন পরে আমার সহপাঠী জীতেন ঘোষ (তখন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা পরবর্তীকালে খ্যাতনামা আইনজীবী) আমার বোর্ডিংএ এসে বলে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩২) এ বি এস এ (অল বেঙ্গল স্টুডেণ্ট এ্যাসোসিয়েসন)-র ডিকটেটররূপে আইন অমান্য করার জন্য তারা আমাকেই বেছে নিয়েছে। আমি তখনই রাজী হলাম। আশুতোষ হলের চার তলায় ছাত্র আন্দোলনকারীদের আড্ডাছিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলা ৯টার সময় সেখানে হাজির হয়ে শুনলাম সারা শহর খাঁ খাঁ করছে। ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে, পথে পথে পুলিশ বাহিনী টহল দিচ্ছে। আমি হাজির হওয়া মাত্রই সহপাঠীরা এবং অন্যান্য ছাত্ররা হৈ হৈ করে স্বাগত জানাল। একজন কাশ্মীরী সহপাঠী (নাম ভুলে গিয়েছি, তার বাবা বড় মিলিটারি অফিসার ছিলেন) খুব ভাবপ্রবণ ছিল। সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বলল

"সুকুমার ইউ উইল নট কাম ব্যাক। দে উইল শুট ইউ ডাউন"। অনেক কষ্টে তাকে থামিয়ে আমি আমার চারজন সঙ্গী (সকলেই ছিল বোধহয় যাদবপুরে টেকনিকেল স্কুলের ছাত্র) দ্বারভাঙ্গা ভবনের ছাদ টপকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে গেটে দেখা দিল এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুলিশ সাহেব। সে সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে পারত না। তাই সে সেনেট হলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে পুলিশদের নিয়ে আমাদের ঘেরাও করে জিজ্ঞাসা করল "হু দা লিডার"। আমি বললাম—আই অ্যাম দ্য লিডার। "ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট" বলেই আমাকে পুলিশ ভ্যানে ঢুকিয়ে থানায় (বোধহয় জোড়াবাগান) পাঠিয়ে দিল। থানায় একটা ঘরে আমাকে আটকে রেখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গোয়েন্দাদের কাছে নিয়ে যেতে লাগল। জেরা চলল—কোথায় আড্ডা, বাবার নাম কি ইত্যাদি। আমি আজে বাজে কথা বলে তাদের সব জেরা ভণ্ডুল করে দিলাম। রাত্রিটা কাটিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জোড়াবাগান কোর্ট হাজতে যা আদতে নরককুণ্ডু, চোর ডাকাত গুণ্ডাতে ভর্তি। যেখানে সেখানে তারা থুতু ফেলছে ইত্যাদি। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার উপায় নাই। সেদিনই মামলা দায়ের হল, আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লালবাজার লক আপে। সেটা আরও জঘন্য। আমার সঙ্গীদের সেখানে দেখিনি। পরদিন কোর্টে হাজির করা হল। আমি সঙ্গীদের আগেই বলে রেখেছিলাম যে আমরা কখনও শপথ গ্রহণ করব না। কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি বললাম "যে সরকারকে আমি মানি না তার আদালতে শপথ গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।" বিচারক খস খস করে লিখে ফেললেন ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড। সি ক্লাস প্রিজনার। সেদিন বহুলোকের বিচার শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল। আমাদের এক দলকে ভ্যানে তুলে পুলিশ প্রেসিডেন্সি জেলে যখন হাজির করল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমাদের একটা হলে ঢুকিয়ে দিয়ে জানানো হ'ল রাতের খাবার মিলবে না। আগে থেকে কোন খবর দেওয়া হয়নি তাই রাত্রিটা উপোস করে কাটাতে হল। সকালে মুখ হাত ধোওয়ার পর পাওয়া গেল ছোলা ও গুড়। তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে প্রকাণ্ড গেট, কিন্তু সে গেট দিয়ে ঢোকানো হল না। পাশের একটা ছোট গেট দিয়ে কোন রকমে মাথা নিচু করে আমরা একে একে ঢুকলাম। সেখানে জেলের লোকেরা এসে আমাদের হাতে তুলে দিল সাদা কাল বর্ডার দেওয়া হাফ-প্যাণ্ট,

কাপড়ের ঢিলে ফতুয়া ও একটা করে পাতলা তোয়ালে। জামা কাপড় খুলে ঐ পোশাক পরে আমরা কয়েদী বনে গেলাম। দেখলাম আমাদের জামা কাপড়, হাতঘড়ি, পেন নিয়ে এক একটা প্যাকেট তৈরী হল ও তাতে নাম ঠিকানা লিখে রাখা হল। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল উঁচু লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা বড় একটা চত্বরে যার সামনে বড় একটা বাড়ী। রেলিং এর গেট খুলে আমাদের চত্বর পার করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটা হলের মধ্যে। তখন শীত ছিল। তাই প্রত্যেককে দেওয়া হল দুটো করে কম্বল, খাওয়ার জন্য একটা করে এলুমিনিয়মের থালা ও বাটি। জেলের এই ওয়ার্ডের নাম্বার ভুলে গেছি। বিকেল হয়ে গেছে। খাওয়ার পাট চুকিয়ে আমাদের আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হল হলের মধ্যেই। হলের গেট বন্ধ করে সিপাইরা চলে গেল। নজর রাখার জন্য একজন থাকল। সারা দিনের ধকলের পর ঘুমিয়ে পড়তে দেরী হল না। তবে রাতে ঘুমের ঘোরে পড়ে যাওয়ায় (শোওয়ার সিমেন্টের গাঁথা যায়গা অত্যন্ত সরু) আর ঘুম হল না। পরদিন সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সারার পর আমাদের সকলকে হলের বারান্দায় এনে এক বাটি লপসি (ডাল চালে ঘাঁটা খিচুড়ীর মত) সি-ক্লাশের কয়েদীদের ও চা বিস্কুট বিক্লাশের কয়েদীদের দেওয়া হল। প্রায় একমাস পরে আমাদের একদলকে হিজলী স্পেশাল জেলে পাঠান হল। গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত আমাদের জানালো যে হিজলী যারা যাবে তারা ভালই থাকবে। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম তিনি কিছুই জানেন না। এর তিন দিন পর আমাদের ৪০ / ৫০ জনকে সিপাইদের পাহারায় খড়্গপুর যাওয়ার ট্রেনে তুলে দেওয়া হল। খড়্গপুর পৌঁছে প্রায় দেড়মাইল হাঁটিয়ে হিজলী জেলে নিয়ে যাওয়া হল। দেখলাম কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া একটা মাঠের মধ্যে সারি সারি আট চালার মত ঘর একটি মাত্র দালান বাড়ী এবং তার পরেই ডেটিনিউদের মস্ত দোতলা বাড়ী। আমাদের একটা বড় কুটীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ঢোকা মাত্রই একজন সিপাই, একজন মোটা হিন্দুস্থানী হাবিলদার, দুজনে আমাদের মাথায় ঘাড়ে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে চিৎকার করে বলতে লাগল "হিজলী মে বিজলী ছুটইবা হ্যায় ইয়াদ রাখিয়ে"। বুঝলাম আমাদের এমন একটা জেলে আনা হয়েছে যেখানে যখন তখন লাঠি গুলি চলতে পারে। ইঙ্গিতটা বেশ স্পষ্টই। কারণ রাজবন্দী সন্তোষ মিত্রকে এখানেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ মনুমেন্টের পাদদেশে বিশাল জনসভায় সরকারকে দৃপ্তকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা—

"বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা,
সবই কি বৃথায় যাবে
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?"

লাঠি চার্জের পর আমাদের সারবন্ধ করে জেলের মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর প্রায় উলঙ্গ করে তল্লাসীর পালা। জানলাম জেলার অত্যন্ত বদমেজাজী ও বাজে লোক। তার বাড়ী ফরিদপুরে। তাকে দেখেই বুঝলাম সরকার একজন উপযুক্ত লোকের উপরে এই জেলের দায়িত্ব দিয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা দেখিয়েছে এই জবরদস্ত খয়ের খাঁটি তাদের কি করে সায়েস্তা করতে হয় সে বিদ্যাটা বেশ আয়ত্ত করেছিল। তল্লাসী শেষে আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল ২৪ নং ওয়ার্ডে। সামনে বেড়া দেওয়া লম্বা আটচালার মত বাঁশ. চাটাই ও দরমা দিয়ে তৈরী ঘর। মেজে সিমেন্টের যখন তখন রোদ বা বৃষ্টি ঘর ভাসিয়ে দেবে। তখনও হিজলীতে বেশ ঠাণ্ডা তবে মেজেতে পাতার জন্য ও গায়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে দুটি করে কম্বল দেওয়া হল। দেখলাম আমাদের আগে এখানে অনেক লোক এসে গেছেন। একই ধরনের সারি সারি ওয়ার্ড ২৫টি। ওয়ার্ডগুলির মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে উত্তরে স্নানের জায়গা ও পায়খানার সারি। ওয়ার্ডে ঢুকে যে যার জায়গা বেছে কম্বল বিছিয়ে ফেললাম। পরেরদিন আরও লোক এসে গেল। মোট সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় হাজার। দেখলাম কাঁকড়া বিছের উপদ্রব ভীষণ, সাপও দেখা গেল। তবে বিছের কামড় কোনদিন খেতে হয়নি। মেদিনীপুরের বন্ধুরা অদ্ভুত কায়দায় সরু দাড়ি দিয়ে বিছেগুলোকে আটকে মেরে ফেলত। সাপের অভিজ্ঞতা অবশ্যই হয়েছিল। একদিন রাতে শুয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিতেই ঠাণ্ডা কি যেন বুকের উপর দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি বিষাক্ত সাপ। চিৎকারে যে যা পেল তাই নিয়ে ছুটে এল। সাপটি ফনা তোলার আগেই একজন থালা দিয়ে সাপের মাথাটা বিছিন্ন করে দিল। তারপর সবাই মিলে সাপটাকে টুকরো টুকরো করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হল। এই ঘটনার পর একদিন ইনিসপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন ফ্লাওয়ারডিউ জেল পরিদর্শনে এলে আমরা ডেপুটেশন পাঠালাম বিছে, সাপ প্রভৃতি মারা এবং আলো জল সরবরাহের ব্যাপারে আর্জি পেশ করতে। কিন্তু কোন ফল হল না।

খাওয়ার ব্যবস্থা তথৈবচ। প্রায় সিকি মাইল হেঁটে গিয়ে রান্নার জায়গায়

পৌঁছে দেখলাম বড় বড় টিনের বাক্সে গরম ভাত ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তার উপর গাদা গাদা মরা মাছি। খেতে বসে খাব কি। দেখি পাশের লোক বমি করছে। সেদিনই জেলরকে জানালাম রান্না ও পরিবেশনের ভার আমরাই নেব। জেলর খুব খুশী, রাজী হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে যারা রান্নায় পটু তারা রান্নার আয়োজনে লেগে গেল। বিরাট বিরাট কড়াই, প্রকাণ্ড উনুনে রান্নার কাজ চলত। লাউ, কুমড়ো ও বেগুনের ঘ্যাঁট, সপ্তাহে একদিন মাংস। প্রত্যেকের জন্য ছোট্ট এক টুকরো।

কষ্ট হলেও দিনগুলো ভালই চলছিল। এখানে বলে রাখি এই জেলে ধীরে ধীরে একটি কমিউনিষ্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তার নেতৃত্বে ছিল হাওড়ার মদন দাস যাকে খুড়ো বলে ডাকতাম আমি ও যশোরের সুধাংশু বসু। প্রখ্যাত আইনজীবী ও যশোর খুলনার যুব সমিতির নেতা কৃষ্ণবিনোদ রায় (পরে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা) এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। মে মাসের গোড়ার দিকে হিজলীর তাপমাত্রা ১১২/১১৪ ডিগ্রীতে ওঠে। অসহ্য গরম। একদিন হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। অন্যদেরও সেই অবস্থা। হাওয়ার আশায় ওয়ার্ডের পিছনের দিকে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে ফাঁকা মাঠ। রাতের আধাঁর কেটে গেছে। হঠাৎ দেখি সেই বেঁটে হাবিলদার লাঠি হাতে আরও ৪/৫ জন লাঠিধারী পুলিশ এগিয়ে এসে আমরা যে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই বেড়ার উপর লাঠি পিটাতে লাগল। কিছুটা বেড়া ভেঙ্গে গেল। আমিই জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি হচ্ছে। হাবিলদার কোন জবাব না দিয়ে "বাবুরা ওয়ার্ডের দরজা ভেঙ্গে পালানোর চেষ্টা করছ" এই বলে চিৎকার করতে করতে দলবল নিয়ে উত্তর দিকে দৌড়ে গেল। আমরা তো হতভম্ব। একটু পরে দেখি যে রাসবিহারী বাবুকে নিয়ে আমাদের দিকে কি বলতে বলতে আসল। (রাসবিহারী বাবু বিদ্যাসাগর কলেজের কেমেস্ট্রীর ডেমোনেস্ট্রেটর) রাসবিহারী বাবুকে আমাদের নেতা বলে জানতাম। রাসবিহারী বাবু এসে বললেন "কি ব্যাপার সুকুমার" ? আমি সব বললাম। তিনি বললেন "একটা গণ্ডগোল বাঁধাবার চেষ্টা। খুব সাবধানে থেকো। সকাল হতে দেখি সব ওয়াডের্র দরজা খোলা হয়েছে কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডে তালা বন্ধ। ব্যাপার কি জানার চেষ্টা করছি এনন সময় দেখি পিছনের দরজায় ৫।৬ জন ষণ্ডা লাঠিধারী লোক এবং জেলর। তিনি গেট খোলার হুকুম দিলেন। আমাদের প্রহারেণ ধনঞ্জয় করা হবে বুঝে

আমি সকলকে যার যার জায়গায় বসে থাকতে বললাম। এই সময় রটে গেল ২৪ নং ওয়ার্ডে মার পিট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সাতশত কণ্ঠে উঠল "বন্দেমাতরম" ধ্বনি। আমাদের হিন্দুস্থানী ভাইরা এক হয়ে গান ধরলেন ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা"। রাজবন্দীরা তাঁদের বাড়ীর দোতালায় উঠে আওয়াজ তুলতে লাগলেন "বন্দেমাতরম" ইন-কিলাব জিন্দাবাদ। তুমুল হৈচৈ। ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝে জেলর দলবল নিয়ে কেটে পড়লেন। আমরা বেঁচে গেলাম। কিন্তু তখনই দেখলাম ঠিক আমাদের ওয়ার্ডের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছ'ফুটের উপর লম্বা এক সাহেব পাশে এক দেহরক্ষী। হঠাৎ পাগলা ঘণ্টি বাজতে শুনলাম। দেখলাম বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বন্দুক নিয়ে জেলের মধ্যে ঢুকছে। একদল বেটন চার্য করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একটু পরেই সার্জেন্ট লাঠি উঁচিয়ে হুকুম দিলেন চার্জ। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল যারা ধ্বনি দিচ্ছিল তাদের উপর। প্রচণ্ড মার পিট। কারও হাত কারও বুকের পাঁজর ভাঙ্গল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্য আনা অবসর প্রাপ্ত শিখ সৈন্যরা লাঠি মারার ভান করে পুলিশের লাঠি আটকাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টার উপর তুমুল হৈ হট্টগোলের পর শান্ত হল। গুরুতর আহতদের স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতে থাকল। অন্য অল্প আহতদের সঙ্গীরাই তাদের ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। পুলিশ বাহিনী চলে গেল। আমরা তখনই বৈঠকে বসলাম। স্থির হল যে ভবিষ্যতে এরকম জুলুমবাজী করা হবে না এই বলে কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং জেলরকে ক্ষমা চাইতে হবে। এই দুটি দাবিতে আমরা আমরণ অনশন ধর্মঘট করব। জেলরকে জানিয়ে দেওয়া হল। অনশনের দ্বিতীয় দিনে আমাদের ওয়ার্ডের মেদিনীপুরের একজন কর্মীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। তৃতীয় দিনে হিক্কা উঠতে লাগল। জেলারকে খবর দেওয়া হল। জেলার বাবু ডাক্তার নিয়ে হাজির হলেন। ডাক্তার জানালেন এ অবস্থা চলতে থাকলে ২৪ ঘঃ মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। জেলর ভয় পেয়ে অনশন তুলে নিতে আমাদের অনুরোধ করেন। আমরা জানালাম আমাদের দুটি শর্ত না মানলে অনশন চলবে। কিছুক্ষণ পরে খবর এল জেলর আমাদের দুটি দাবিই মেনে নিয়েছেন। কাজেই আমরা অনশন ভঙ্গ করি।

অনশন পর্ব খুব সহজেই শেষ হল মেদিনীপুরের কর্মীটির দৌলতে। এদিকে আমার ও আরও অনেকের থাকার দিন ফুরিয়ে এল। আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হল একটি সভায়। সেই সভায় আমি আসন্ন বিপ্লব সম্পর্কে

ভবিষ্যতবাণী করে গরম বক্তৃতা দিলাম। ছাড়া পেয়ে হাঁটা পথে খড়্গপুরে এসে হাওড়ার ট্রেন ধরি। কলিকাতায় ছোট মাসিমার বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে যশোর রওনা হই।

সেসময় গান্ধীজী ১৯৩৫ সালের সংবিধানের একটি ধারা বাতিলের দাবিতে অনশন করেন। ধারাটিতে তপশিল জাতি উপজাতিদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৫ এর সংবিধানে তো আমরা প্রার্থী হয়েছি। তার একটি ধারা বাতিলের দাবিতে গান্ধীজী কেন আমরণ অনশন করলেন? তাহলে কংগ্রেস নেতা সংবিধান মেনে নিচ্ছেন? খুব বিরক্ত হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেব। কমিউনিষ্ট পার্টি তখন বেআইনী, পার্টিতে যোগ দিয়ে শুরু করলাম নূতন জীবন। সে কাহিনী এখানে বলার প্রয়োজন নাই।

আমার বাবার নাম ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং মাতার নাম শ্রীযুক্তা চপলাবালা মিত্র। কিন্তু শিশুকাল থেকে আমার দিদিমা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী ঘোষের কাছেই আমি থেকেছি। আমার শৈশব. বাল্য, শিক্ষাদীক্ষা সবই তাঁর কাছে। আমার মাসীমা শ্রীযুক্তা নলিনীবালা দেবীকেই আমি মা বলতাম। আমার দিদিমা এবং আমার মাসীমা আমাকে তাঁর নিজের সন্তানের মতই মানুষ করেছেন। এ'দের প্রভাবই আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করায় বাবা মা এর কথা আমার জীবনে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি।

সেদিনের কথা

শ্রী ভূষণ চন্দ্র দাস

'দেশ' বলতে যথার্থভাবে কী বোঝায় তার সুস্পষ্ট ধারণা একটি এগারো বছর বয়স্ক কিশোরের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কি পৃথিবীর মানচিত্রে একটি ভূখণ্ড মাত্র অথবা তার চেয়েও অনেক ব্যাপক সংজ্ঞা রয়েছে 'দেশ' শব্দটির তা নিয়ে চিন্তার কোনো অবকাশই হয়নি তখন। অথচ ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম! আজ এই পরিণত বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামী-র স্বীকৃতি আর সম্মান পেয়ে সত্যই আমি ধন্য! কিন্তু কৈশোর, তারুণ্য থেকে আজ এই বিরাশি বছর বয়স পর্যন্ত অতীত-স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীগণ হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করেছেন, পুলিশের অমানুষিক নির্যাতনে সহ্য ক'রেও আদর্শচ্যুত হননি, মাথা নত করেন নি, নিষ্করুণ দৈহিক নির্যাতন পঙ্গু হ'য়েছেন, উন্মাদ হ'য়ে গেছেন, নিপীড়নে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, তাঁদের তুলনায় আমি বা আমার সহযোগীদের সংগ্রামের গুরুত্ব কতটুকু? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবুও বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ ক'রে বলি, রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালিও তো সাধ্য-মতো সহযোগিতা ক'রেছিল? আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কৃতিত্ব দাবী করিনা। কোনো অসাধারণ গৌরব দাবী করিনা। কেবল এইটুকুই ব'লতে পারি, স্বাধীনতা সংগ্রামে যতদিন যুক্ত ছিলাম ততদিন সমস্ত দায়িত্ব যদি সুষ্ঠুভাবে পালন না-ও ক'রতে পারি তবু নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তার যদি কোনো মূল্য স্বীকৃত হয় তাহ'লে কেবল সেইটুকুই আমার প্রাপ্য।

আমার জন্ম যশোর শহরের (বর্তমানে বাংলাদেশে) এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান নিঃসন্দেহে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার প্রেরণার ফল। তখন ইংরেজের স্কুল-কলেজ বর্জনের মাতন এসেছে। প্রতিষ্ঠিত হ'ল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তারই অধীনে যশোর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মাইকেল মধুসূদন জাতীয় বিদ্যালয়।' আমরা ভর্তি হ'লাম। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে ছাত্র

সংখ্যা হয়ে গেল চারশতাধিক। বিভিন্ন অঞ্চলের বহু ব্যক্তি অসহযোগ আন্দোলনে কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষিত. জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত। তাঁদের অনেকেই নামমাত্র বেতনে শিক্ষকতা করতে এলেন। এই বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সঙ্গে চরকা কাটা, তাঁতবোনা প্রভৃতিও শেখানো হ'ত। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থাতেই প্রথম বিপ্লবী দেশপ্রেমিক কয়েকজন অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটে। তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ-কথা নতুন ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই। বৃটিশকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী সেই নিবেদিত প্রাণ অগ্রজেরা বিশ্বাস করতেন প্রধানত গীতার কর্মযোগে। স্বাস্থ্যচর্চা, চরিত্রগঠন এবং আর্তের সেবা ছিল তাঁদের ধর্ম। সেই কৈশোরে তাঁদের আদর্শ বোধে নিষ্ঠা আমার মনের ওপর যথেষ্ট গভীর প্রভাব-ই বিস্তার ক'রেছিল তা আজও মনে আছে। যদিও সেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করা আমার হ'য়ে ওঠেনি তবু তাঁদের নির্ভীক, তেজস্বী, স্নেহ প্রবন মুখগুলি মনে প'ড়লে শ্রদ্ধায় আজও মাথা নত হ'য়ে আসে এবং আমৃত্যু তাই-ই হবে।

১৯২২ সাল পর্যন্ত জাতীয় বিদ্যালয় ভালোভাবেই চালু ছিল। উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরায় অহিংস আন্দোলন হ'য়ে উঠলো সহিংস। গান্ধীজী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজীর সেই আন্দোলন-প্রত্যাহার প্রসঙ্গে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সারা ভারত জুড়ে বিয়াল্লিশের আন্দোলনও কিন্তু চেহারা এবং চরিত্রে অহিংস থাকেনি। যাই হোক, গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেবার পর জাতীয় বিদ্যালয়-ও বিলুপ্ত হ'ল আর আমরাও আবার ইংরেজেরই 'হাই ইংলিশ স্কুল'-এ ভর্তি হ'লাম।

পরবর্তী পর্যায়ের কথা বলবার আগে আমি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় এমন এক শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহিলার কথা স্মরণ করি, যাঁর স্নেহ-মমতার স্পর্শ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ না হলে জীবনে আমি যেটুকুই বা করেছি, তা করতে পারতাম না। আমার পরম শ্রদ্ধেয়া সেই ভদ্রমহিলার নাম, সৌদামিনী ঘোষ। যশোর আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি উমেশচন্দ্র ঘোষের (বড়ো) পত্নী সেই ভদ্রমহিলা আমার আবাল্য সুহৃদ প্রখ্যাত বিদ্বান-গবেষক শ্রীসুকুমার মিত্রের মাতামহী। তাঁর অপর একটি পরিচয় দেওয়াও মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৮৮৩ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম দুজন মহিলা গ্র্যাজুয়েটের অন্যতমা

কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কনিষ্ঠ ভগ্নী তিনি। সুকুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুবাদে আমিও তাঁর স্নেহের পাত্র হয়েছিলাম। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নারীর হৃদয়ে দেশ-দশের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি বিত্তবান পরিবারের গৃহিনী, তাঁর দৌহিত্র সুকুমারও বিত্তবান পরিবারের সন্তান। আর, আমি নিতান্ত সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর, আমি নিতান্ত সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছি, দারিদ্র্যের ভেতর দিয়েই দিন কাটিয়ে এসেছি। কিন্তু রক্তসম্পর্ক বিহীন এই নাতিটিকে তিনি নিজের নাতির মতোই অকৃপণ স্নেহে আপন করে নিয়েছিলেন। কৈশোর এবং কৈশোর তারুণ্যের সন্ধিক্ষন সেই পাওয়া যে আমার কত বড়ো পাওয়া তা কেবল আমিই জানি! দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্তা, ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এই নারীর প্রভাব সে-সময় দেশাত্মবোধের প্রেরণায় আমার মনকে ক'রেছে সঞ্জীবিত!

জাতীয় বিদ্যালয় বিলুপ্ত হলেও আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব কিন্তু পুরোপুরি রয়ে গেল। তখন পাঠাগার এবং ব্যায়ামাগারকে কেন্দ্র করে আমরা প্রতিদিনই মিলিত হ'তাম। দাদাদের নির্দেশমতো কাজ ক'রে যেতাম। একদিকে কংগ্রেসের আন্দোলন, অন্যদিকে অগ্নিযুগের অগ্নিপুত্র-অগ্নিকন্যাদের নির্ভীক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড—সমগ্র বঙ্গদেশ তখন অশান্ত। বৃটিশ সরকার তখন কঠোর থেকে কঠোরতর হ'য়ে উঠছে। কিন্তু এইটুকু ব'লতে পারি, কঠিন প্রতিকূল অবস্থাও আমাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় যে-সকল অগ্রজ আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন তাঁদের নির্দেশ আমরা যথাযথ পালন করতে পেরেছি। তাঁদের দেশাত্মবোধ প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর স্মৃতি মনকে আনন্দে আপ্লুত ক'রে তোলে।

আমি যশোর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ ক'রে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সে-সুযোগ বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। অন্য এক আহ্বানে কলকাতা ছেড়ে যেতে হ'ল রাঁচিতে। রাঁচির সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভূপালচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য ক'রতেন। ডাক এলো তাঁর কাছ থেকে। সে-ডাক উপেক্ষা করবার নয়। রাঁচিতে তিনিই আমাকে ভারতবিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইংরেজ সরকার তখন তাঁকে বাংলা মুলুকের বাইরে বিহারের রাঁচিতে অন্তরীণ ক'রে রেখেছেন।

তিনি সেই অন্তরীণ অবস্থাতেই নিজের বাসাবাড়িতে দরিদ্র জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর সেই কাজে সহায়তা করবার জন্যেই শিশিরবাবুর ডাক। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম! যে-বিপ্লবী দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছেন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা তো দুর্লভ সৌভাগ্য! তাঁর ঋজু, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ, প্রখর উজ্জ্বল দৃষ্টি, ধীর পদক্ষেপে চলবার ভঙ্গি, ধীরে ধীরে কথা বলবার ভঙ্গি আমার চোখে ছিল এক বিস্ময়! তাঁর পোশাক ছিল ধুতির ওপরে শার্ট, তার ওপর লম্বা গলাবন্ধ কোট, পায়ে বুটজুতো। চোখে ছিল রোল্ড গোল্ড ফ্রেমের চশমা। সব মিলিয়ে তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আমার সেদিনকার তরুণ মনকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। সেই অনন্যসাধারণ বিপ্লবী পুরুষের সান্নিধ্যে দু বছর কাটানোর সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। যাদুদা মাঝে মাঝে তাঁর পলাতক জীবনের কাহিনী শোনাতেন। গভীর জঙ্গলে দিনের পর দিন তিনি আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। আদিবাসীদেব সততা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং মাতৃভূমির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা ব'লতে ব'লতে তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসতো। তখন পর্যন্ত বিপ্লববাদের ইতিহাস যা প্রকাশিত হ'য়েছে তাকে তিনি যথার্থ ইতিহাস ব'লে মেনে নিতে একেবারেই সম্মত ছিলেন না কারণ, পরাধীন দেশে বিপ্লববাদের যথার্থ ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় ব'লেই তিনি মনে ক'রতেন। আজ ভাবি, 'ট্রানস্ফার অফ পাওয়ার' শিরোনামায় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সে কি ইংরেজ আনলে সর্বত্যাগী সংগ্রামীদের সেই স্বপ্নের স্বাধীনতা? স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যা সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় লিখিত হ'য়েছে সে তো সীমাবদ্ধ একটি গোষ্ঠী এবং মুখ্যত একটি পরিবারের কৃতিত্বের ইতিহাস! কোথায় ভগিনী নিবেদিতা, কোথায় লাল বাল-পালের জনজাগরণী প্রেরণার মূল্যায়ন? কোথায় হারিয়ে গেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন আর নেতাজী সুভাষ? আর, সশস্ত্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা তো সে-ইতিহাসে একেবারেই অচ্ছুৎ! তবে আশার কথা, নতুন যুগের গবেষকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে উদ্ধার করবার চেষ্টা ক'রছেন। অনেক তথ্য তাঁরা আবার লোকের চোখের সামনে তুলে ধ'রেছেন। বিশ্বাস রাখি, 'ভুলিয়ে-দেওয়া' আরো অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হবে এবং সেদিন নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে, সংগ্রাম কিভাবে এবং কোথায় আরম্ভ হ'য়েছিল এবং কিভাবে তার সমাপ্তি ঘটে। আজ আমরা ঋণের দায়ে প্রায় সর্বস্ব বিকিয়ে স্বাধীন!

এ-প্রসঙ্গে আমার বাল্যবন্ধু সুকুমার মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কারণ যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারে যাঁরা নিরলস পরিশ্রম ক'রেছেন এবং এখনো ক'রে চ'লেছেন, সুকুমার তাঁদেরই একজন।

রাঁচির তৎকালীন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ডঃ পূর্ণচন্দ্র মিত্রের পুত্র প্রতুল ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এলো ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক। ডঃ মিত্র তো নেতৃস্থানীয়ই ছিলেন, প্রতুল-ও সেই আন্দোলনে ছিল। স্বভাবতই সে-আন্দোলনে যুক্ত হ'য়ে পড়লাম। প্রতুল বেশ কয়েকবার জেলে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিহার থেকে সে এম. পি. হ'য়েছিল।

১৯৩২ সালে এলো আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী পর্ব এবং তার সঙ্গে বয়কট আন্দোলন অর্থাৎ বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন। বিলাতি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান সেই যে প্রথম, ইতিহাস তা বলে না। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করবার দাবীতে সারা বঙ্গদেশ যে উত্তাল হ য়ে উঠেছিল, তার ভেতরেই এর বীজ নিহিত ছিল। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' শীর্ষক গানটির ভেতরেই তার নিদর্শন রয়েছে। প্রসঙ্গত, এ-কথাও এখানে বোধ হয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অসহযোগ বা আইন অমান্যের যে আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে প'ড়েছিল, তার মৌলিক রূপ কিন্তু ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মাধ্যমে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের সে-রচনা রূপকধর্মী তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু অসহযোগে দৃঢ় হ'য়ে প্রবলপ্রতাপ রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানোর আহ্বান বাঙালীকে অন্তত ১৯১৪ সালেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছিলেন। উদ্দাম আবেগের স্রোতে অনেক কিছুই তলিয়ে যায়, সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রচারে কত তথ্যই তো বিস্মৃত কিম্বা বিলুপ্ত হ'য়েছে

যাই হোক, ১৯৩২-র কথাতেই ফিরে আসি। সকলেই জানেন, সে-আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল পিকেটিং ক'রে বিলাতি দ্রব্য প্রধানত বস্ত্র বিক্রয় ক'রতে না দেওয়া এবং মাদক দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করা। তখন আমি যশোরে। শহরের সব বড়ো বড়ো নেতারা গ্রপ্তার হ'য়ে কারান্তরালে চ'লে গেলেন। পিকেটিং সফল করবার দায়িত্ব দেওয়া হ'ল আমার ওপর। পদমর্যাদা—'ডিক্টেটর!' এই সময় আমার সঙ্গে যাঁরা আন্তরিক নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ ক'রেছেন তাঁদের নাম আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁরা হ'লেন সিদ্ধেশ্বর

ভট্টাচার্য, মনোরমা বসু, রাইপ্রিয়া দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বগুড়া-খ্যাত বিপ্লবী যতীন রায় এবং কালিয়া গ্রামের (যশোর) বিপ্লবী ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য-ও আমার হ'য়েছে। যাই হোক, পিকেটিং ক'রতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, এক-সম্প্রদায়ের মানুষ বিলাতি বস্ত্র কিনবেই এবং নেশাগ্রস্তেরা মাদক দ্রব্য না কিনে ছাড়বে না। পিকেটিং-এর ধারা পাল্‌টে দিলাম। যে-চারজন নির্ভীক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সহযোগী এবং সহযোগিনীর নাম উল্লেখ ক'রেছি তাঁরা ছাড়া আরো অনেক যুবক-যুবতী এগিয়ে এলো। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে দোকান বন্ধ ক'রেদিল। কারণ, এমন একটা রটনা হয়েছিল যে, বিলিতি কাপড় যে সব দোকানে বিক্রি করা হয়, সে-সব দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কিছু দোকান ছাড়া শহরে সব দোকানই বন্ধ ছিল। এই সময় আত্মগোপন ক'রেই আমাকে দায়িত্বপালন অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবক- স্বেচ্ছা-সেবিকাদের নির্দেশ দান ইত্যাদি ক'রতে হ'য়েছে। আত্মগোপনের কালেই একদিন ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে একটি সভায় বক্তৃতা করবার ফলে স্বাভাবিক পরিণতি যা হওয়ার তাই হল। থানার বড়ো দারোগার হাতে নির্মম প্রহার, বুটের লাথি, অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং পরিশেষে হাজতে আশ্রয়প্রাপ্তি : এটা তখনকার 'হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিস'-এ দারোগা-পুলিশের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। আমি তো ভাবি, সে-দারোগা সদাশয়! তিনি হাত-পায়ের সুখের উচ্ছ্বাসে আমাকে অন্তত পঙ্গু ক'রে দেন নি! আমার চেয়েও অনেক বেশি নির্যাতনে যাঁরা পঙ্গু হ'য়েছেন, অন্ধ হ'য়েছেন, এমন কি মৃত্যুও বরণ ক'রেছেন, সেই সব দেশপ্রেমিকের সংখ্যার হিসেব কি নথিভুক্ত করা আছে? হাজতে থাকা-কালীন পিপাসার্ত হ'য়ে একটু জল চাইতেই দারোগাবাবুর আর একপ্রস্থ গালি-গালাজ। কিন্তু একটু পরেই এক অভাবিত ঘটনা! বড় দারোগা ছিলেন মেদবহুল। হাজতে ঢোকানোর আগে আমার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের পর সম্ভবত তিনি খুবই হাঁপিয়ে প'ড়েছিলেন। তিনি চোখে-মুখে জল দিয়ে টেবিলে ঢেকে-রাখা জলের গেলাস তুলে মুখের কাছে নিয়েই কেমন যেন থম্‌কে থেমে গেলেন। হঠাৎ চিৎকার ক'রে অধস্তনকে হুকুম দিলেন, 'হাজত খুলে স্বদেশীবাবুকে নিয়ে এসো'। আমি আর একবার আগেকার মতো আপ্যায়ণের জন্যে মনে মনে তৈরি হ'লাম। আমাকে দারোগাবাবুর সামনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কোথায় কিল-চড়-লাথি-ঘুষি? নিজের হাতের জলের গেলাসটা আমার সামনে

এগিয়ে ধ'রে অত্যন্ত বিনীতভাবে ব'ললেন, জল খান! আমি নির্বাক। আমার হাতে জলের গেলাসটা ধরিয়ে দিয়ে তিনি বিড়বিড় ক'রে নিজের সম্পর্কে নিজেই কটূক্তি করতে লাগলেন। আমিও অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, মানুষের মধ্যে কেবল অন্ধকারই নয়, আলোও থাকে! পরিবেশ-পরিস্থিতি আলোকে কখনো বা একেবারেই ঢেকে ফেলে, কখনো বা ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে সে-আলোর রশ্মি বেরিয়েও আসে!

সর্বসাকুল্যে আট মাস কারাবাস ক'রতে হ'য়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার গান্ধীজীর প্রবর্তিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়ি। পূর্বে উল্লিখিত বিপ্লবী যতীন রায় এবং ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের সান্নিধ্যে সেই সময়ই আসি। এই আন্দোলনে বেশ কিছুকাল যুক্ত ছিলাম। তথাকথিত দরিদ্র অস্পৃশ্য মানুষদের সংস্পর্শে এসে সেই সময় তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব ক'রতে পেরেছিলাম. এ আমার জীবনে বিধাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ! সেই সব মানুষদের এখনো ভুলতে পারিনি।

আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী দাদা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন। তিনি ছিলেন জমিদারপুত্র। যৌবনে বিত্ত-বিলাসব্যসন ত্যাগ ক'রে দেশমাতার সেবায় পথে নামেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা এবং বিনয়নম্র ব্যক্তিত্ব সকলকেই আকর্ষণ ক'রত। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হ'য়েছেন শুনে নিকট আত্মীয়েরা তো বটেই. দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীরাও দূরে সরে গেলেন। আমি বিনীতভাবেই ব'লছি, আমি তা পারিনি। আমার চেয়ে তাঁর অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীদের আচরণে আমি মর্মাহত হ'য়েছি এবং কেবল এই কথাই ভেবেছি, 'বন্দে মাতরম্' কি শুধু একটা বিমূর্ত প্রতীক মাত্র? অথবা অর্থহীন শ্লোগান মাত্র? সর্বস্বত্যাগী এবং সেইসঙ্গে সর্বজন পরিত্যাগ সেই মহৎহৃদয় মানুষটিকে আমি তিলে তিলে মৃত্যুবরণ ক'রতে দেখেছি। তাঁর জীবৎকালের সেই বর্ণনাতীত করুণ অবস্থার একমাত্র পার্শ্বচর ছিলাম আমি। সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আড়ম্বরসর্বস্ব রাজনীতি থেকে দূরে স'রে এলাম আমি। মোহভঙ্গ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সম্বন্ধে নয়—মোহভঙ্গ হ'ল সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারকদের সম্বন্ধে। শুধু গলা ফাটিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ব'লে চিৎকার ক রে মনুষ্যত্ব বিকাশের কোন্ পথ উন্মোচন ক'রবো। রাজনীতি ছেড়ে তারপর আমি নিজেকে নিয়োগ ক'রলাম যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মানুষদের সেবায়। উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীটে 'দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার'-এর সঙ্গে যুক্ত হলাম। তখন

প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক চন্দ্রশেখরগুপ্ত। পরে প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড়ো হ'য়ে ওঠে এবং সেবাকার্য অনেক ব্যাপক হয়। সেই বিপ্লবী দাদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলাম ব'লেই হয়তো রোগভয় আমার আর ছিল না। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি, বস্তি এলাকায় রোগীদের ঘরে ঘরে গিয়েছ।

১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে সহ সম্পাদক রূপে যোগদান করি। কিছুদিন পর থেকেই সাহিত্য বিভাগে (রবিবারের 'যুগান্তর সাময়িকী') সহ সম্পাদক হিসেবে ৩৮ বছর কাজ করবার পর অবসর গ্রহণ ক'রেছি। এ-কাজ আমার জীবনে আনন্দের এক স্রোতোধারা। যুগান্তর কার্যালয়ে তখন আসতেন সব খ্যাতনামা ব্যক্তি। সেই যোগাযোগে প্রখ্যাত দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত), হেমেন্দ্রকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, বৈষ্ণবাচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (বুড়োদা), প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, চিত্রশিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, গোপাল ঘোষ প্রমুখের আন্তরিক স্নেহ পেয়ে আমি কৃতার্থ হ য়েছি। বিভাগীয় সম্পাদক পরিমল গোস্বামী অবসর গ্রহণ করবার পরে তাঁর জায়গায় এলো অনুজপ্রতিম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পদমর্যাদায় আশু আমার চেয়ে ওপরে কিন্তু এই সৎ, অমায়িক খ্যাতনামা সাহিত্যিক একটি দিনের জন্যেও আমাকে তা বুঝতে দেয় নি! খ্যাতির শীর্ষে উঠেও আশু আমার কাছে সেই একই 'আশু'। আমিও তার কাছে সেই একই 'ভূষণদা'।

জীবিকা অর্জনের পালা শেষ, জীবন এখনো রয়েছে। সেই কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত স্মৃতিচারণ ক'রতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে। ঊনিশশো সাতচল্লিশ সালে আমরা যে-স্বাধীনতা পেয়েছি, তা কি সেই স্বাধীনতা-যার স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম? শান্তিনিকেতনে ব'সে অসুস্থ শরীরে ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ (১৯৪১) তারিখে মহাকবি, মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' নামে যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার ভেতর এই কয়টি কথা আছে, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?" দূরদ্রষ্টা মহামনীষীর এই জিজ্ঞাসা মনকে বড়ো বিচলিত ক'রে তোলে! স্বাধীনতার নামে এ কোন্ দীনতা, কুশ্রীতার উত্তরাধিকার এলো আমাদের দেশীয় নেতৃবৃন্দের হাতে? 'ট্রান্সফার অফ্ পাওয়ার' কি ইংরেজের হাত থেকে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধনী আর রাজনৈতিক নেতার হাতে স্বদেশেই ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষমতা হস্তান্তর? কে জানে!

স্মৃতি চারণ

শ্রীসুধীন্দ্রকুমার রায় (খোকা রায়)

১৯০৭ সালে মার্চ মাসে অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করি। স্থানীয় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ছাত্র জীবন শুরু করি, এবং যখন আমি ঐ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্র তখনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তথা মহাত্মাজীর আহ্বানে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিই এবং ঐ সময়েই যুগান্তর নামে যে বিপ্লবী দল ছিল সেই দলের (under ground) বিভাগে একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে যোগ দিই। এইভাবেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে মাতৃভূমির স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার যোগদান।

১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি স্থানীয় আনন্দ মোহন কলেজে ভর্তি হই এবং ১৯২৮ সালে ঐ কলেজ থেকেই আমি স্নাতক হই। এরপর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনার জন্য ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই জগন্নাথ ছাত্রাবাসে থাকতাম। এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে ১৯২১ থেকে ১৯২৯ অবধি এই ক বছর কিন্তু আমি আমার গোপনীয় বিপ্লবী কার্যকলাপ ঠিক চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি এবং আমার কয়েকজন বিপ্লবী সাথী মিলে যুগান্তর দলের একটা গোপন বিভাগ (গুপ্ত বিভাগ) সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলাম।

এই বিপ্লবী কার্যকলাপের পাশাপাশি ১৯২৯-৩০ সালে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনেও যোগ দিই এবং পরবর্তীকালে এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ (ইউনিটের) সম্পাদক নিযুক্ত হই।

এই সময়ে ১৯৩০ সালে ২৬ শে জানুয়ারী কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং (পার্কে, হাটে, মাঠে) সর্বত্র কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন, জনসভা ও বিক্ষোভের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য জনগনের কাছে আবেদন রাখল।

কংগ্রেসের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা জগন্নাথ ছাত্রাবাসের উত্তর ও দক্ষিণ অলিন্দে বসবাসকারী কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা ছাত্রাবাস চত্বরে পতাকা

উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাস চত্বরে পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন কিন্তু আমরা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পতাকা উত্তোলন করি এবং সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই ভয়ে ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে কোনরকম তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ আমাকে ও আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কার করে তাদের প্রতিহিংসার স্বার্থ চরিতার্থ করে।

ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কারের পর আমি ও আমার ঐ সহকর্মী ঢাকা কংগ্রেস কার্যালয়ে থাকতাম এবং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় মদ ও গাঁজার দোকানের সামনে পথ সভা করতাম।

এর কিছুদিন পর ১৯৩০ এর মার্চ এপ্রিল মাসে আমি ময়মনসিংহে ফিরে আসি এবং আমার পুরোন সহকর্মীদের সাথে আবার কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিই। এই সময় যুগান্তর দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে ময়মনসিং জেলা কংগ্রেস কমিটি এক সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গুদাম ঘর থেকে জেলার সমস্ত খুচরো দোকানগুলিতে মদ ও গাঁজার যোগান বন্ধ করা যায় তাহলে এই দোকানগুলি কোনও রকম পথ সভা ছাড়া এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে কেন্দ্রীয় গুদাম ঘরের গেটের ঠিক বাইরে একটা পরিখা খনন করা হল এবং যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মী ধীরেন রায়ের নেতৃত্বে একদল কংগ্রেস কর্মী—যাতে এক ছটাকও মদ বা গাঁজা এখান থেকে অন্যত্র যোগান না যায় সে ব্যাপারে প্রহরার জন্য—সেই পরিখার ভেতর আশ্রয় নিল। এর ফলে খুচরো গাঁজা ও মদের দোকানগুলি যোগানের অভাবে একটার পর একটা করে বন্ধ হয়ে গেল।

অন্যদিকে চুঙ্গি কর আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জেলা প্রশাসনকে বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল, আবার ১৯৩০ এর জুনের ভেতর মদ ও গাঁজার খুচরো দোকানের লাইসেন্স স্বীকৃত না হলে License বাতিল হয়ে যাবে—এই দুই পরিস্থিতির সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন—কেন্দ্রীয় গুদাম ঘর থেকে মদ ও গাঁজার যোগান শুরু করার ব্যাপারে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ; এবং জুন ১৮, ১৯৩০ এ কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবীদের পথসভা সত্ত্বেও "দরকার হলে বল প্রয়োগ করা হবে" এই ভয় দেখিয়ে তাঁরা যোগান পুনরায় শুরু করার ব্যবস্থা করলেন।

এমত জটিল অবস্থায় জেলা কংগ্রেসের ডান ঘেঁষা নেতারা কি করবেন সে ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। কিন্তু আমরা যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মীরা স্থানীয় প্রশাসনের এই হুমকিতে একটুও পিছু না হঠে শহর ও শহরতলীর জনগনের কাছে কেন্দ্রীয় গুদাম ঘরের ওপর নজরদারি চালিয়ে যাওয়ার আবেদন রাখলাম ; এবং বলা বাহুল্য আমাদের এই আহবানে আমরা জনগণের তরফ থেকে ভাল সাড়া পেলাম এবং ঐ দিন দুপুর থেকেই হাজার হাজার লোক গুদাম ঘরের সামনে জমায়েত হল এবং স্বেচ্ছাসেবী নেতা ধীরেন রায়কে সহায়তা করতে এবং ঐ জমায়েতকে সফল রূপ দিতে আমি আর যুগান্তর দলের আরও কিছু সক্রিয় কর্মী দুপুর ১২ টার সময় ওখানে উপস্থিত হলাম।

ঐ দিনের লড়াইয়ে কংগ্রেস ও জনগনের জয় হল। সরকার পক্ষ বলপ্রয়োগ করল, এমনকি অবিচ্ছিন্ন ভাবে গুলি চালাল—গুলিতে একজন নিহত আর শতাধিক আহত হল কিন্তু তা সত্ত্বেও গুদাম ঘর থেকে এক ছটাক গাঁজা বা মদ বার করতে পারল না। উপরন্তু কংগ্রেস ও জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধে ভয় পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ঐ গুদাম ঘরের সুরক্ষিত ঘরের ভেতর আশ্রয় নিল।

এই ঘটনার জের স্বরূপ আমার এবং কিছু কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোল। এর ফলে আমাকে আত্মগোপন করতে হল। এই অবস্থাতে ১৯৩০ এর অক্টোবর মাসে একদিন আমি আর যুগান্তর দলের কয়েকজন সক্রিয় কর্মী যখন জামালপুর হয়ে শেরপুর শহরে যাচ্ছিলাম পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য জামালপুর ফেরিঘাট ঘিরে ফেলল। এখানে পুলিশের সাথে আমাদের একটা খণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। আমরা পুলিশের বেষ্টনী ভাঙ্গার জন্যে গুলি চালালাম। পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হল। কিন্তু ঐ বছরই নভেম্বরের ৩০ তারিখে আমি আর যুগান্তর দলের আর এক কর্মী এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নগেন দেব—ময়মনসিং শহরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলাম। জামালপুরে এক বিশেষ আদালতে আমাদের বিচার হল এবং আমরা ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলাম।

প্রথমে জামালপুর সাব জেলে রাখা হলেও পরে আমাকে ময়মনসিং জেলা জেলে—আবার সেখান থেকে আলিপুর সেণ্ট্রার জেলে বদলি করা হল এবং সব শেষে আমাকে আন্দামানে সেলুলার জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়।

সেলুলার জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন আমি মার্কস ও লেনিনের ওপর

পড়াশুনা করেই সময় কাটালাম। এবং ক্রমশঃ আমি মনে প্রাণে একজন কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠলাম।

১৯৩৮ এর মার্চে আমার শাস্তির মেয়াদ ফুরোলে আমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি আমার নিজের জেলা শহর ময়মনসিংহে তৎকালীন কম্যুনিষ্ট কর্মীদের সাথে যোগ দিয়ে একজন কম্যুনিষ্ট কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করি এবং ঐ বছরই মে-জুন মাসে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ময়মনসিং জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হই।

১৯৩৪ সালের ভারত সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করতেন না। আমরাও এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার জেলার কৃষকদের মধ্যে কাজ করে যেতে লাগলাম।

কিন্তু ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাৎসী জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণায় সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স মিলিতভাবে এই আক্রমণের নিন্দা করল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফে এক ঘোষণায় এই যুদ্ধ পৃথিবীকে দু' ভাগে ভাগ করার উদ্দেশ্যে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হল এবং পার্টির স্লোগান হল যুদ্ধের তরে "নয় এক পাই, নয় এক ভাই"।

ফলস্বরূপ ভারত সরকার কম্যুনিষ্টদেরকে গ্রেপ্তার করার এক আদেশ জারি করলেন। সুতরাং আমি ও আমার বহু কম্যুনিষ্ট সহকর্মীকে আত্মগোপন করতে হল।

কিন্তু ১৯৪১ সালের ২১ শে জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী জার্মানীর বর্বরোচিত আক্রমণে পরিস্থিতির আবার এক পরিবর্তন ঘটল। সোভিয়েত ইউনিয়নও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করার জন্য সমগ্র বিশ্বের কাছে আবেদন করল। এতদিন যে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ তা পরিণত হল জনযুদ্ধে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিও তার যুদ্ধ বিরোধী নীতির পরিবর্তে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ নেওয়ার নীতি অবলম্বন করল।

এই সময় ভারত সরকারও কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল। ফলত ১৯৪২ সালে পার্টি বৈধ বলে বিবেচিত হল। এর পরই ১৯৪৩

সালের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ঐ সম্মেলনে আমি পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য তথা প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হই। এ সময়ে ১৯৪৩ এর জুলাই-তে আমি জুঁইফুলকে বিয়ে করলাম। উল্লেখ্য যে জুঁইফুলও পার্টির একজন সর্বসময়ের কর্মী ছিলেন।

১৯৪৫ এর মে মাসে নাৎসী জার্মানীর আত্ম সমর্পণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। এর পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্থান এই দুই ভাগে ভাগ করা হল। তখন আমি পাকিস্থানে (পূর্ব পাকিস্থানে) কাজ করতে চাইলাম এবং আমি, আমার স্ত্রী ও দুই বৎসরের শিশুকন্যাসহ ঢাকায় চলে এলাম। ঢাকাতে আমি প্রায় এক দশক ছিলাম এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর সরকারের নিষেধাজ্ঞার দরুণ প্রায় এই পুরো দশ বছরই আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল।

স্মৃতিকথা

শ্রীবিধুভূষণ সেন

১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক নূতন মাত্রা যোগ করেছিল। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে দেশ উত্তাল। বাংলার প্রতিটি মানুষ তখন এক একজন বীর সৈনিক। তাদের একটাই প্রতিজ্ঞা সোনার বাংলা, হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাংলা দু'ভাগ করতে দেব না। সেদিন পিছু হটতে হয়েছিল ইংরেজকে। দেশাত্মবোধের যে আগুন সেদিন মানুষের মনে জ্বলে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে তা দাবানলে পরিণত হয়ে শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে পাড়া, পাড়া থেকে প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের মনকে স্পর্শ করেছিল। এরকম এক অগ্নিগর্ভ পরিবেশে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলার পাঁচকাহানী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে ১৯০৯ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারী আমার জন্ম। পিতা গুরুচরণ সেন, মাতা নবদুর্গা দেবী। আমরা চার ভাই, তিন বোন। আমি ছিলাম সকলের ছোট। বয়স সঠিক মনে নাই। তবে খুব ছোট বেলা থেকেই দাদা দিদিদের হাত ধরে গ্রামের পাঠশালায় যাওয়া শুরু। 'স্বাধীন' 'পরাধীন' শব্দ দুটির পার্থক্য কি বুঝতাম না। কিন্তু ঘরে-বাইরে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, বাবা-মা, দাদা-দিদি, আত্মীয়-স্বজন, মুটে-মজুর সর্বত্র সকলের কাছে শুনতাম 'দেশকে স্বাধীন করতেই হবে', ইংরেজের বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম করতে হবে।" এইসব শুনতে শুনতে মনের অবচেতনে আমিও ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলাম। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা গ্রামের Kheruajoni M. E. স্কুলে পড়াশুনা শুরু করি কিন্তু নবম শ্রেণীর বেশী পড়া হল না। এখানেই দাদার বন্ধু বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ দেব, ভক্তিভূষণ সেন, শ্যামানন্দ সেন ও অনিল দত্তের সংস্পর্শে আসি। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই যুগান্তর বিপ্লবী দলের গৌরবজ্জ্বল নেতৃত্বে ১৯২৪-২৫ সালে ঐ দলেরই সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমি প্রথম যোগ দিই। গোপীনাথ* সাহার প্রস্তাবের জন্য সিরাজগঞ্জ সম্মেলন এক ঐতিহাসিক সম্মেলন হিসেবে চিহ্নিত এবং ঐ সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ করায় আমি

আজও গর্ব অনুভব করি। যা হোক্‌ স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার অভিষেকের সময় থেকেই আমি সুরেন্দ্র মোহন সাহার নেতৃত্বে দলের (যুগান্তর দলের) এক সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করি।

১৯৩০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন বাংলার অধিকাংশ স্থানের মত এখানেও (ময়মনসিংহে) কংগ্রেসের জেলা সংগঠনের নেতৃত্ব যুগান্তর দলের হাতে অর্পিত ছিল। ফলস্বরূপ কংগ্রেসের অহিংসা মন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও জোরদার রূপ দেওয়া যায়—এ ব্যাপারে আমরা বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। জেলার সর্বত্র আবগারী দোকানের সামনে আমাদের সফল পথসভাগুলিকে ব্যর্থ করার জন্য তখনকার ময়মনসিংহ জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষ—কেন্দ্রীয় আবগারী দপ্তর থেকে খুচরো দোকানদারদের মাল তোলার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিলেন এবং সাথে সাথে এই হুমকি দিলেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে মাল না তুললে তাদের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হবে। ময়মনসিংহের স্বাধীনতার যোদ্ধারা এই হুমকির মোকাবিলা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং তারা এর মোকাবিলার জন্য দুটি পথ বেছে নিল—একটি হল কংগ্রেসীদের অহিংস নীতি মেনে আবগারী দ্রব্যের অন্যত্র চালান বন্ধ করা আর দ্বিতীয় পথ হিসেবে বিপ্লবী ক্যাডারদেরকে বিভিন্ন স্থানে পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট করার কাজে মোতায়েন করা হল। সরকার পক্ষ থেকে জনগণের জমায়েতের ওপর অবিচ্ছিন্নভাবে লাঠি চার্জ এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালানো সত্ত্বেও আবগারী দ্রব্যের চালান চালু করতে পারল না। বরং গুলি নিঃশেষ হওয়ার পর ক্রোধান্ধ জনতার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে পুলিশ আবগারী দ্রব্যের গুদাম ঘরে আশ্রয় নিল। স্থানীয় থানার সাথে যোগা-যোগ করে কি করে আবগারী ডিপোর কাছে পুলিশের শক্তি আরও বাড়ানো যায় —এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর নিহত হলেন।

এই পুলিশ অফিসার নিহত হওয়ার পর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হল এবং বাধ্য হয়েই আমি আত্মগোপন করলাম। কিন্তু ১৯৩১-এর জুলাই মাসে ময়মনসিংহ শহরে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করল এবং আমাকে পুলিশ অফিসার খুন ও জামালপুর থানার সামনে সরকারের এক গোপন গুপ্তচরকে গুলি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল। মিঃ এঃ জিঃ অ্যালাইস নামে আলিপুরের এক সেসন জজকে নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ আদালতে জামালপুর ডাকবাংলোতে আমার বিচার হয় এবং বিচারে

আমাকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রথমে আমাকে রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হলেও পরে ১৯৩২ সালের ১লা মে আমাকে আন্দামানে সেলুলার জেলে চালান করে দেওয়া হয়। কুখ্যাত এই সেলুলার জেলে থাকা-কালীন আমাদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের দাবীতে আমি ৪৭ দিন ব্যাপী অনশন ধর্মঘটে সামিল হই। কিছু পাঠান বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জোর করে নাক দিয়ে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জোর করে নাক দিয়ে রবারের বল চালানোর ফলে আমার ফুসফুসের প্রচুর ক্ষতি হ'ল এবং কিছুদিনের মধ্যেই জ্বর, নিউমোনিয়া, রক্ত বমি শুরু হ'ল। আন্দামানের মেডিকেল বোর্ড আমার যক্ষ্মা হয়েছে বলে রোগ নির্ণয়ের সার্টিফিকেট দিলে—১৯৩৫ এর ডিসেম্বর মাসে চিকিৎসার জন্যে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হ'ল এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাঃ অমূল্য উকিলের চিকিৎসাধীন রাখা হ'ল। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে আমি শারীরিক ভাবে পঙ্গু হয়ে গেলাম।

কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ১৯৩৭ সালে আমি জেলখানা থেকে মুক্তি পাই—কিন্তু জেলখানার গেট থেকেই বি সি. এল. এ ধারায় আমাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৩৮ ডিসেম্বর অবধি আবার জেল হাজতে রাখা হয়। প্রথমে এক বছর প্রেসিডেন্সী জেলে রাখার পর বর্দ্ধমান জেলার কুলটি থানার অন্তর্গত নিমায়েতপুর গ্রামে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়। পরে ১৯৩৮ এর ডিসেম্বর মাস থেকে ময়মনসিংহ জেলার কোতয়ালী থানার পাঁচখানিয়া গ্রামে আমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়—এবং এখান থেকে জামালপুর থানায় পাঠানো হয়। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি মুক্তি পাই এবং মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে আবার গৃহবন্দী করা হয় এবং পরে ১৯৪১ এর ১লা তারিখে ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনে পুনরায় বন্দী করা হয় এবং ১৯৪৬ অবধি হিজলী, ঢাকা, বক্সাদুয়ার প্রভৃতি বন্দী শিবিরে ও প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে আমার সুদীর্ঘ ১৫ বছর ৮ মাস কারাবাসের অবসান ঘটে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শেষ হল। শুরু হল জীবিকা-সংগ্রাম। Transport service, Diary firm ; Biscuit factory ইত্যাদি ব্যবসা চালু করি

কিন্তু সবকটিতে বিফল হই। ১৯৫৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর আমি বিবাহ করি। স্ত্রীর নাম মায়া সেন। বিবাহের পূর্বে তার নাম ছিল মহামায়া দে। আমাদের কোন সন্তান নাই। আছে কেবল বার্ধক্যজনিত নানা অসুখ। আর আছে বুকের ভিতর নকল হৃদযন্ত্র।

বহু বছর হ'ল সব রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছি। ভারত সরকার তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছে।' এজন্য খুশি।

ফিরে দেখা

শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া

১৯১১ সালের ২রা মার্চ, টিকারামপুর গ্রামে (এটি মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত) নিম্ন-মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে জন্ম। তরেন্দ্রনাথ ও শোভাবতীর ২য় পুত্র। বাবা ও জ্যেঠা কাকার শিক্ষা মাঝারি ধরণের। সুরুচি সম্পন্ন এই পরিবারটি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন, সামাজিক আচার আচরণে, পূজা-পার্বনে অগ্রণী। ১৯২৮-এ গোপনে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, এবং ১৯৩০ শে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই মার্চ মাসে কংগ্রেস শিবিরে যোগদান করি। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত জেল, আন্দোলন, আবার জেল এইভাবে জীবন কাটে। ১৯৩৫-এর প্রারম্ভে গৃহে অন্তরীণ থাকতে হয়। ঐ বছর আই এ পড়ার জন্য কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হই এবং ১৯৩৯ সালে বি এ. পরীক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারিনি। ১৯৪০-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হই। কারাবাসে কাটে ছ'মাস। মুক্তি পেয়েই তমলুক মহকুমা কংগ্রেসে কাজ করতে থাকি—কর্মক্ষেত্র মহিষাদল থানা। ঐ সময় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, দেবরার নগেন্দ্রনাথ সেন ও ননীবালা মাইতির সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়। এরা গান্ধী চিন্তাধারার নামী দামী গঠন কর্মী নেতা। ১৯৪২-এর আগষ্ট সংগ্রামের আহ্বানে এলো সহিংস ও অহিংস বা বৈপ্লবিক সংগ্রামের নীতিগত দ্বিধা দ্বন্দ্বে কাটে বেশ কিছু দিন। পরে পরিষ্কার হয়ে যায় গান্ধী দর্শনে সুপণ্ডিত কাকা সাহেব-এর একটি প্রবন্ধ পড়ে। এর মূল দিক-দর্শক বিজয় ভট্টাচার্য (গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক)। তমলুকে তো অজয়দা, সতীশদা, রজনীদা ত্রয়ী চেয়েছিলেন তমলুকের আগষ্ট বিপ্লব যেন প্রয়োজনে সহিংস হতে ও পিছপা না হয়। গান্ধীজীর আহ্বান 'এই আমার শেষ সংগ্রাম' এবং কংগ্রেসের নির্দেশ 'ইংরেজ ভারত ছাড়'—এই দুই মহামন্ত্র সফল করতে তমলুক যেন কোনভাবে পশ্চাদপদ না হয়। সংগঠন কর্মী হিসাবে আমাকে পছন্দ করতেন বলে ঐ ত্রয়ী আমার মধ্যকার অহিংস ও সহিংস সংগ্রামী চেতনাকে এক ও অভিন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং নির্দ্বিধায় বলতে পারি তারা সফল হয়েছিলেন। চেতনা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরই একনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীক্ষুদিরাম

ডাকুয়া ও তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। ১৯৪০ এ সুতাহাটার গান্ধী আশ্রমে কুমারচন্দ্র জানার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি।

আমার গড়া 'বিদ্যুৎ বাহিনী' ও 'ভগিনী সেনা'কে তাই জাতীয় বাহিনীর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং আমাকে তাঁর প্রধান সেনাপতি পদে বৃত করে ছিলেন। 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ এবং এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ১৯৪৪ এর ১লা সেপ্টেম্বর। এই সরকারের সমর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীপদও আমাকে ও'রা দিয়েছিলেন—কেন তা আমি জানি না। এইটুকু বলতে পারি পূর্ণ পদে আমি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সঙ্গে কাজ করেছি--যা তার নির্মাতা ও পরিচালক ঐ ত্রয়ী গর্বের সঙ্গে বলতেন। এই সময় যে 'গরমদল' বা মৃত্যু বাহিনী তৈরী হয় তারও প্রধান পদে আমি বৃত হই। ছদ্মনাম 'বড়সাহেব'। ভগিনী সেনা গঠনে সুবোধদি, কুমুদিনী, উষা, জ্যোৎস্নার অবদান যথেষ্ট—আমার জাতীয় বাহিনীর প্রধান রূপে চিহ্নিত সতীশ, ধীরেন, প্রহ্লাদ, যদু, রাম, নরেন ও আশু সকলের দৃষ্টি কেড়েছিল।

১৯৩০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এবং পরে দমদম স্পেশাল জেল জীবনে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী এবং গনেশ সেন প্রভৃতির কাছ থেকে বিপ্লবের যে শিক্ষা পেয়েছিলাম ১৯৪২-৪৪ সালে তার সাফল্যপূর্ণ উত্তরণ করতে পেরেছি বলে আমি তৃপ্তি বোধ করি। এইখানে বলে রাখি দমদম স্পেশাল জেলেই আমি ছোরা ও লাঠি খেলা এবং যুযুৎসু শিখি—সতীশদার (সামন্ত) অনুপ্রেরণায়।

১৯৪৩ এ আত্মগোপন অবস্থায় একবার হঠাৎ ধরা পড়ে যাই। কারাগারে আটক রাখতে পারেনি বেশীদিন। আড়াই মাসের মধ্যে পলায়ন, অজ্ঞাতবাস, আত্মগোপন, কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি, সাতদিন পরে মৃত্যু (?) এবং অভিভাবকহীন মৃতদেহ (un-claimed dead body) নিমতলার শ্মশান ঘাটে পুড়োন প্রভৃতি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে—যা সত্য মিথ্যায় জড়ান এক ইন্দ্রজাল। আর তা আজও বহুজনের বিস্ময় ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাহিনী। এর সব কিছুর রূপকার যিনি, তিনি হলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। আমি যন্ত্র মাত্র, তিনিই যন্ত্রী. এই সময়ে ৯ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত সাড়ে তের শত গ্রামের এই ক্ষুদ্র জনপদে জনগণ যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছেন বহু বিদগ্ধ গোয়েন্দা অফিসারের তা আজ অজানা। এই সময় বৃটিশ সরকার আমাকে জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরার জন্য দশ হাজার

টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছিল তা দিবালোকের মতই সত্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতি চারণ

শ্রী অনাদি কুমার দত্ত

১৯৩০ সাল, মহাত্মাগান্ধী ডাক দিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ আইন ভঙ্গের।

আমাদের কুষ্টিয়া বিদ্যালয়ে ধর্মঘট। আমার বয়স মাত্র ১৪ বছর। আমিও যোগ দিলাম, সে কি উত্তেজনা! আমার কাজ ছিল মিছিলে যোগদান ও আবগারী দোকানে পিকেটিং ও প্রচার পত্র বিলি করা। পুলিশের হাতে বহুবার ধরা পড়তে হয়েছে নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। নেশাখোরদের হাতে নিগৃহীতও হতে হয়েছে। আমার দাদা জেলে গেলেন, আমরা সংগ্রামী সত্যাগ্রহী বলে পরিচিত হয়ে গেলাম। এই আন্দোলনের শেষভাগে মনে পড়ে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর লেখা স্বদেশী গান গেয়ে নগর পরিক্রমা।

আন্দোলনের অবসান হল। আমরা বিদ্যালয়ে ফিরে গেলাম। তারপর স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে। ১৯৪১-৪২ সালে ফলিত পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি. বি. এল ও বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পাশ করলাম। বিদেশী সরকারের ছবির তলায় এজলাসে বসে বা বহরমপুর মেরিকানগরে সহায়ক ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি সামনে, নিরুপদ্রপ জীবনের ইঙ্গিত। ১৯৩৫ সালে কুষ্টিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সবুজ সঙ্ঘের সভ্য হলাম। কলেজে পড়ার সময় ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে পড়লাম। তখন কম্যুনিজম তার কালো ছায়া এর উপর ফেলতে সুরু করেছে মাত্র। কুষ্টিয়া ফিরে এলাম। কুষ্টিয়া মহকুমায় ছাত্র ফেডারেশন গঠিত করে সভাপতি নির্বাচিত হলাম।

মহকুমা শাসক আমন্ত্রিত একটি সভায় আমি বৃটিশের যুদ্ধ উদ্যমে কৃত্রিম উপায়ে চাউলের অনটন ঘটিয়ে সৈন্য সংগ্রহের তীব্র নিন্দা করলাম। রাজরোষে পড়ে গেলাম। আমাদের বাড়ীতে তল্লাসীর নামে যথেচ্ছ ভাঙ্গচুর হল। গ্রামে গ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের আমরা, কংগ্রেসী ভাবাপন্ন ছাত্র ও যুবকেরা বৃটিশ যুদ্ধ উদ্যমের বাধা সৃষ্টি করবার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাতে লাগলাম, যে করে হোক ওদের সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে হবে—সঞ্চার ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে হবে। শস্য বৃটিশ এজেন্টদের কাছে বিক্রি না করবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলাম। ৯ই আষাঢ় ১৯৪২ সালের গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো'

আন্দোলনের ডাক আমাদের উৎসাহিত করল। এই বছরেই সেপ্টেম্বরে আমাকে ওয়ারেণ্ট জারি করে ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর গ্রামে পুলিশ আমাকে বন্দী করল। প্রায় ৫ মাইল কোমরে দড়ি ও হাতে হাত কড়া পরিয়ে, পায়ে হেঁটে রেলওয়ে ষ্টেশন পাংশা ও পরে কুষ্টিয়া হাজতে. পরদিন সকালে কুষ্টিয়া জেলে সেখানে আমাদের দলের আরও ৬ জন। অভিযোগ আমরা টেলিগ্রাফ তারের ক্ষতি করেছি ও অন্যান্য ক্ষতি করবার প্রয়াস নিচ্ছি। বিচার চলতে লাগল। মাঝে মাঝে আদালতের পাশে খাঁচায় থাকা ও আবার দিন পড়ায় জেলে ফেরা।

বিদেশী চাকরির মোহ ভেঙ্গে গেল। আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হয়ে গেলাম। জেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা হল। সরকার সেলামের জন্য আমাদের সাতজনের আবাস একটি ক্ষুদ্র কক্ষ খুলে দেওয়া হত সকালে, টাকা টাকা (এক লাইনে ২ জন) করে বসতে বলা হল। আমরা স্বভাবতই অস্বীকার করলাম। প্রথমে মৃদু অত্যাচার তারপর তীব্রতা বাড়তে লাগল। মহকুমা শাসকের কাছে নালিশ জানাল হল। তিনি এলেন, সঙ্গে ডেপুটি জেলর, পুলিশের কর্তারা। খুব ধমকালেন, বল্লেন এরপর নিয়ম রক্ষা করতে আপনাদের উপর প্রয়োজন মত দৈহিক নির্যাতন চলবে। আমি জানতাম যে তিনি বি. সি এস। বল্লাম আপনি যে হুকুম চালাচ্ছেন, যে আসনে বসে, আমিও ঐ আসনের অধিকারী ছিলাম। তিনি থমকে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কোন সালের, বল্লাম '৪১ এর। বোধ হয় তাঁর মনে সৌভ্রাত্রের, সমগোষ্ঠির ছোঁয়াচ লাগল। সব উল্টে গেল, তাঁর হুকুমে আলাদা করে জলের ব্যবস্থা হল, সরকার সেলাম প্রভৃতির জন্য যে অত্যাচার সুরু হয়েছিল, বন্ধ হল। ইতিমধ্যে আমরা অনশন করে যে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করেছিলাম, বহাল রইল। পচাবেগুন, পোকাপড়া ডাল এর জায়গায় ভাল জিনিস দেওয়ার হুকুম হয়ে গেল। আমাদের কুশলাদি নেবার পর বিদায় নিলেন। ভালই কাটতে লাগল বাকী দিনগুলি তারপর। কয়েদীরা আমি উকিল জেনে খুবই সেবা করত, বাসন মেজে দিত, স্নানের জল তুলে দিত, কাপড় ধুয়ে দিত। জেলে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অবশেষে প্রায় দুমাস পরে বিচারে আমাদের ৬ জনের মুক্তি হল। একজনের ৯ মাস কারাদণ্ড হল, কিন্তু আমার বেলায় রায়ে হুকুম হল গৃহে অন্তরীন থাকতে হবে। কারো সঙ্গে কথা বার্তা বলা ও সাক্ষাৎ করা চলবে না। প্রতিদিন ২ বার করে থানায় পুলিশ পাহারায় নাম সহি করে যেতে হবে। বাড়ীর সামনে পুলিশ বসিয়ে রাখা হল। এরকম করে ছয় মাস চলবার পর মুক্তি হল। বঙ্গবাসী

কলেজের কুষ্টিয়া শাখায় লেকচারার হলাম, চলতে লাগল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা মাঝে মাঝেই। ৪৪ সালে দিল্লিতে একটি কলেজে চাকরি নিয়ে চলে এলাম। তারপর ৪৮ এ স্বাধীনতার পর আকাশ-বাণীতে চাকরি। কটক, কলকাতা, পাটনা, গৌহাটি, কোহিমা, মনিপুর প্রভৃতি জায়গায় চাকরি আকাশবাণীতেই। কলকাতায় থাকবার সময় ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মান আইনের জন্য বেতার মন্ত্রীকে সভায় বলাতে শাস্তি পেতে হল, অনিবার্য গৌহাটিতে বদলি, প্রচুর আর্থিক ও ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হল, ৭০ সালে দিল্লীতে বদলি, অবসরের দিন পিছিয়ে গেল ২ বছর। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া ও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা শেষ না হওয়ায়, অবশেষে ৭৬ সালে মাত্র ২৭ বছর সরকারি চাকরীর পর অবসর নিলাম। দিল্লীতে কয়েক বছর জেলা ও হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবার পর উচ্চ রক্তচাপের জন্য নাক মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণের জন্য এই লাভ দায়ক বৃত্তি ছেড়ে কলকাতা চলে এলাম ও দক্ষিণ কলিকাতা স্বাধীনতা সংগ্রামী সঙ্ঘের আহ্বায়ক হলাম। বৃদ্ধ বয়সেও রাজ-নৈতিক কাজ, প্রবন্ধ লেখা ও দুস্থ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় সাহায্য করা, স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিতরণ এ কংগ্রেস চালিত আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান প্রভৃতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

স্বাধীনতা লাভের পর ৪৯ এ বিবাহ, স্ত্রী নীলিমার মামা শ্রীপরেশ চৌধুরী আন্দামান সেলুলার জেলে জীবনের অমূল্য সময়—স্বাধীনতার মূল্যে দিয়ে এসেছেন।

স্মৃতিচারণ

শ্রী পরিতোষ বোস

আমার জন্ম ইং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ (বাংলা ১৩২৫ সনের ৯ই চৈত্র) পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) যশোর শহরে। আমাদের আদিনিবাস ছিল নারায়ণপুর গ্রামে। আমার পিতা ৺অক্ষয়কুমার বসু ছিলেন যশোরের বিশিষ্ট আইনজীবী। মাতা চারুশীলা দেবী। আমরা চার ভাইবোন—আমি কনিষ্ঠতম।

আমার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ছাত্রকর্মী হিসাবে। "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা" গ্রন্থে যশোর ছাত্র আন্দোলনের বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী হিসাবে আমাকে চিহ্নিত করা হ'য়েছে (পৃঃ ১৬৭)।

১৯৩৭-৩৮ সালে যশোরের ছাত্র আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও চিন্তাধারা জাতীয় ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সময়ে আমরা কয়েকজন ছাত্র শঙ্কর রায়চৌধুরী, ব্রজগোপাল ধর, সুধাংশু বসু, সুবোধ রায়, সেবী রায়, অনিল সিংহ, অধীর ঘোষ, শান্তিময় রায় এবং আমি সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ছাত্র ফেডারেশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের সঙ্গে তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির যোগাযোগ ছিল।

প্রসঙ্গতঃ ডাঃ রণেন সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি ও সোমনাথ লাহিড়ী ১৯৩৫ সালে গোপনে এসে যশোরের কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সাথে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনসম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন এবং কৃষ্ণবিনোদ রায় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনে উৎসাহ প্রকাশ করেন। এই আলোচনার পরিণতি কৃষ্ণবিনোদ রায় ও তাঁর অনুগামীদের ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। এর মধ্যে আমিও ছিলাম।

১৯৩৭ সালের মে মাসে যশোর জেলা বোর্ড মাঠে যে প্রথম যশোর জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলাম আমি। এই সম্মেলনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন মুসলমান কৃষক।

১৯৩২ সালের ২৩শে মার্চ ভগৎসিং এর ফাঁসির দিনে ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা করবার অপরাধে গ্রেপ্তার হই এবং ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করি। এই সময়ে যশোরের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ৺বিজয়চন্দ্র রায় আমার সাথে জেলে ছিলেন। শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্তও ঐ সময়ে যশোর জেলে একজন ডেটিনিউ হিসাবে ছিলেন।

১৯৩৮ সালে সম্মিলনী স্কুলের ছাত্র ধর্মঘটের জন্য সদর এস. ডি. ও. কর্তৃক ৩ মাসের কারাদন্ড হয়। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কিছুদিন আত্মগোপন করতে হয়। এসময়ে আমি শহরের ১ মাইল দক্ষিণে চাঁচড়া গ্রামে সুধাংশু বসুর বাগান বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। তারপর কেশবপুরের অদূরে আলতাপোল গ্রামে ৺ভুবনধরের মেয়ের বাড়িতে ছিলাম। পাঁজিয়া এবং নারায়ণপুরে কিছুদিন থাকার পর ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে লেখক মনোজ বসুর বাড়ীতে ছিলাম। ঐ সময়ে ঐ গ্রামের বিদ্যুৎ বসুর বাড়িতেও ছিলাম।

বে-আইনী পত্রপত্রিকা রাখার অপরাধে ১৯৪১ সালে ৬ মাসের জন্য জেলে ছিলাম।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে এসে জীবনধারণের জন্য ব্যবসা শুরু করি।

সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনকথা

শ্রী সাতকড়ি সামন্ত

১৯৩২ সাল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সুদূর পল্লী অঞ্চলেও যখন অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই মহালগ্নে "বন্দে মাতরম" ধ্বনিতে মাত্র নয় বৎসরের বালক এমনই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর গ্রামের শ্রীভক্ত ভূষণ সোম মহাশয়ের তত্বাবধানে শ্রীমতী নির্মাল্য সান্যাল নাম্নী একজন বীরাঙ্গনা আয়োজিত স্বদেশী সভাকে, সেই বালক স্বেচ্ছাসেবকটি তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা কাঁধে, মুখে "বন্দেমাতরম" ধ্বনিসহ যখন সে বিভিন্ন গ্রামের পথে পথে ঘুরেছিল তখনই কোন অশ্রুত মন্ত্রে তাঁহার জীবনে রাজনীতির বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল সেই শিশুটিই শ্রীসাতকড়ি সামন্ত। বর্ধমান জেলার পলসোনা নামক গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে সাতকড়ির জন্ম হয়। স্বর্গীয় শ্রীপদ সামন্ত মহাশয়ের পাঁচপুত্র ও এক কন্যার মধ্যে সাতকড়ি ছিল চতুর্থ।

১৯৩৫ সাল। যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তখন এই বালকটি স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায়। আইন সভার নির্বাচনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীপ্রমথনাথ ব্যানার্জ্জীর পক্ষে শ্রীদাশরথি তা মহাশয়ের নির্দেশে সাতকড়ি বহু সভার আয়োজন করে নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও শ্রীসামন্ত বঙ্গীয় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, ছাত্রদের কিছু অধিকার এবং অভিভাবকগণের কিছু সুযোগ সুবিধা অর্জনই তখন সেই ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল।

১৯৪১ সাল পুটশুরী ঈশ্বর প্রসাদ ইনষ্টিটিউশন এর শ্রীসামন্ত যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য মহশেয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের একান্ত অনুগামী হিসাবে ভারতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধ বিরোধী নীতির প্রতিকূলে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৪২ সাল। মহাত্মা গান্ধীসহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে ৮ই আগস্ট রাত্রে কারারুদ্ধ করা হল। মহাত্মাজী "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দিয়ে গেলেন। অগ্নিগর্ভ সেই আহ্বান শ্রীসামন্তের হৃদয়ে এক নূতন জীবন দর্শনের দিক নির্দেশ করে। শ্রদ্ধেয় গান্ধীবাদী নেতা শ্রীভক্ত চন্দ্র রায় মহাশয়ই শ্রীসামন্তের রাজনৈতিক গুরু।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী সাতকড়ি। অভিভাবকেরা চেয়েছিলেন তাঁকে অর্থ উপার্জনের যন্ত্র রূপে গড়তে, কিন্তু মাতৃমুক্তি মন্ত্রে যাঁর হৃদয় ভরপুর, তিনি কি পারেন গতানুগতিক জীবনের পথে চলতে! পূটশুরীকে কেন্দ্র করে শ্রীসামন্ত এবং আরও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী কালনা, মন্তেশ্বর এবং কাটোয়া থানার বিভিন্ন কোর্ট-কাছারি, বিভিন্ন সরকারী অফিস, মাদক দ্রব্য বিক্রয় বিপনিতে আক্রমণ, পিকেটিং ও সকল প্রকার আন্দোলন সফল করেন। জমিদার শ্রেণী দালালদের আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করা সত্ত্বেও মন্তেশ্বর থানা দখল আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্র সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তীব্রতা। পুলিশের তীক্ষ্ম দৃষ্টি যখন তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল তখন বর্ধমান জেলার রাজনৈতিক নির্দেশক দাশরথি তা তাঁদের কাজকর্ম বর্ধমান সদর মহকুমাতেই সীমাবদ্ধ করেন। তদনুযায়ী শ্রীসামন্ত আরও ছ'জন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভাতার থানার বিভিন্ন স্কুল বন্ধ করে, সরকারী অফিস, থানা, রেল ষ্টেশনে পিকেটিং আরম্ভ করে জনজীবনকে স্তব্ধ করে দেন। শুরু হলো গোপন আস্তানার সন্ধান, শিকারী কুকুরের তীক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়লো। স্থানীয় উচ্ছিষ্টভোজী বৃটিশ সরকারের তল্পিবাহক অনুগ্রহাকাঙ্খীদের কয়েকজন গোপনে স্বদেশী-সেনাদের সংবাদ সরকারের নিকট প্রেরণ করেন, সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ এই সুযোগের অপব্যবহার না করে গোপনেই জাল বিস্তার করে। এই সময়টিই ছিল তাঁর পক্ষে সর্বাপেক্ষা কষ্টের দিন। পূটশুরী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রাবাস হতে তাঁর অপসারণ, কোন দিন অর্ধাহারে, কোনদিন অনশন, গেপেনে চলাফেরা, এইভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়।

১৯৪২ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর দিনের ক্লান্তির শেষে যখন তাঁরা ভাতার চটীর কোন একটি আস্তানায় নিদ্রার কোলে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন তখন মধ্যরাত্রে অতর্কিত খট খট শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়, দেখতে পান বিরাট পুলিশ বাহিনী বন্দুক খাড়া করে ঘিরে ফেলেছে। সদর্পে বলে উঠল দেশদ্রোহের

অপরাধে আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল। পশু শক্তির নিকট নৈতিক শক্তির পরাজয় ঘটল। স্বাধীনতাকামী সৈনিকরা "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করল। পথিমধ্যে আরও ছয়জনের একটি দলকে এনে একত্রিত করল। রাত্রে ভাতার থানায় আটকে রাখা হল।

১৬ই সেপ্টেম্বর মাননীয় বর্ধমান জেলা বিচারকের আদালতে বন্দীদের আনা হল। বিচারক মহাশয় তেরজনকেই জেল হাজতে পাঠাবার নির্দেশ দেন। হাজতবাস বন্দীদের নিকট ছিল এক অসহনীয় নরক বাস, গোয়েন্দা অফিসার প্রায়ই হাজতে গিয়ে যে ব্যবহার করতেন তাতে তাঁকে পশু ছাড়া কিছু বলা যায় না। অসামাজিক, অমানবিক, বাক্যবাণে জর্জরিত করতেন। নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করে মহামন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিকদের তাঁদের পথ হতে ফেরার জন্য মুচলেকা লেখাবার চেষ্টা করতেন। পরিতাপের বিষয় অন্ধকার কারাগারে দুর্বিষহ জীবন কাটাবার সময় শ্রীসামন্ত তাঁর স্নেহময়ী পিতামহীকে হারান।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করায় প্রায় তিনমাস পরে বিচারক শ্রীসিরাজুল হককে ভারত রক্ষা আইনের ৩৮/১ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এইবার শুরু হল কয়েদের শাসন। বর্ধমান জেলে কয়েদিদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক ব্যবহার নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদ জানানোর জন্য পাগলা-ঘণ্টা ও লাঠিচার্জ হয়। লাঠিচার্জে শ্রীসামন্তের ডান হাতের চতুর্থ আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনশন আরম্ভ করেন এবং শ্রীসামন্ত ৭২ ঘণ্টা অনশনের পর নেতৃবৃন্দের নির্দেশে অনশন ভঙ্গ করেন সুবিচারের পর। পলসোনা গ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান, জেলা তথা সমস্ত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মগোপনের একটি বড় ও সুরক্ষিত আস্তানা। সুতরাং ডিসেম্বর ৪৩ সালে তাঁর কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও গোয়েন্দা রিপোর্ট সাপেক্ষে পুনরায় তাঁকে নিরাপত্তা আইনে কিছুদিন আটকে রাখা হল। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সারা বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে। জেলখানাতেই অবগত হয়ে শ্রীসামন্ত বিচলিত হন। কারাপ্রাচীর হতে বেরিয়ে এসেই বেসরকারী সাহায্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তাঁহার গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৬ সাল। লীগ শাসনের আমলে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ ও ঈর্ষা যখন

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপ নেয়, শ্রীসামন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় রাখতে অশেষ চেষ্টা করেছিলেন। বরিশাল, ঢাকায় সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলছে। মহাত্মা গান্ধীর শান্তি মিশন যাত্রায় তিনি অংশ নেন ও কলিকাতা পর্যন্ত সহযাত্রী হন।

১৯৪৭ সাল ১৫ আগষ্ট বহু আকাঙ্ক্ষিত মাতৃমুক্তির দিন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না এলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা শত সহস্র শহিদের প্রাণ বলি ও রক্তের বিনিময়ে এসে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও খণ্ডিত ভারত মেনে নিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কায়েম করার জন্য নূতনভাবে সচেষ্ট হলেন শ্রীসামন্ত। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার প্রয়াসে সমবায় আন্দোলনে নিজেকে জড়িত করেন। বিভিন্ন ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন এমন কি জেলার শীর্ষ সমবায় সংস্থা পরিচালনা করেন, জেলা ২ নং সমবায় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিন সভাপতি পদে ছিলেন—তিনি গ্রামীন কুটীর শিল্পে বিশ্বাসী। বর্ধমান গ্রামোদ্যোগ সংঘের সভাপতি, লোক সমিতি কাটোয়া-র সভাপতির পদে থেকে বিভিন্ন স্থানে কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের এবং খাদি উৎপাদনের সহিত জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সর্বভারতীয় পোষ্টাল ইউনিয়ন (ই. ডি.) এর সভাপতি এবং সর্বভারতীয় ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল পোষ্টাল অর্গানিজেশন-এর এ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারী জেনারেল পদে আসীন থেকে সমাজ সেবায় ব্রতী রয়েছেন। জেলা তথা প্রাদেশিক দুস্থ ও উপেক্ষিত পোষ্টাল কর্মী (ই ডি) দের তিনি দীপ বর্তিকা।

স্বদেশ সেবার কিছু স্মৃতি
শ্রী রমণী মোহন মাইতি

১৯০১ সালের চোদ্দই ফেব্রুয়ারী মহিষাদল থানার টাটারিবাড় গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। পিতা—রতন মাইতি, মাতা—কুমারী। সাত মাস বয়সে পিতাকে হারাই। মা ও কাকা দুজনে আমাকে ও আমার বড় দুই ভাইকে অতি যত্নে পালন করেন। কাকার কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। তখন বড় দাদার দশ বছর ও মেজ দাদার পাঁচ বৎসর বয়স ছিল।

বাড়ীর নিকটে প্রাইমারি স্কুলে পড়া শেষ করে সুতাহাটার দিকে চৈতন্য পুরের নিকটে দেউলি পোতা মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সেখানকার শিক্ষক মহাশয়দের দয়ার মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রেরিত হই এবং মাসিক চার টাকা বৃত্তি লাভ করি। বড় দাদা গুরু ট্রেনিং পাশ। প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় তমলুক হ্যামিলটন স্কুলে ভর্তি হতে পারি। ওখানে পাঁচ বৎসরে শিক্ষক মহাশয় গণের অনুগ্রহে পড়া শেষ করি। প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের আমি প্রথম ছাত্র ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হই ১৯২০ সালে। আমার উপরের ক্লাসে ছিলেন—শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী, রজনী কান্ত প্রামানিক, আনন্দ মোহন দাস, হংসধ্বজ মাইতি প্রমুখ। অজয় বাবু স্বাধীন ভারতে বিধানচন্দ্র রায় এর মন্ত্রী সভায় সেচ মন্ত্রী ছিলেন—রজনী বাবু উপমন্ত্রী ছিলেন। আনন্দ বাবু, হংসধ্বজ বাবু প্রমুখ সকলেই স্বাধীনতা যোদ্ধা বলে পরিচিত ছিলেন। ঐ সময়ে (১৯১৫—২০) মহিষাদলে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী অন্তরীণ ছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য সতীশ কুমার সামন্ত পরে লোকসভার সদস্য হন। আমি স্বামীজীর দর্শন পেয়েছি। সতীশ চন্দ্রের নাম হলদিয়া নামের সঙ্গে জড়িত। আমার সঙ্গে তাঁর আজীবন সহকর্মীর সম্পর্ক।

আমি মেদিনীপুর কলেজে ১৯২০ সালে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। তখন ওখানে কেবল I. A. ও I. S. C. ছিল। পরবর্তী সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এল। আমরা কলেজে ছেড়ে স্বাধীনতার স্রোতে ভেসে গেলাম। ভবিষ্যৎ কি হবে কি হবে না তা ভাবার সময় ছিলনা। মহাত্মাজীর ডাকে স্বরাজ লাভ করতে হবেই। সঙ্গীরা কেউ কেউ পরে কলেজে ফিরে গেলেও আমি আর যাইনি। মেদিনীপুরের বড় বাজারে এক স্বদেশী কাপড়ের দোকানে কিছু দিন

কাজ করার পর বাঁকুড়ার ন্যাশানাল কলেজে গেলাম। ওখানে নেতা ছিলেন অধ্যাপক অনিল বরণ রায়। তাঁর কাছে কলেজের পড়া ও শিক্ষকতা চলতে থাকল। মহাত্মাজীর আন্দোলনের প্রচার করতাম। গঙ্গাজল ঘাটী ও সোনা-মুখিতে ন্যাশনাল স্কুল হয়ে ছিল। নেতা ছিলেন গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ ও শিশুরাম মণ্ডল। সোনামুখিতে পরে আমাকে পাঠান হয়। সেখানে সঙ্গী পেলাম বাবু কমল কৃষ্ণ রায়, ধীরেন্দ্র নাথ দাসকে। কমল বাবু পরে মন্ত্রী হন—ধীরেন বাবু ভগবানপুর থানার সর্বাধিনায়ক হন ১৯৪২ সালে। সোনামুখির স্মৃতি আমার জীবনে অবিস্মরণীয়।

১৯২২ সালের পর পট পরিবর্তন হল। একটু ভূমিকা দরকার। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ মহিষাদলেও লাগল। এখানে একদল নিবেদিত প্রাণ বীর সন্তান সঠিক পথেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা মহিষাদল থেকে দুই মাইল দক্ষিনে কাঁকুড়দা গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে ছিলেন—গুণধর হাজরা, সতীশচন্দ্র সামন্ত, ভবতোষ দাস প্রমুখ। স্থানীয় জমিদার বাড়ীর পূর্ণচন্দ্র মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, প্রভৃতিরা সহায়ক ছিলেন। আমি একদিন সোনামুখিতে পত্র পেলাম পুলিশ গুণধর বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি যখন তাঁর শিশু পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে শ্রাদ্ধ করতে বসেছিলেন তখন পুলিশ ওয়ারেণ্ট নিয়ে আসে। অসহযোগ প্রচারের জন্য তাঁর দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। তিনি মেদিনীপুর জেলে আটক হন, আমি এ'খবর পেয়ে কাঁকুড়দাতে পত্র লিখি এবং নির্দেশ মত সোনামুখি ত্যাগ করে এখানে এসে যোগ দিই। ততদিনে যোগেন বাবু ও পূর্ণ বাবু গ্রেফতার হয়েছেন। কাঁকুড়দা স্কুলে তখন ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, গোরাচাঁদ গিরি, শ্রীপতিচরণ বয়াল, ভবতোষ দাস প্রভৃতি। আমার সহপাঠী বিজয় কৃষ্ণ মাইতিও যোগ দিলেন। আমাকে তাঁর বাড়ীতেই আশ্রয় দেওয়া হল। কয়েকদিন বাদে পুলিশ শ্রীপতি বাবু ও ভবতোষ বাবুকে ধরে নিয়ে গেল। আরও কয়েকদিন বাদে গোরাচাঁদ বাবুও ধৃত হলেন। ধৃত ব্যক্তিরা কেউ আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন না। তাঁদের সাফ উত্তর ঃ—আমরা কোন উত্তর দেবনা। একদিন সকালে স্কুল চলছে—এক টেলিগ্রাম এল, মেদিনীপুর জেলে গুণধর বাবুর মৃত্যু হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় তিনি মারা গেছেন। আমরা তখন স্কুলের নামের সঙ্গে তাঁর নাম যোগ করে দিলাম। পরে ওখানে গোরাচাঁদ বাবু ও তাঁর বন্ধুদের উৎসাহে আমি 'পথিক' নামে এক সংবাদ পত্রের প্রকাশক হয়ে গেলাম। উক্ত পত্রিকার পক্ষ থেকে

কাঁথি শহরে ১৯২৫ সালে গান্ধীজীর দর্শন পাই ও তাঁর সভার বিবরণ সংগ্রহ করি। তার পরে আন্দোলনে মন্দা আসে। দেশবন্ধু দেহত্যাগ করেন। আমি ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে জনৈক সেবক রূপে অতিবাহিত করি। ইতি মধ্যে লবন সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সতীশ বাবুকে পেডী সাহেব গ্রেফতার করে। আগের দিন হংসধ্বজ বাবু গ্রেফতার হন। দেশ তখন তোলপাড়।

১৯৩২ সালে দক্ষিণ কাশিম নগরে একটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন হয় এবং আমি তাতে যোগ দিই। ঐ বিদ্যালয় পরে হাইস্কুল হয়। আমি ১৯৬২ সালে শিক্ষক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করি। ঐ সময়ে বহুবিধ সমাজ সেবার কাজে যুক্ত ছিলাম। কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন হয়। ফজলুল হক সাহেব প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে প্রধান মন্ত্রী হন। পঞ্চায়েত চালু হয় ১৯৩৭ সালে। আমি প্রথম থেকেই পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হই।
২৫ বৎসর আমি পঞ্চায়েত এর প্রধান ছিলাম। পরিষদে ছিলাম ১০ বৎসর। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত জুরি ছিলাম। ১৯৫৪ থেকে ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্ট চালনা করি। গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপন করি ১৯৩৯ সালে।—পরিচালক ছিলাম ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। এখনও সভ্য আছি। সেন্ট্রাল ব্যাংকে ডিরেক্টর ছিলাম কিছুকাল। ১৯৩৮—১৯৪৪ ঋণ সালিশী বোর্ডে মেম্বার ছিলাম।

বলতে পারি আমার ওপর সবার অশেষ দয়া। মহিষাদল প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মেম্বারদের মধ্যে শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া ও আমি এখনও বর্তমান। স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল মহাশয়ের আমি অতি পরিচিত—সতীশবাবু তাঁরই ছাত্র। প্রসিদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ বাবু, যতীন্দ্রনাথ ভুঁইয়া প্রভৃতির সঙ্গে সারা জীবিতআছি—সুতাহাটার কুমার চন্দ্র জানা মহাশয়-এর আমি স্নেহধন্য ছিলাম। এক সময়ে ভারত সেবক সমাজের মুখ্য কর্মী ছিলাম। ভারত বিখ্যাত গুলজারিলাল নন্দ মহাশয়ের ঐ প্রতিষ্ঠানে সতীশবাবু আমাকে নিয়োগ করেন।

অপরদিকে বহু সাধু মহাত্মার দর্শন আমি লাভ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে আমি বহুবার দর্শন করেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে অন্যতম স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) আমায় কৃপা করেন ১৯২৯ সালে।

আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যতটুকু ত্যাগ করেছি তা নিতান্ত অল্প মনে করি। আমার সঙ্গিগন আমাকে দয়া করে সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ—আমি কোনরূপ প্রার্থনা করি নাই— অযাচিত দয়া ও অনুগ্রহ লাভে আমি ধন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুগ্রহই আমার শেষ জীবনের সম্বল।

শহীদ ক্ষুদিরাম আমাদের বড় ভাইয়ের মত ছিলেন। তিনি যে স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন সৌভাগ্য ক্রমে আমিও সেই হ্যামিলটন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমার সঙ্গীরা অনেকেই চলে গেছেন, আমি একা দাঁড়িয়ে আছি এক নিঃসঙ্গ "পথিক"।

———

স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিকথা

শ্রী হেরম্বকুমার ঘোষ

আমার জন্ম ১৯১৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার ঢাকা জেলার টঙ্গী বাড়ী থানার অন্তর্গত বাঘিয়া গ্রামে। আমার পিতার নাম ৺শ্রীনাথ ঘোষ। তিনি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা গ্রামে একটি প্রেস চালাতেন। প্রেসটির নাম ছিল শ্রীনাথ প্রেস। আমার বয়স যখন মাত্র ৭ বৎসর তখন তিনি দেহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবনলাল ঘোষ প্রেস চালাতেন এবং এরই আয়ে আমাদের সংসার যাত্রা নির্বাহ হত।

আমি ভাঙ্গা হাই স্কুলে পড়তাম এবং এখানেই আমার প্রথম রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়। আমাদের সকল রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হত মাদারিপুরের ওল্ড যুগান্তর গোষ্ঠীর যতীন ভট্টাচার্যের নির্দেশে। তিনি ছাড়া ঐ গোষ্ঠীর নলিনী গুহ, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, প্রমথ ব্যানার্জী ইত্যাদির সংস্পর্শেও আমরা এসেছিলাম। যতীনদার নির্দেশ মত আমরা ভাঙ্গা গ্রামে "শান্তি কুঞ্জ" নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেছিলাম এবং এর সমাজসেবা বিভাগের নামে সাধারণের কাছ থেকে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করতাম। সংগৃহীত চালের একটা অংশ আমরা দীন-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করতাম এবং বাকি অংশ বিক্রয় করে পত্র-পুস্তক ক্রয় করতাম। আমাদের সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত ওরফে কালাচাঁদ, নিরঞ্জন দে, জ্যোতিষ সরকার ইত্যাদি।

এছাড়া আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন গড়বার জন্য চেষ্টা করতাম। এই সব কাজের জন্য আমরা পুলিশের নজরে পড়ি। সেই সময় পুলিশ প্রায়ই আমাদের থানায় নিয়ে গিয়ে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করত এবং রাজনীতি ছেড়ে দেবার জন্য আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় জীবনলাল ঘোষও গোপনে আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেক বে-আইনী লিফলেট আমাদের প্রেস থেকে ছাপানো হত। এজন্য আমাদের প্রেসের উপরও পুলিশের নজর পড়েছিল এবং ডি, আই, বি থেকে প্রায়ই আমার দাদাকে শাসানো হত। এছাড়া স্থানীয় অনেক যুবক-যুবতী ও গৃহ বধূরা পরোক্ষভাবে আমাদের আন্দোলনকে সাহায্য করতেন।

অনুমান ১৯৩৯ সালে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারের এম, পি নির্বাচনের সময়ে শিবকুমার সিংহ নামে একটি বিহারী ছাত্রকে কলকাতা থেকে পাঠানো হয় এখানে নির্বাচনী প্রচারের জন্য। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। নির্বাচনে হেমপ্রভা দেবী জিতেছিলেন। এই শিবকুমার সিংহ পরবর্ত্তীকালে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার মানসে পদব্রজে বর্মার দিকে রওনা হন এবং ইমফল পর্যন্ত যান। আর অগ্রসর হতে না পেরে তিনি ফিরে আসেন এই ভাঙ্গা গ্রামে। এই খানেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং সেই সঙ্গে আমি ও অরুণ দাশগুপ্ত নামে আরো একজন রাজনৈতিক কর্মী পুলিশ কর্তৃক ধৃত হই। শিবকুমার সিংহকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয় এবং আমাকে ও অরুণকে গৃহ-অন্তরীণ করা হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৯৪১ সালে।

পরের বছর ঐতিহাসিক "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু হয়। আমি গৃহঅন্তরীণ থেকেও আন্দোলনে অংশ নিতে থাকি। সারা দেশ জুড়ে যখন আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে সেই সময় ভাঙ্গা গ্রামের মানুষ পিছিয়ে ছিল না। নানা জায়গায় সভা-সমিতি ও মিছিল সংগঠিত হয়। এই সময় একটি বিশাল মিছিলের গতি পুলিশ কর্তৃক রুদ্ধ হলে জনতা অশান্ত ও হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু লোক আহত হয় এবং ভাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শ্রীরোহিনী ঘোষ নিহত হন।

এই ঘটনার পর আমি আত্মগোপন করি। কিন্তু কয়েকদিন পরেই পুলিশ আমাকে ফরিদপুর শহরে গ্রেপ্তার করে ও অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করার জন্য বিচারে আমার ছয় মাস জেল হয়। কিন্তু ছয় মাস জেলের সাজা ভোগ করে যেদিন মুক্তি পাই, সেইদিনই পুলিশ আবার আমাকে জেল গেটেই গ্রেপ্তার করে এবং সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে আবার কারারুদ্ধ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঐ জেল-খাটার সময়ই পুলিশ আমাকে এবং আরও ২৭জনকে দারোগা হত্যার জন্য আসামী করে একটি মামলা রুজু করেছিল এবং সেই মামলায় আমার দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এই সময় জেলে থাকা কালেই আমি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করি। প্রথমে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা (ম্যাট্রিক) পাশ করি, তারপর মোক্তারি পরীক্ষা পাশ করি। এরপর আমার কারাদণ্ড শেষ হতে আমি মুক্তি লাভ করি। আমি বাড়ী ফিরে আসার এক মাস পর দেশ স্বাধীন হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকার আমার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করে। তখন আমি বাধ্য হয়ে গোপনে কলকাতায়

চলে আসি। বর্তমানে আমি বারাকপুরের মনিরামপুর গ্রামে বসবাস করছি।

সংগ্রামী জীবনের কিছু কথা

শ্রী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী

ছেলেবেলায় যখন আমি প্রায়ই মামার বাড়ী যেতাম তখনই ছোট মামার বন্ধু স্বর্গীয় নিরঞ্জন ঘোষালের সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন আমার বয়স বছর ১৪ হবে, একদিন নিরঞ্জন ঘোষাল আমাকে পালং থানার অধীন তালশার গ্রামে 'সীতানাথ দে' নামে এক মুক্তি বিপ্লবীর বাড়ীতে নিয়ে যান। এই সীতানাথ দে আমাকে ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের ব্যাপারে অবহিত করান, তখনই আমি দেশের মাটি থেকে বিদেশী শাসকদের অপসারণের গুরুত্ব উপলব্ধি করি। বলা যায়, এটাই ছিল স্বাধীনতা মন্ত্রে আমার দীক্ষা। কারণ, এরপরই আমি ঐ অল্প বয়সেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সরাসরি যোগ দিই। প্রথমে আমি আমার ছোট মামা আশুতোষ চ্যাটার্জি, নিরঞ্জন ঘোষাল এবং সীতানাথ দের সহযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় অত্যাচারের ওপর বক্তৃতা দিতাম। পরে আমি ছাত্রদের শরীরবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ক্লাব খুললাম। বলা বাহুল্য আমার এ সব কাজে অনুশীলন সমিতির সহায়তা ও মদত ছিল। তখনকার দিনে এই অনুশীলন সমিতি ছিল একটি নিষিদ্ধ সংগঠন।

এ দিকে ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আমি ঢাকার মেডিকেল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হই। এখানে তিন বছর ছাত্র অবস্থায় থাকাকালীন আমরা প্রায়শই ছাত্র আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে বহু গোপন মিটিং করতাম। এ অবস্থাতেই হঠাৎ আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হওয়ার পর আমি পুলিসের কাছে ধরা দেব না এই সংকল্প নিয়ে আত্মগোপন করি এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুশীলন সমিতির শাখা কার্য্যালয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকি। আশুতোষ কাহেলী এবং অনুশীলন সমিতির অন্যান্য নেতারা আমাকে মুক্তি সংগ্রামে আরও বেশী করে ঝাঁপ দিতে উৎসাহিত করেন।

যখন আমি আত্মগোপন করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম— তখন ১৯৩২ সালের প্রথম দিকে—একদিন হঠাৎই জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাই। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমার

তল্পিবাহক নির্মল চক্রবর্তী যার কাজ ছিল আমার স্যুটকেশ বয়ে নিয়ে আমার সাথে ঘোরা একেই প্রথমে পুলিশ ধরে—এবং আমার স্যুটকেশ বাজেয়াপ্ত করে। স্যুটকেশের মধ্যে আমার পিস্তল এবং আরও কিছু বিপ্লবাত্মক পত্র পত্রিকা ছিল—যা দেখে পুলিশ ওকে জেরা শুরু করে—এবং জেরার মুখে ওই পুলিশের কাছে আমার পরিচিতি প্রকাশ করে। এরপর বিশেষ আদালতে আমার বিচারে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল জীবনে এসেই আমার আলাপ হল অগ্নিযুগের খ্যাতিমান বিপ্লবী তথা জাতীয় কংগ্রেসের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এর সাথে। কিন্তু এই জেলের বন্দী জীবন আমার অসহ্য লাগছিল—আমি মনে মনে জেল থেকে পালানোর একটা পরিকল্পনা করতাম। কিন্তু মাস দেড়েক জলপাইগুড়ি জেলে রাখার পর হঠাৎ আমার মেদিনীপুর জেলে বদলির আদেশ হয়। মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনে তুলে দেওয়া হল (অবশ্যই পুলিশ প্রহরায়)। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে চরকী স্টেশনের কাছাকাছি—চলন্ত ট্রেনের বাথরুমের জানালা দিয়ে আমি ঝাঁপ দিই—এবং এভাবেই পুলিশ প্রহরার চোখে ধুলো দিয়ে আমি বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাই। এরপর আমি নতুন উদ্যমে মুক্তি আন্দোলনের কাজে যোগ দিই।

কিন্তু এর পর ১৯৩৩ সালে ২৮শে অক্টোবর হিলি স্টেশনে ডাকাতির অভিযোগে আবার পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করল। এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে হিলি স্টেশন ডাকাতির পুরো প্ল্যানটা ছিল আমার এবং আমিই ছিলাম ঐ ডাকাতির দলের মুখ্য ভূমিকায়। কাজ চালাতে গিয়ে আমাদের অর্থসংকট লেগেই ছিল—এমনই এক অর্থসংকটের মোকাবিলা করতেই হিলি স্টেশন ডাকাতির পরিকল্পনা। যা হোক্ এবার গ্রেপ্তারের পর আমাকে প্রথমে বগুড়া জেলে ও পরে দিনাজপুর জেলে পাঠানো হল। এরপর বিনয়-বাদল-দীনেশ এর হাতে নিহত কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ভাই টমাস উইলিয়াম সিম্পসনের তত্ত্বাবধানে গঠিত এক বিশেষ ট্রাইবুন্যালে আমার বিচার শুরু হয় এবং বলাবাহুল্য যে বিচারে—আমি আর দলের আরও তিনজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হই।

এরপর এই ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে এক আপীল করা হয়—এবং হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মন্মথ নাথ মুখার্জীকে নিয়ে ফুল বেঞ্চে এই আপীলের শুনানি হয়। আপীলের রায়ে মাহমান্য আদালত আমার এবং আমার অপর এক সাথী হৃষিকেশ ভট্টাচার্যের মৃত্যু দণ্ডাদেশ রদ

করেন এবং পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে ব্রিটিশ সরকার একটা বিষম হোঁচট খেয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের কাছে কলিকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করল। ভাগ্য বোধ হয় সুপ্রসন্ন ছিল, লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলও ব্রিটিশ সরকারের এই আপীল খারিজ করল। যা হোক্ ট্রাইবুন্যালের রায় অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য প্রথমে আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হলেও পরে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে আমাকে দ্বীপান্তরে চালান করার জন্য আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হল এবং সেখান থেকে জাহাজে করে কালাপানি পেরিয়ে—"আন্দামান"। সালটা ছিল ১৯৩৪। আমার সাথে আরও যাদেরকে আন্দামানে চালান করা হয়েছিল তারা হল (১) হৃষিকেশ ভট্টাচার্য (২) সত্যব্রত চক্রবর্তী (৩) প্রফুল্ল সান্যাল, (৪) ডাঃ আব্দুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ।

আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন আমি অতি নিকৃষ্টমানের খাওয়া দাওয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং আরও কিছু দাবী আদায়ের জন্য জেলের বন্দীদের দ্বারা আহূত অনশন ধর্মঘটে যোগ দিই। একটানা ৩৬ দিন অনশন ধর্মঘট চলার পর আমরা ধর্মঘটীরাই জয়লাভ করি। এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীও তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলের সাথে দেখা করেন এবং আন্দামানে থেকে অনশনরত বন্দীদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করেন। আমাদের দাবীর মধ্যে একটি ছিল সেলুলার জেলেবন্দীদেরকে যে যার প্রদেশে ফেরৎ পাঠানো।

অনশন ধর্মঘটে জয়লাভের পর আমাকে প্রথমে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ও পরে ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ও ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে থাকাকালীন আমি আবার ২১ দিন ও ৭ দিনের অনশন ধর্মঘট করি।

শেষে ১৯৪৬ এর ৩১ শে আগষ্ট জেল থেকে পুরো ছাড়া পাই। জেল থেকে পুরো মুক্তি লাভ করার পর আমি বঙ্গভঙ্গের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিই। এবং এখনও আমি উদ্বাস্তু সমস্যার বিভিন্ন ব্যাপারে নিজেকে যুক্ত রেখেছি।

ফেলে আসা দিনগুলি

শ্রীমতী কুমুদিনী ডাকুয়া

আমি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখি ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে। আমার পিতৃভূমি মেদিনীপুরের সুতাহাটা থানার গোওয়াডাব গ্রাম। আর জন্মভূমি হ'ল রাম গোপাল চক্। মাতা ৺জ্ঞানদাময়ী, পিতা পূর্ণ চন্দ্র জানা। আমি জন্ম থেকে পিতামাতার কোলে প্রতিপালিত না হয়ে মাতামহী ৺রাজবাল বেরার স্নেহে লালিত পালিত হয়েছি। পিতার বাড়ী যেমন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তেমনি মাতামহের বাড়ী ছিল সংস্কার মুক্ত। এই সংস্কার মুক্ত আলো হাওয়াতে গড়ে উঠেছি বলে আমার মনটাও ছিল সংস্কার মুক্ত। আমার আত্মীয় পরিজন বিশেষ করে আমার মা ও দিদিমা স্বদেশী মানসিকতার মহিলা ছিলেন। তাই অনেকের বাধা সত্ত্বেও স্বদেশী করা ছেলের (যাকে প্রায় সময়ে জেলে থাকতে হয়) সঙ্গে জেনে শুনেও বিয়ে দিয়েছিলেন আমার বার বছর বয়সে। শ্বশুর বাড়ী এসেই পুরোপুরি ভাবে স্বদেশী আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গেলাম। এঁরা সকলেই দেশ সেবা কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য আমাকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করতে ও উৎসাহ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সোনায় সোহাগার মত সুশীলদার (শ্রী সুশীলকুমার ধাড়া) সান্নিধ্য ও এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ফলে কংগ্রেসের কাজ কর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠলাম ও স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারলাম। মোট কথা স্বামীর দেশ সেবার প্রেরণা ও সুশীলদার শিক্ষাই আমাকে দেশ সেবার কাজে ব্রতী হতে উৎসাহিত করেছিল ও সেইমত গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। তাই খুব সহজে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে যোগ দিতে পেরেছিলাম।

"ভারত ছাড়ো আন্দোলন" শুরু হওয়ার আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারের ভারতের প্রতি বঞ্চনানীতির প্রতিবাদে আমার স্বামী শ্রীক্ষুদিরাম ডাকুয়া ১৯৪২ সালে জুন মাসে জেলে চলে গিয়েছিলেন তাই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সুশীলদার নির্দেশে প্রথমে গ্রামের মেয়েদের পরাধীনতার কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য গ্রামে গ্রামে মেয়েদের নিয়ে বৈঠক করতাম। ফলে স্বদেশী সংক্রান্ত মিটিং ও মিছিলে পুরুষদের মত মহিলারাও

যোগ দিতেন। আর সমস্ত বাড়ীতে এ কাজে যুক্ত যারা তাদের আদর যত্নের সীমা থাকত না। এরপর তমলুকের সেই বিখ্যাত ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরের থানা আক্রমণের মহা মিছিলে লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ভাগ মহিলা সামিল হয়েছিল। আমি একদিকের মিছিল পরিচালনা করেছিলাম। এরপর আমি আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে মহিলা সংগঠনের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ১৯শে অক্টোবর 'ভগিনী সেনা' গঠিত হওয়ার পর মেয়েদের পুলিশের পাশবিক অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য সুশীলদার কাছ থেকে ছোরা চালান ও যুযুৎসু প্যাঁচের শিক্ষা নিয়ে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ায় কাজে নিযুক্ত ছিলাম। বন্যার পর শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে দেখতে গিয়ে রাত্রে শ্বশুর বাড়ীতে ধরা পড়ি। সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য ছোরা চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম। ১ বছর ৩ মাস জেল বাসের পর বাইরে এসে পুনরায় জাতীয় সরকারের গরম দলের সঙ্গে যুক্ত হই। জাতীয় সরকারের শেষদিন পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জেলে থাকার সময় আমার বাবা মারা যান।

এরপর কস্তুরবা ট্রেনিং নিয়ে গ্রামে সেবামূলক কাজ করতে থাকি। পরে 'গান্ধী স্মারক নিধি'র কাজও কিছুদিন করেছি। বর্ত্তমানে মহিষাদলে থেকে বেশ কয়েকটি সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি।

মুক্তি যুদ্ধের দিনগুলি
শ্রী জগৎবন্ধু বোস

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমার যোগদানের পেছনে যাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী কাজ করেছিল তাঁদের মধ্যে দিনাজপুরের স্বর্গীয় বিজয় রঞ্জন মিত্র, রংপুরের স্বর্গীয় সতীন গুহ এবং ফরিদপুরের স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই ছিলেন যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য। এঁরা ছাড়া আর একজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়—তিনি হলেন অনুশীলন সমিতির প্রভাত চক্রবর্তী। আন্দামানে সেলুলার জেলে যে সমস্ত বিপ্লবীদেরকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল—প্রভাত চক্রবর্তী ছিলেন তাঁদেরই একজন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ছিলেন যুগান্তর বিপ্লবী দলের একজন উঁচুস্তরের নেতা মূলতঃ এনার সান্নিধ্যে আসার পর আমিও ঐ যুগান্তর বিপ্লবী দলের একজন সদস্য হই।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আমাকে এই সমস্ত বিপ্লবী সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্ররোচিত করে এবং যখন বিপ্লবী দলের সাথে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে তারা ব্যর্থ হয় তখন ১৯২৬ সালের শেষাশেষি একটি মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করে। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমি তখন ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। যা হোক্ আমার বেলের আবেদনও না মঞ্জুর করা হল। এরপর দিনাজপুরের সদর জেলে ৬ মাস বিচারাধীন বন্দী হিসেবে থাকার পর আদালতের আদেশবলে আমি মুক্ত হই।

এরপর ১৯৩০ এর মাঝামাঝি ময়মনসিংহে নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঈশ্বরগাঁও শহরে এক বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করার সময়ে পুলিশ আমায় আবার গ্রেপ্তার করে এবং এবার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই সময় আমাকে প্রথমে হুগলী সদর জেলে পরে বহরমপুর জেলে রাখা হয়েছিল। পরে ১৯৩০ এর শেষের দিকে জেল থেকে মুক্তি পাই।

পরে ১৯৩১ এর মে মাসে ময়মনসিং জেলার অরণ্যপাশা থেকে পুলিশ ধরণী চক্রবর্তী, প্রফুল্ল মজুমদার, সুধীর ভট্টাচার্য, শৈলজা ভট্টাচার্য, নিখিল চৌধুরী, মনীন্দ্র দেবনাথ আর আমি—আমাদের এই সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। এবার

আমাদের বিচারের জন্যে গঠিত এক বিশেষ আদালতে আমাদের বিচার হল এবং ১৯৩: এর ১৪ই এপ্রিল আমাদের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা সাব্যস্ত হয়। উল্লেখ্য যে সাজার মেয়াদ সকলের ক্ষেত্রে এক ছিল না। সাতজনের মেয়াদ সাতরকম হল। ভারতীয় অস্ত্রবিধির ১৯ (এফ) এবং ২০, বিস্ফোরক আইনের ৫নং ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ও ১২০ (বি) ধারায় আমাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

যা হোক্‌ এই পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে ঢাকা জেলে রাখা হলেও পরে ১৯৩৩ এর ১২ই ফেব্রুঃ আমাকে আন্দামানে সেল্‌লার জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেল্‌লার জেলে থাকাকালীন ১৯৩৩এর ১২ই মে সেল্‌লার জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের ডাকা অনশন ধর্মঘটে যোগ দিই এবং একটানা ৪৬ দিন এই ধর্মঘটে অংশ নিই। এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে এই অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়েই আমাদের বন্ধু মোহন কিশোর নোমো দাস, মোহিত আর মহাবীর সিং মৃত্যুবরণ করেছিল।

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে আমাকে আন্দামান থেকে প্রথমে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল ও পরে যশোহর জেলে পাঠানো হল। এর কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকে আমার নিজের গ্রামের বাড়ীতে (পুকারিয়া) গৃহবন্দী করে রাখা হল। অবশেষে ১৯৩৭ সালের শুরুতে আমি পুরোপুরি মুক্তি পাই।

আমার মুক্তির অব্যবহিত পরেই আমি কলকাতায় চলে আসি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে ও কলিকাতায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যার ব্যাপারে অবহিত করি। এই সময় আমাদের বন্ধু বারীন ঘোষের সাথেও আমার যোগাযোগ ঘটে এবং আমরা দু'জনে মিলে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে প্রচার শুরু করলাম। এখানে অবশ্যই বলা দরকার যে, এই প্রচারে আমরা অভুতপূর্ব সাড়া পেলাম। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বোস, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রচার কার্যে সহায়তা করার জন্যে এগিয়ে এলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে আমরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এলাম, এমনকি গুরুদেবকে সভাপতি করে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি বিষয়ক এক কমিটিও গঠন করা হল। সৌমেন্দ্র নাথ হলেন সাধারণ সম্পাদক আর আমি হলাম সহকারী সম্পাদক। আমাদের প্রচারকার্য যে কিরূপ সফলতা লাভ করেছিল তা বোধ হয় আর বিস্তারিত ভাবে বলার অপেক্ষা রেখ না। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যা নিয়ে শুধু যে

ভারতের সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে ছিলাম তাই নয়—মহাত্মা-গান্ধী অবধি আমাদের কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অবশেষে তাঁরই হস্তক্ষেপে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করেন।

পরবর্তীকালে আমি শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ি এবং ১৯৩৯ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হই। ১৯৪০ এর প্রথম দিকে ব্রিটিশের যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর সময় পুলিশ আমাকে আবার গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় এক বৎসর বিচারাধীন বন্দী হিসেবে ব্যারাকপুর জেলে রাখার পর আমার দু'বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং এই দু'বৎসর আমি দমদম সেণ্ট্রাল জেলে ছিলাম। পরে ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে আমি মুক্তি পাই।

বর্তমানে আমি বয়সের ভারে ক্লান্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ্। হার্টের ব্যামো এখন আমার সঙ্গী। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধানেই আছি।

———

স্বদেশসেবার স্মৃতিকথা

শ্রী সতীনাথ ভট্টাচার্য

আপন মহিমা প্রচার করতে চায় না, এরকম লোক আমার জানা নেই। এক সময় ছিল প্রচার মানে বিপদ, সে সময়ে নিজেকে লুকাবার সব রকম চেষ্টাই এককভাবে এবং দলবদ্ধভাবে করাই ছিল কড়া আদেশ। লিখতে চাই না। চাই না বললে ভুল হবে, লিখতে জানি না বা পারি না বলাই ভাল। ধৈর্য্য বটে শ্রীচণ্ডীচরণ ধাড়া এবং শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ পাল মহাশয় দ্বয়ের, বাড়ীতে এসে প্রায় জোর করেই লেখার প্রেরণা দেন, তার পরিণামেই এই লেখা।

আমার জন্ম পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমানে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার (সে সময়ে মহকুমা ছিল) সন্তোষের নিকট বড় বিন্যাফৈর গ্রামে। তৎকালে অর্থাৎ আমার জন্মলগ্নে উহা অখণ্ড ভারতবর্ষের এক অংশ ছিল। ঠাকুরদাদার নিকট জেনেছি ছয় মাসে মাতৃহারা এবং এক বৎসর বয়সে পিতৃহারা হই। ঠাকুরমাও জীবিত ছিলেন না, ঠাকুরদাদা ডাকসাইটে নামকরা তালুকদার ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমাকে বাড়ীর গরুর দুধ খাইয়ে, শয্যায় শয়ন করিয়ে, চারিদিকে ঘেরার ব্যবস্থা করে, মহালে তাগাদায় বেরিয়ে যেতেন। ঠাকুরদার অকৃত্রিম স্নেহ এবং বাড়ীর ঝি, চাকর ও দারোয়ানদের সাহায্যে আমার শৈশব কাটতে থকে।

দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। কয়েক বছরের মধ্যেই ঠাকুরদাদা বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী হলেন, তার স্নেহ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সময় হল। কাকার (বাবার অনুজ) কাছে আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। সে সময় আমার কাকা ৺ক্ষিতিশ নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় টাঙ্গাইলের অধীনস্থ নাগরপুর নামক একটি স্থানে কর্মরত ছিলেন। কাকা থাকতেন সপরিবারে "ডাঙ্গাগ্রামে"-বর্দ্ধিষ্ণু এ গ্রাম, সে সময়ে এই গ্রামে ডাকঘর ছিল। ডাঙ্গাগ্রাম থেকেই মাইল দেড়েক দূরে সেই নাগরপুরে "গরীব" পাঠশালায় ভর্তি হই। দলবদ্ধ-ভাবে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতাম। বর্ষার সময় নৌকায় চেপে স্কুলে যেতে হত। মৌলবী সাহেব নাম ডাকছেন—স্কুলের সব ছাত্র একে একে বলছে প্রেজেন্ট স্যার—শিশু বয়সে সেটাই একটা খেলা ভাবতাম। শৈশবের পাঠ শেষ করে, বৃত্তি পরীক্ষা দিতে দশ মাইল দূরে সেই টাঙ্গাইল শহরে যেতে হল। বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে নাগরপুরেই "যদুনাথ হাইস্কুলে" পঞ্চম

শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। এতদিন হাত নীচের দিকে ঝুলিয়ে বই হাতে পাঠশালায় যেতাম। এখন থেকে বই বুকের নিকট ধরে 'হাইস্কুলে' যাওয়ার অধিকার পেলাম। এটাই ছিল তখনকার হাইস্কুলে যাওয়ার স্টাইল।

আজ বার্দ্ধক্যের প্রান্তসীমায় এসে স্মৃতির পাখায় ভর করে শৈশবের সোনালি দিনগুলির সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে আসছে, সমতা থাকছে না, আগে তো ভাবিনি, এভাবে কখন আমার নিজের কথা লিখতে হবে। রোজ নামচার খাতাগুলো থাকলে ভাল হত, যেগুলো পুলিশের ভয়ে সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ মনে পড়ে, সেনিটারী ইনেস্পক্টারের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে নাগরপুর গ্রামে এসেছেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (সুরেশদা)। তিনি আমাদের নিয়ে "ব্যায়াম সমিতি" গড়লেন। সঙ্গে সমাজসেবা—গ্রামের পুকুরের পানা পরিষ্কার, রাত্রি জেগে রোগীর সেবা, গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ান, শ্মশানযাত্রী, প্রতিবেশীর বাড়ী পাহারা, সেবাসমিতির মাধ্যমে রাস্তার কুষ্ঠরোগীর সেবা প্রভৃতি কাজ চলতে থাকে। এই সুরেশদা কলকাতা থেকে দেশে যাওয়ার পথে ঢাকা মেল দুর্ঘটনায়, মার্জাদিয়া স্টেশনের কাছে মারা যান।

১৯৪২ সালে জুন মাসে স্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষা হয়ে গেল, তখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। আমার দেশে তখন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নিয়ে রাজনীতির ডামাডোল চলছে। আগষ্ট আন্দোলন শুরু হলেও, গ্রামে সেই আন্দোলনের ঢেউ যেতে প্রায় ডিসেম্বর এসে গেল। স্কুলে আন্দোলন চলছে, চলছে হরতাল। বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়া হল না। ষান্মাসিক পরীক্ষার ভাল ফল দেখে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩ সালে, স্কুলে, ইউনিয়ন পতাকা নামিয়ে জাতীয় পতাকা তুললাম। এস. ডি ও মহাশয় এসে সে পতাকা নামিয়ে, চলে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য থানার খাতায় নাম ওঠে, স্কুল থেকে বিতাড়িত হলাম, আমি ও আমার বাল্যবন্ধু গৌরচন্দ্র সাহা (বর্তমানে বেলেঘাটা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "ভারতমনের" সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার)।

বড়বিন্যাফৈর গ্রামের নিকটবর্তী বেড়াবুরুনা গ্রামের বাসিন্দা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সচিব সনাতন নিয়োগী মহাশয়ের সাহায্যে কলকাতা এসে সার্কুলার রোডের ব্রাহ্ম সমাজের পুরাতন বাড়ীতে উঠি। কলেজস্ট্রীটের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে কেমিকালস্ ট্রেনিং দেওয়া হল, কি করে আগুন লাগলে নিজেকে নিরাপদে রাখা যায়। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে নাগরপুর গ্রামে ফিরে গেলাম। এই

প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ে, আমরা "মিছিল" করে থানার সামনে দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটতে শুরু করে, প্রাণ ভয়ে যে যার মত দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু কেষ্টদা (কৃষ্ণচন্দ্র শীল) ও আর একজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং দুজনেরই ৬ মাস করে জেল হয়েছিল। আমি থানার নিকট অবস্থিত নিকাড়িপাড়ার মধ্য দিয়ে পালাতে গিয়ে, গ্রামের জমে থাকা পায়খানার মল পায়ে-গায়ে মেখে, নিকটবর্তী এক. পুকুরে ঝাঁপ দিলাম—এতে দুর্গন্ধ ও পুলিশের তাড়া থেকে রক্ষা পেলাম। সাঁতার কেটে অপর পাড়ে উঠলাম, প্রচণ্ড অন্ধকার, বেতঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিলাম, বেতকাটায় গায়ের চামড়া কেটে রক্ত পড়তে লাগল। শরীর অতি ক্লান্ত, কোনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আনুমানিক রাত্রি ৩টা নাগাদ শ্রীহরগোবিন্দ সাহা'র (দাদা) বাড়িতে গিয়ে, তাঁর মা'কে ডাকলাম। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল, ঘরে রাখা পান্তা ভাত, পিঁয়াজ দিয়ে খেয়ে খিদে মিটালাম, শরীরের ক্ষতস্থানগুলিতে ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলাম।

আর একবার—তখন সবে সন্ধ্যা। খবর এল ডাকাতি করতে যেতে হবে। টাঙ্গাইল শহর থেকে বেশ কিছু দূরে গ্রামের ধারে একটা পাটক্ষেতে সকলে জমায়েত হল এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার কাজ শেষ হল। আমাদের মধ্যে একজনত ভয়ে কাঁপছে। তাকে হাত পা বেঁধে পাটক্ষেতে ফেলে রাখা হল। আরও বলা হল যদি ধরা পড়ি বা ধরা পড়ায় সাহায্য কর তবে গুলি করে মারা হবে। কেননা দীক্ষার সময় একটা নির্দেশ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। এখানে বলে রাখি আমার দীক্ষা হয়েছিল নাগরপুর থেকে কিছু দূরে একটা খালের ধারে শ্মশানে। শ্মশানের ভীতি দূর করার জন্যই সম্ভবত এ স্থান নির্বাচন।

পূর্বপরিকল্পনামত অন্দরমহলে ঢুকেই মেয়েদের মুখ চেপে ধরে বল্লাম আমরা স্বদেশী ডাকাত—চিৎকার করবে না। কি আশ্চর্য স্বদেশী ডাকাত শুনে বাড়ীর মহিলারা ইঙ্গিত করল মুখ ছেড়ে দাও। অভয় দিয়ে বলল এই নাও চাবি। আরও তাজ্জব কোথায় কি আছে তাও দেখিয়ে দিল। শুধু বল্ল যাবার সময় আমাদের হাত পা বেঁধে রেখে যেও, তোমরা যদি প্রাণের ভয় না করে স্বদেশী করতে পার তবে আমরাই বা কেন এইটুকু সাহায্য তোমাদের করব না। তারা আমাদের সোনার গহনা দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা নেই নি শুধু দশ, পাঁচ টাকার বাণ্ডেল নিয়ে রওনা হলাম। ডাকাতি করে ফিরেই আমরা কিন্তু আমাদের পোড়াবাড়ির আস্তানা ত্যাগ করেছিলাম। কেননা জানতাম এখবর পেয়ে বাড়ীর

কর্তাসাহেব পুলিশে খবর দেবেনই এবং আমরা ধরা পড়ব। আমাদের অনুমান যে সঠিক তার প্রমাণ সেদিনই শেষ রাতে পুলিশ সেই আস্তানায় হানা দিয়েছিল। একটা কথা এখানে বলা দরকার মনে করি সেদিন এইভাবে সংগৃহীত অর্থের কণামাত্র অপচয় বা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হত না।

কয়েকদিন লুকিয়ে থাকার পর আবার কলকাতা পথে যাত্রা করলাম। কারণ, ইতিমধ্যে—আমার এবং কয়েকজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে। কালিহাতীর জমিদার বাড়ীর ছেলে ৺ননীসেনের (ননীদা) সাহায্যে কলকাতার বর্তমান নট্য কোম্পানীর বাড়ী হাটখোলার ১৭ নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে বেকার-বান্ধব সমিতিতে আশ্রয় পেলাম। সঙ্গের সাথী পাড়ার মৃত কবিরাজ মহাশয়ের কুমারী কন্যার একটা কানের দুল। দেশের জন্য তার এই ত্যাগ এবং আমাকে এই অমূল্য সাহায্য, আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই পরম শ্রদ্ধেয় ননীদাকে আমরা হারিয়েছি ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময় বৌবাজারে শান্তিমিছিলে হঠাৎ আক্রমণ করে মুসলমানরা তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দেয়। এইভাবে সর্বত্যাগী অবিবাহিত পরোপকারী ননীদার জীবনাবসান ঘটে। ননীদা না হলেন শহীদ, না পেলেন তাম্রপত্র না পেলেন পেনসন। কিন্তু বীরের এই আত্মত্যাগ ভুলবার নয়।

হাতীবাগানে বোমা পড়ার সময় হাটখোলায় ঐ ১৭নং বাড়ীতেই ছিলাম, এর কিছুদিন পর নেতাজীর দাদা শরৎ বোস শ্যামবাজারের দেশপ্রিয় পার্কে বিরাট জনসভায় প্রথম আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গৌরব কাহিনী প্রকাশ করেন। সেই সভায় আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়ে ভীড়ের চাপে পদদলিত হয়ে R. G. Kar হাসপাতালে ছিলাম। সেদিন কিছুলোক মারাও যায়। পরের দিন হাসপাতালে আমাকে দেখতে এসেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শরৎ বোস, কংগ্রেস সম্পাদক বিজয়সিং নাহার এবং আরও অনেকে। সবার নাম আজ মনে নেই।

এরপর হঠাৎ একদিন রাতে হাটখোলার ১৭নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটের বাড়ীটি পুলিশ ঘিরে ফেলে। আমি তেতালার ছাদ থেকে মই ফেলে পাশের বাড়ীর ছাদে নেমে পড়ে পালিয়ে যাই। যতদূর মনে পড়ে, সেই ছাদের বাড়ীটি সোদপুরের কোন কটন মিলের মালিক অথবা ম্যানেজারের বাড়ী ছিল। এখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিলাম শোভাবাজার স্ট্রীটের রাস্তার উপর রাখা একটি ডাস্টবিনের মধ্যে। নিকটবর্তী হোটেলের এঁটো কলাপাতা চাপা দিয়ে পুলিশের তাড়া থেকে রক্ষা

পেলাম। হঠাৎ পুলিশের তাড়ায় হাটখোলার সেই বাড়ীর চিলে কোঠায় আমার পিস্তলটা ফেলে আসায় দুশ্চিন্তা হতে লাগল। এইভাবে আত্মগোপন করে আছি, শীতের রাত, গায়ে খদ্দরের হাফসার্ট আর পরনে হাফপ্যাণ্ট, শীতে বেশ কাঁপুনি লাগছে। এক ভদ্রলোক হোটেলে খেয়ে ডাস্টবিনের ধার হাতমুখ ধুতে এসে, আমার নড়াচড়া দেখে চিৎকার করে ওঠেন। আমি সবিনয়ে তাঁকে বলি—আমি "স্বদেশী" পুলিশের ভয়ে এইখানে লুকিয়ে আছি। এই ভদ্রলোক কৃষ্ণনগর নিবাসী হাটখোলা পোষ্ট-অফিসের পোষ্ট-মাষ্টার—নাম স্বর্গীয় ধরণীধর ভট্টাচার্য, তিনি হাটখোলা পোষ্ট-অফিসেই রাত্রে থাকতেন এবং হোটেলে খেতেন। সপ্তাঅন্তে কৃষ্ণণগর বাড়ীতে যেতেন। শুনেছি তাঁর দুই বিবাহ, তাই গৃহের শান্তি রক্ষার্থে হোটেলে খেয়েই চাকরি করতেন। বাকী রাত্রিটা পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের আশ্রয়ে কাটালাম। দুজন নানা কথাবার্তার মধ্যে সারা রাতটা জাগলাম। ভদ্রলোককে আমার পলায়নের কথা জানাতে তিনি আমাকে সুন্দরবন অঞ্চলে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দেবার ব্যবস্থা করেন। পূর্বেই ঠিক ছিল ধরনীবাবু শনিবার ছুটির পর সুন্দরবন যাবেন। স্থির হল রবিবার খুব ভোরে প্রথম ট্রেন ধরে আমরা রওনা হব। তখন কলকাতায় গ্যাসের আলো, রাতের শেষের বহু পূর্বে অতি গোপনে স্টেশনে পোঁছলাম এবং ভোরের ট্রেন ধরে ক্যানিং পোঁছলাম। সেখান থেকে লঞ্চে, তারপর হাঁটা পথে, এইভাবে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাসন্তী থানার অধীন ৪ নং গরানবোসে পোঁছালাম। সেখানে ধরনীবাবুর বেশ কিছু ধানের জমি ছিল, একঘর চাষি পরিবার তাঁর জমি দেখাশুনা করত। মাথানিচু করে চাষির কুঁড়ে ঘরে ঢুকলাম, বেশ মোটা মাটির দেওয়াল, ছোট দরজা, ছোন দিয়ে ঘরের ছাউনি। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমালাম। ভোর বেলা চাষি ডেকে তুলল, সামান্য দরজা ফাঁক করে দেখলাম সামনের ক্ষেতে হরিণগুলো তাদের বাচ্চাসহ কচি কচি ঘাস নেচে নেচে খাচ্ছে। এই মনোরম দৃশ্য ভুলবার নয়। ছোটবেলা থেকেই ব্যায়ামের অভ্যাস ছিল, এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। ধরনীবাবু ফিরে গেলেন। পরের সপ্তাহে আবার এলেন সঙ্গে একটি হোমিওপ্যাথি পারিবারিক চিকিৎসার বই—লেখক মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং এক বাক্স হোমিওপ্যাথি ঔষধ নিয়ে। সঙ্গে ছিল বেশ কিছু শ্লেট-পেন্সিল, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যাগরের বই, সত্যেন মজুমদারের লেখা বিবেকানন্দের জীবনী, মহাত্মাগান্ধীর আত্মজীবনী ও নেহরু জীবনীগ্রন্থ।

আমার কাজ শুরু হল প্রথমে শিক্ষকতা দিয়ে তারপর চিকিৎসকের ভূমিকায়।

দু'তিন মাইল ব্যাপী মুসলমান চাষির বাস, বৎসরে একবার ফসল হয়, সকলেই তরিতরকারী ফলায়. খালে প্রচুর মাছ, চিংড়ী ও কাঁকড়া জন্মায়, গরুর দুধ, বনের মধু—সবমিলিয়ে কোনমতে সকলের দিন চলে যায়। আর অসুখ হলে গামছা নোনা জলে ভিজিয়ে মাথায় দিয়ে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা—এই একমাত্র চিকিৎসা। এখানকার অধিবাসীরা সরল এবং ব্যবহার ছিল মধুর। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারের দূরত্ব বেশ বেশী ছিল। বাঁশী নামে একটি ছেলে সর্বদা আমার সঙ্গে থাকত, ঐসব রান্নার ব্যবস্থা করে দিত, আমি নেড়ে চেড়ে শুধু নামিয়ে নিতাম। রাত্রে দুজনে একই বিছানায় শুতাম। বিকাল ৪ টার মধ্যে ঘরে ঢুকে দরজা দিতে হত, বাঘের ভয়ে। সকালে আলো-ফোটার আগে দরজা খোলা নিষেধ ছিল। একাধারে মাষ্টার বাবু, অন্যদিকে ডাক্তারবাবু। বেশীর ভাগ উপসর্গ যে ঔষধের ক্ষেত্রে মিলত, সেই ঔষধ প্রয়োগ করতাম।

এখানে থাকার সময় বনের মধ্যে গিয়ে মধু সংগ্রহ করেছি দল বল নিয়ে। গাঁদা বন্দুক দিয়ে একটি বাঘও শিকার করেছি। নানা ছোট খাটো ঘটনার মাঝে কখন যে ১৫ মাস পার হয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি। ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট উঠে গেছে জানলাম। আবার কলকাতায় ফেরার পালা, ফেরার সময় বহু মেয়ে-পুরুষের কান্নার মধ্যে দিয়ে আমার পথ করে নিতে হল। বুঝলাম এই কয়মাসে আমি তাদের কত প্রিয় হয়ে গেছি।

কলকাতায় ফিরে "বেকার বান্ধব সমিতির" কর্ণধার দ্বিজেন সাহার সাহায্যে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে সন্তোষেব মহারাজার হাইস্কুল থেকে যাতে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারি সে রকম সুপারিশ পত্র দিলেন। দেশে ফিরে দেখি যে সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যুদ্ধের সময়ে খাদ্য সাহায্যের পরিবর্তে বা প্রলোভন দেখিয়ে যুবতী মেয়েদের চালান দিয়েছিল মিলিটারী ক্যাম্পে, মিলিটারীরা ফিরে যাওয়ার পর সমাজে এইসব যুবতীদের স্থান হয়নি। "জনযুদ্ধের" প্রবক্তারা তখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ১৯৫০ সালের মন্বন্তরে যারা কোন রকমে বেঁচেছিল—তারাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, ইংরাজীতে ফেল করলাম। কুমিল্লার "অভয় আশ্রমে" গেলাম। নোয়াখালির দাঙ্গা সবেশেষ হয়েছে। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) আমাকে নোয়াখালিতে ত্রানকার্যে অংশনিতে নির্দেশ দিলেন। সুচেতা কৃপালনীর সহকারী (সেক্রেটারী) হয়ে বহুকষ্টে রোমহর্ষক হয়ে নোয়াখালির বড়ালিয়া ক্যাম্পে পৌঁছলাম। একরাত্রে মুসলমানেরা আমাদের

ক্যাম্প ঘিরে ফেলল। তিনদিন বাইরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিলনা। শুধু ডাবের জল ও ডাবের শাস খেয়ে কাটাবার পর মিলিটারী এসে আমাদের উদ্ধার করে। এখানে প্রায় একমাস কাটাবার পর গান্ধীজী ডেকে পাঠালেন। তখন তিনি গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। গ্রাম পরিকল্পনায় এক দিন থেকে যা শুনলাম ও দেখলাম—সেটা লিখলে অনেকে আমার উপর অখুশি হতে পারেন। কয়েকদিন পরে গান্ধীজী আমাকে নির্দেশ দিলেন, "তোকে গাবো পাহাড় গারো হাজং অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে হবে"। তাঁর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে আবার অজানা পথে যাত্রা করলাম।

"অভয় আশ্রমের" শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর অধীনে ময়মন সিংহ শহরে ফিরে গেলাম। সুসঙ্গের মহারাজার সাহায্যে একটি চরকা কেন্দ্র স্থাপন করলাম। এখানে হাতে কাটা সুতা দিয়ে অনাথ মেয়েদের জন্য খদ্দরের শাড়ী তৈরী করে বিতরনের ব্যবস্থা করলাম। কাপড পেয়ে মেয়েদের সেকি আনন্দ সেদিন সবার। সেখান থেকে আবার গারো পাহাড়ে গারো হাজংদের মধ্যে আবার কাজ শুরু করলাম। লেখাপড়া শেখান, চরকা কাটা প্রভৃতি কাজ চলতে লাগল। এই সময় কম্যুনিষ্ট নেতা মনি সিং এর সঙ্গে হাজংদের মধ্যে কাজ করা নিয়ে সামান্য কাজিয়া হয়ে গেল। ওদের মিছিল, মিটিং বক্তৃতার জবাবে আমরা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে জবাব দিতে লাগলাম। মনিদার প্রশ্ন ছিল—জাঁড়িয়া ঝাঞ্জাইল রেল-স্টেশনে আমাকে আনতে সুসঙ্গের মহারাজা হাতী পাঠান কেন? তাই তিনি আমাকে বড়লোকের প্রতিভূ বলতেন। কিন্তু আসল কথাটা মনিদা জানতেন না। সেটি হল এই বৃদ্ধ বয়সেও মহারাজা আমার থেকে চরকা কাটার পদ্ধতি আয়ত্ত করাব জন্য আমাকে ডেকে পাঠাতেন।

এই গারো পাহাড়ে গারো হাজংদের মধ্যে কাজ করতে বেশ কষ্টই করতে হয়েছিল। প্রথমে তাদের দৈনন্দিন আচরণে এবং পোষাকে রপ্ত হতে য়েছিল। খালি পায়ে লেংটি পরে ওদের পাহাড়ী উৎসবে যোগ দিতাম। ওদের বিশ্বাসের জন্য ওদের সাথে পংক্তি ভোজনে অংশ নিতাম। পুক্তি ভোজন সে এক অভিজ্ঞতা। কুকুরকে পেটভরে খাইয়ে সেই কুকুরকে পুড়িয়ে সেই ভাত বেরকরে উৎসবে পুতিভোজনে পরিবেশন করা হত। শুয়োরের মাংস হামেসাই খেতে হত। এইসব করে ধীরে ধীরে ওদের বিশ্বাসী হয়ে ওদেরই একজন হয়ে সংগঠন মজবুত করলাম। এদিকে হঠাৎ একদিন এই পাহাড়ে আমার খোঁজে পুলিশ এসে হাজির। পুলিশের কথায় আমি নাকি

সর্বনেশে লোক। বহুদিন ধরে তারা নাকি টাঙ্গাইল, নাগরপুরে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে। অনেক খোঁজ করে শেষে 'তুরা'তে এসেছে।(তুরা এখন মেঘালয়ের মধ্যে পড়েছে) এখনই থানায় যেতে হবে। থানায় গেলাম। আমার অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান হল, তারপর পাহাড়ে কি করি, কেন করি কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, খদ্দর পরি কেন ইত্যাদি। দারোগা ভদ্রলোক মুসলমান, তিনি আমার সঙ্গে ভদ্রব্যবহারই করেছিলেন। তারপর জানালেন আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ, আমার নাকি এখানে থাকা চলবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে বা কারা আমার বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ এনেছে। আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম মনিসিং (পরবর্তীকালে বাংলা দেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন) এর দল কি? দারোগাবাবু জানালেন সেটা গোপনীয়। ভাবলাম ওদের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব কেননা ওরাই একদিন নেত্রাকোনার এক কংগ্রেস কর্মীকে শুধু গরম জল ঢেলে তিলে তিলে মেরেছিল।

১৫ দিন অন্তর থানায় হাজিরা দেওয়ার শর্তে সেদিন থানা থেকে ফিরে এসেছিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পর টাঙ্গইলের বিন্যাফৈর গ্রামে ফিরে এলাম। দেশ স্বাধীন হল, বাধ্য হলাম সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে লুকিয়ে পঃ বঃ চলে আসতে। সঙ্গে ছিল সাকুয়াই নিবাসী স্বর্গীয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরিবার। উঠলাম খড়দহের জমিদার পি, এন মুখার্জীর বাড়ীতে, ভাড়াটে হিসাবে। এমনই ভাগ্যের পরিহাস। খড়দহে থাকার সময় খড়দহ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার স্বামী পুণ্যানন্দ-র সাথে বাস্তু হারাদের মধ্যে কাজ শুরু করি। কিছুদিন পরে চলে এলাম ১৮ এ প্রিন্স গোলাম মহঃ রোডে (কালীঘাট) রেনুদি (রেণুমিত্র)র নিকট। রেনুদির মা ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা-কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা। সেইসূত্রে রেনু-দির সাথে পরিচয়। রেনুদি M, A, B, T, করার : পর "উজ্জ্বল ভারত" নামে একটি মাসিক পত্রিকা চালাতেন বরিশালের শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে। রেণুদি তার দাদার বাসায় থাকতেন। আমিও সেই বাসায় আশ্রয় পেলাম। এই রেণুদির সহায়তায় প্রাইভেটে পদ্মপুকুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করি। এরপর রেণুদি ও গৌর সাহার আগ্রহে ও সাহায্যে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হলাম। এই সময় ডাক এল সুচেতাদির (কৃপালনী) থেকে। সুচেতাদি তখন সর্বভারতীয় বাস্তুহারা সেবা সমিতির (বেসরকারী) সম্পাদিকা আর সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। এখানে উল্লেখ করি পঃ বঃ শাখার

সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) এবং সম্পাদক ছিলেন ডাঃ নৃপেন বোস। সুচেতাদি জানালেন আমাকে বারাকপুর অঞ্চলে গিয়ে বাস্তুহারাদের মধ্যে কাজ করতে হবে। নির্দেশমত চলে এলাম বারাকপুরে। দিনে বাস্তুহারাদের জন্য কাজ রাত্রে আমার কলেজ। বাস্তুহারা পরিবার থেকে ছেলে মেয়ে সংগ্রহ করে শুরু করলাম 'চরকা কেন্দ্র'। আমার এই চরকা কেন্দ্র পরিদর্শনে একে একে এসেছিলেন সুচেতাদি, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, লাবন্যলতা চন্দ, ডাঃ নৃপেন বোস ও সর্বোদয় নেতা ধীরেন মজুমদার প্রমুখ। পরে এটি ,নবারুন' বিদ্যালয়-এ রুপান্তরিত হয় এবং মাসিক আটষট্টি টাকা বার আনা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ শুরু করি। অবশ্য আমার কর্মজীবন শেষ হয়। P, W, D বিভাগের একজন করনিক হিসাবে। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আজ যে বাতব্যাধিতে ভুগছি তার মূলে মিটিং মিছিল ও পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিশের লাঠি যেমন একটা কারণ তেমনি পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে রাতভোর নদীর চরে বালির মধ্যে শুয়ে বা পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবে থাকার পরিণতিও অপর একটা কারণ। শুধু কি বাতের ব্যথা! মনের ব্যথাও কম নয়। মাতৃহারা শিশু বলেই বোধহয় ছোটবেলায় 'মা' নামে কবিতা লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম "কবি" হব। হতে পারিনি। ত্যাগ, সততা ও মাতৃ মুক্তির শপথ নিয়ে স্বদেশী হয়েছিলাম—স্বপ্ন দেখেছিলাম স্বাধীন ভারতের, শোষণহীন সাম্যের ভারতের। কিন্তু কি দেখছি। ত্যাগের বদলে ভোগ, সততার বদলে মিথ্যাচার। সবই আজ মরীচিকা।

না বলা কথা

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত

১৯১৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর (২৫শে ভাদ্র) এক দুর্যোগ মুহূর্তে আমার জন্ম। শুনেছি জন্মের সময় মা অচৈতন্য ছিলেন আর আমার মধ্যেও কোন জীবনের লক্ষণ ছিল না। জ্ঞান ফিরে আমি আমার জ্যাঠিমার স্তন দুগ্ধ পান করে আমার প্রথম ক্ষুধা মিটিয়েছিলাম। আমাদের অশিক্ষিত পল্লীগ্রাম মাদারিপুরে তখন কোন হাসপাতাল বা কোন ডাক্তার বা কোন শিক্ষিত দাইও ছিল না। তবু কেমন করে কি জানি বেঁচে গিয়েছিলাম। সেই গ্রাম্য কবিরাজ জ্যাঠামশায় সূর্যকুমার সেন স্নেহভরে বলতেন "এ ব্যাটা মরেও যখন বেঁচে উঠেছে নিশ্চয় একটা কীর্তি রেখে যাবে।" তার সে ইচ্ছে অবশ্য আমার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পিতৃদেব হেমন্তলাল সেনগুপ্ত মাদারিপুরে আইন ব্যবসা করতেন। তখনকার দিনে শহরের তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ১৯২১ সালে আমার যখন পাঁচ বছর বয়স পিতৃদেব সংসারের কথা না ভেবে দেশের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন এবং মাদারিপুর শহরে একটি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মানুষ তখন এভাবেই দেশের ডাকে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তখন পর্যন্ত কারা আইন সংস্কার হয়নি! স্বদেশী বন্দীদের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল না।

আমার পিতৃদেবকে তার এই আড়াই বছর দণ্ডভোগ করা কালে ফরিদপুর ও বহরমপুর জেলে ঘানি টানতে হয়েছে, ধান পাড়িয়ে চাল বানাতে হয়েছে। অভিজ্ঞ লোক মাত্রই জানেন এ দুই-ই শ্রমসাধ্য কাজ। কিন্তু তাদের সময় যারা জেলে গেছেন সাধারণ মানুষ তাদের ত্যাগটাকে অসামান্য মনে করে স্বাভাবিক কারণেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করত। আমার ঠাকুরমা আমাকে রঙ্গিন রঙ্গিন কাগজ কেটে নিশান বানিয়ে দিয়ে মিছিল করা শেখাতেন। তিনি আগে আমি তার পিছনে থাকতাম। আমার ঠাকুরমা তার কারারুদ্ধ পুত্রের 'জয়' দিতেন। তার সাথে সাথে আমিও 'জয়' দিতাম। বৃদ্ধা ঠাকুরমার এই উৎসাহ দেখে আরও বহুলোক এসে আমাদের সাথে যোগ দিতেন। প্রায়ই বিকালে আমাদের ফরিদপুর জেলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের স্ত্রী এসে আমার মাকে

নিয়ে গ্রামে গ্রামে স্বদেশীমন্ত্র প্রচার করে মিটিং করে বেড়াতেন। তাদের বাড়ী ছিল শিরখাঁড়া গ্রামে—আমাদের গ্রামের লাগোয়া গ্রাম। এসব মিটিং হিন্দু-মুসলমান উভয় পল্লীতেই হত। আমাদের গ্রামের চেহারাটা ছিল একশ জনের মধ্যে দশজন হিন্দু নমঃশূদ্র সহ, বাকি নব্বইজনই ছিল মুসলমান। কিন্তু কোন দিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ঘটে নি। পিতৃদেব জেল থেকে বেরোনোর পর স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান মাতব্বরেরা তাকে ও অন্যান্য জেল ফেরৎ লোকদের নিয়ে জমিতে পা স্পর্শ করাতেন। এই বিশ্বাসে যে এরা পুণ্যাত্মা, ধর্মপ্রাণ সৎলোক। দেশের জন্য জেল খেটে এসেছেন। এদের পায়ের স্পর্শ থাকলে ফসল ভাল হবে। আমার শৈশবের লেখাপড়া প্রথম চার ক্লাশ পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে। সেখান থেকে চলে আসি মাদারিপুরে, হাইস্কুলে পড়তে। শৈশবে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি তাতে স্বদেশী করবার একটা ঝোঁক ছাত্র অবস্থাতেই সৃষ্টি হয়েছিল। এরজন্য কারও বিশেষ আকর্ষণের প্রশ্ন ওঠে নি। আমার কাছে আমার পিতৃদেবের আকর্ষণই ছিল উজ্জ্বল। মাদারিপুরের যে স্কুলে ভর্তি হলাম তারও একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আমাকে পরবর্তীকালে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐ স্কুলের তিন প্রাক্তন ছাত্র শহীদ চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, শহীদ নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শহীদ মনোরঞ্জন সেন ভারতবর্ষের অন্যতম সশস্ত্র বিপ্লব ১৯১৫ সালে বুড়ী বালামের তীরে (উড়িষ্যা) ইংরেজের সাথে বিপ্লবী নেতা শহীদ যতীন মুখার্জীর বাঘা যতীন) পাশে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসিক বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন ইতিহাসে সে সব কাহিনীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। ছাত্রজীবনে দেখেছি কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা ঝড়ে আড়িয়াল খাঁ নদীতে নৌকা ডুবি হলে সবক্ষেত্রে সেবা বা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপন্নকে উদ্ধার করা সকল মানুষকে নিষ্ঠার সাথে শিখতে হতো—পাললন করতে হতো। এসব যে পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক কাজের প্রস্তুতি সেটা অবশ্য কেউ বলতো না বা জানত না। কিন্তু দুই এর যোগাযোগ নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। সত্যিকারের চরিত্র গঠন না হলে খাঁটি বিপ্লবী হওয়ার স্বপ্ন অবাস্তব ও স্বপ্ন বিলাস মাত্র। সেদিনের চরিত্র গঠনে ধর্মীয় গ্রন্থ বিশেষ করে 'গীতা' ও বিবেকানন্দের সাহিত্যের প্রভূত প্রভাব ছিল এবং পুলিশ কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ীতে তল্লাসী করে এই জাতীয় বই পেলে তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হত এ নিশ্চয় কোন বিপ্লবী গোষ্ঠীভুক্ত হবে। এইসঙ্গে এও বলা দরকার যে প্রখ্যাত বিপ্লবী, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ, ব্যায়াম ও লাঠি, ছোরা খেলাও চরিত্র গঠনের উপাদান হিসাবে সেদিনও স্বীকৃত ছিল।

অনেক বিপ্লবীকে দেখা যায় তারা সারাজীবন চিরকুমার থেকে গেছেন, প্রথম জীবনে যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিলেন সেখান থেকে আর কোন অবস্থাতেই সরে আসেন নি। তার একটাই কারণ সত্যিকারের চরিত্র গঠন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দানের সময় শপথ ছিল "কোনদিন আত্মপ্রচার করার নীতি অনুসরণ করব না।" সেই কারণে যখন শহীদ ক্ষুদিরাম ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক শ্রীচণ্ডীচরণ ধাড়া মহাশয় তিনদিন এসেছেন মুক্তি সংগ্রামে আমার স্মৃতিকথা নেওয়ার জন্য আমি তাকে কোন ভরসা দিতে পারি নি। পরে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী ও নারায়ন চক্রবর্তীর কাছ থেকেও অনুরোধ পাই। অবশেষে আমার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা দিতে সম্মত হই।

আমি প্রথম গ্রেপ্তার হই ১৯৩৫ সালে আমাদের মাদারিপুরের বাড়ী থেকে। আমার বয়স তখন তের/চৌদ্দ হবে, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। প্রমোদ রায় (চাঁদা) আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়তেন। তিনি সে সময় আইন অমান্য পরিষদের ভলেণ্টার ছিলেন। দুজনে পাশাপাশি ঘরে থাকতাম। একদিন পুলিশ এসে দুই ঘরই সার্চ করল এবং প্রমোদ রায়ের ঘর থেকে খাজনা বন্ধের কিছু বেআইনী ইস্তাহার উদ্ধার করে। বিচারে তার তিন মাস জেল হয়। আমাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু বয়স কম বলে ছেড়ে দেয়।

আমার দ্বিতীয় গ্রেপ্তার ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। আমি সে বছর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে I. S. C. পরীক্ষা দেব। আমাদের পড়াশুনা বা আলাপ আলোচনার একটা জায়গা ছিল ক্যানিং হোস্টেলের মনোরঞ্জন বসুর ঘর। আমাদের টেস্ট পরীক্ষা চলছে। মনোরঞ্জন আমাকে বৈঠকখানা রোড ও বৌবাজার স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সে তার হোস্টেলে চলে গেল। সাথে সাথে দুজন প্লেন ড্রেস পুলিশ আমাকে জাপটে ধরে মুচিপাড়া থানায় নিয়ে এসে বললেন "আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে"। আমি বললাম তাতো বুঝেছি "এবার আমাদের বাড়ীতে Onriate 2nd Lane-এ আমার কাকা পিয়ারিলাল সেনগুপ্তকে এই মূল্যবান খবরটি দেবেন। তা না হলে তিনি সারারাত ভাববেন। ভাববেন আমি গাড়ি চাপা পড়েছি।" পুলিশ সেদিন আমার কথা রেখেছিল। আমার কাকা সাথে সাথে আমার পিসামশায় সেদিনের দুর্ধর্ষ পুলিশ অফিসার জীতেন সেন (স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের পারসোনাল স্টাফের ইনিসপেকটর)-কে গিয়ে সব কথা বলেন। সব শুনে পিসামশায় তার নেতিবাচক কথাগুলো বলে

সেই রাত্রেই আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তবে দুটি থানাতে (একটি মুচিপাড়া থানা অন্যটি এণ্টালী থানা) আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। পুলিশ সর্বক্ষণ আমাকে নজরদারি করত।

তৃতীয় গ্রেপ্তার ঘটে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫। এই সময় আমার ঠাকুরমা এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতায় এসেছিলেন। তাকে নিয়ে আমার দেশে ফেরার কথা। ঐদিন সকালবেলা সহপাঠী বন্ধু মৃণালকান্তি মজুমদারকে নিয়ে দেশে ফেরার আগে বালিগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছিলাম। বর্তমান গুরু সদয় দত্ত রোড ও সৈয়দ আমেদ এভিনিউ-র মোড় থেকে সাদা পোশাকের কয়েকজন আর্ম পুলিশ আমাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করে ইলিশিয়ম রোডে নিয়ে যায়। কোর্টে হাজির করলে জানতে পারি আমাদের বিরুদ্ধে 'সন্দেহ জনকভাবে D. I. G কোয়ার্টারের সামনে ঘোরাফেরা করার' অভিযোগ আনা হয়েছে। কিছু দিন মোকদ্দমা চলল। পরে সাক্ষী-সাবুদের অভাবে পুলিশের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল—(১) বিনা বিচারে রাজবন্দী করে নেওয়া, (২) অন্তরীণ আবদ্ধ করা। পূর্বে উল্লিখিত আমার পিসামশায়ের চেষ্টায় পুলিশ দ্বিতীয় পথ বেছে নেয়।

চতুর্থবার গ্রেপ্তার হই আগেই উল্লেখ করা ontiste 2nd Lane থেকে। তখন দেশে শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। পুজার সময় আমি দেশে থাকাকালে আমার উক্ত কলকাতার বাসায় পুলিশ সার্চ করে কিছু বেআইনী ইস্তাহার পায়। কাকাবাবু এ খবর আমায় জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কাকাবাবুকে কিছু না জানিয়ে কলকাতায় চলে আসি এবং বঙ্গবাসী কলেজের তখনকার প্রিন্সিপাল প্রশান্তকুমার বসুর সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ঘটনা জানাই। এর কয়েকদিন পরেই পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করল। বি. এ পরীক্ষা তখন আর দেওয়া হল না। অবশ্য এই গ্রেপ্তারের ফলে আমি শ্রমিক আন্দোলনের বহু বিশিষ্ট লোকের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি।

পঞ্চমবার তথা "ভারত ছাড়ো আন্দোলনে" প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের বিবরণ দিতে গেলে তা হবে একটা গ্রন্থ সদৃশ। আমরা যারা সুভাষচন্দ্রের সাথে তার অন্তর্ধানের আগে কলিকাতা ও মফঃস্বলে যোগাযোগ রেখে কাজ করেছি তাদের সকলকে তিনি বলতেন "যুদ্ধ এসে গেছে এই শেষ সুযোগ। সংগঠন করার সময় আর পাবে না। দল গড় এবং যোগাযোগের সূত্রগুলো খুঁটিনাটি মনে রাখবে। গোপনতা অবশ্যই পালন করবে।" আমি সেই আদেশ সুনিপুণ-

ভাবে পালন করার তাগিদে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে বিভিন্ন সময় সাতটি দোকানে চাকরি করেছি। আমার কাজ ছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শহর থেকে শহরান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, লোক চিনে নেওয়া এবং কে কোন কাজের যোগ্য হতে পারে সে সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরী করা। স্কুলে বই পাঠ্য করান বা কলেজে নোট বই চালু কারনর ফাঁকে ফাঁকে আমি ঐ কাজ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করেছি। ১৯৪২ সালে বম্বেতে ভারত "ছাড়ো আন্দোলন" ঘোষণা করার সময় আমি সেখানে ছিলাম। ফেরার পথে বেনারসে এবং পাটনায় সাধারণমানুষ ও ছাত্রদের প্রাণচাঞ্চল্য ও কাজের অবিচল নিষ্ঠা দেখেছি। আমি আর কয়েকজন সঙ্গী মিলে পাটনা দীঘা-ঘাট থেকে যে নৌকাতে গরু, মহিষ, ছাগল বিক্রির জন্য আসে তাতে করে কলকাতা রওনা হই। পাঁচদিন পরে লাল গোলায়পেঁছাই। জলপথে আসতে হয়েছিল কারণ বিহারের বিপ্লবীরা মোকামা ব্রীজ ভেঙ্গে দিয়েছিল। কোন যানবাহন কয়েকদিন চলছিল না। কলকাতায় এসে দেখি অবশ্য সে উন্মাদনা নেই, অথবা স্তিমিত। মেদিনীপুরকে বাদ দিলে বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক কান্ড ঐ সময় আর যা হয়েছে তা হল বালুরঘাটে ও আন্দোলনকারীদের হাতে ভাঙ্গায় (ফরিদপুর) দারোগা খুন।

কলকাতায় ফেরার পর অনুশীলন দলের বলিষ্ঠ নেতা মাখন সেন "ভারত" কাগজ অফিসে ডেকে পাঠান এবং গভীর প্রত্যয় ও স্নেহভরে বলেন 'তোমার কাছে অনেক প্রত্যাশা। তুমি ত সব ঘুরে দেখে এসেছ। এবার আমাদের মুখ রক্ষা কয়। তোমার জেলা ফরিদপুর এবং তারই বুকের উপর দিয়ে গোয়ালন্দগামী মিলিটারী বোঝাই রেলগাড়ী চলছে। তুমি ত সুভাষের লোক— এর বেশী কিছু বলব না। বোম, ডিনামাইট যা যা দরকার সব প্রস্তুত—আজই রওনা হও।" উত্তরে আমি শুধু বললাম "একাজ করতে গেলে রাজবাড়ী, পাংশা প্রভৃতি জায়গায় একটা সামান্য বৈপ্লবিক ঘাঁটি থাকা দরকার—আমি অন্তত একবার আগে ঘুরে আসতে চাই।" তিনি বললেন "ঘুরতে গেলে আর ফিরতে পারবে না।" এইভাবে কিছু কথাবার্তার পর সেইদিনই আমার এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাজ শুরু হওয়ার আগেই কিছু প্রধান নেতৃস্থানীয় কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। পুলিশের সক্রিয়তাও বেড়ে গেল। কিন্তু ফেরার পথ নেই। এই সময় আমার ১০৫° জ্বর, দাঁতের যন্ত্রণা শুরু। বন্ধুরা আমাকে নিরাপদ জায়গার স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিল। বাড়িটি ঠিক হল কমিউনিস্ট কর্মীদের আবাসস্থল। এদের এক ভাই ডাক নাম ঝণ্টু আগেই গ্রেপ্তার হয়ে

ফরিদপুর জেলে বাস করছিল। এই ঝন্টুরই ভগ্নী ছিলেন স্বনামধন্যা কমিউ-নিস্ট নেত্রী প্রতিভা গাঙ্গুলী (ব্যানার্জী) যিনি কিনা অপর তিনজন মহিলা কমিউনিস্ট নেত্রীর সাথে বউবাজারে গুলি বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার বন্ধুদের হিসাব ছিল কমিউনিস্টরা যুদ্ধকে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) সমর্থন করে। সুতরাং পুলিশ তাদের সন্দেহ করবে না। সুতরাং ঐ বাড়িটিই নিরাপদ। বস্তুত এই বাড়িতেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করার সময় প্রতিভা গাঙ্গুলী ব্যানার্জী পুলিশকে বলেছিলেন "আপনারা যাকে পারছেন ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। দেখছেন না কি রকম অসুস্থ"। পুলিশ শুধু বলেছিল "আপনারা মানুষ চেনেন না। আমরা ভুল করি না এমন নয় কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ভুল করছি না।" গ্রেপ্তার হওয়ার পর ভাঙ্গা-দারোগা খুনের মামলায় বাচ্চা বাচ্চা ষাট-সত্তর জন স্কুলের ছাত্রদের আসামী করে ফরিদপুর জেলে এনে আমাদের সাথে রাখা হয়েছিল। তারা সকলেই দেশের জন্য একটা কিছু করতে পেরেছে মনে করে কিছুটা উৎফুল্ল ছিল। কিন্তু আমরা যারা ছিলাম বড়, সেদিন আমাদের স্বপ্ন ছাড়া বলার মত ছিল না কিছু, আজও নেই।

———

স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ বাগ

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার চাঁদপাত্র গ্রামে ১৯১০ সালের ২৪ ডিসেম্বর আমার জন্ম। পিতা রাজকৃষ্ণ বাগ ছিলেন গ্রামের দশজনের একজন। ছোটবেলাতেই দেখেছি বাড়ীর সবাই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করত। তাই ছাত্রবেলা থেকেই আমিও কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। সেই সময়কার দু/একটা ঘটনা এখানে বলছি।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডাকে লবণ আইন অমান্য শুরু হয়েছে। সেই সময় একদিন হাঁটাপথে তমলুকে রাজবাড়ী ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছাই। ওখানে কয়েকদিন থাকার পর এক ব্যাচকে নরঘাট লবণ আইন অমান্য ক্যাম্পে পাঠান হয়। ঐ ব্যাচে আমিও ছিলাম। প্রত্যহ ৯টায় খাওয়ার পর লবণ তৈরীর জন্য মাঠে যেতাম। সেখানে পুলিশ এসে সব ভেঙ্গে-চুরে আমাদের স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেত, পরে সন্ধ্যার দিকে ছেড়ে দিত। এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন ক্যাম্প ঘেরাও করে সবাইকে স্থানীয় বাংলোতে নিয়ে যায়, ওখানে পুলিশের উপরওয়ালা হাম্কিন সাহেব এসেছেন। সেখানে এক এক করে নিয়ে দুজন সিপাই দুহাত ধরে টেনে রাখবে আর সাহেব নিজ হাতে বেত মারবে। এভাবে সকলকে মেরে ক্যাম্পের নায়ক মন্মথ হুতাইতেকে ধরে নিয়ে চলে যায়। আমরা ছাড়া পেয়ে তমলুকে ফিরে আসি।

আর একবার উমেশচন্দ্র ঘোড়াই তখন গেঁওখালির কংগ্রেসের চার্জে ছিলেন। আমাকে তিনি বলেন মতিলাল নেহেরুর মৃত্যুতে শোকমিছিল বের করতে হবে। আমি রাজি হই! বাজারে মিছিলের আগে আমি। সেদিনের হাজার হাজার মানুষের মিছিলে অমূল্য বাগ ও সুরেন্দ্র ঘোড়াইও ছিলেন। পুলিশ আমাদের তিনজনকে আটক করে। অমানুষের মত লাঠি চালিয়ে পুলিশ জনতাকে তাড়িয়ে দেয়, আমরা রাত্রে পুলিশ ফাঁড়িতে থাকি। পরদিন মহিষাদল হয়ে তমলুকে নিয়ে যায়। ওখানে প্রচণ্ড মারধর করে কোর্টে হাজির করে। বিচারে আমার চার মাস ও অমূল্যবাবু, সুরেনবাবুর ৬ মাস করে জেল হয় এবং মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ৮ নং ওয়ার্ডে রাখা হয়।

এরপর ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়। আমি রাজারামপুর শিবির থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতাম। একদিন সন্ধ্যার পর বন্ধুর সাথে মাঠের রাস্তা ধরে ক্যাম্পে ফিরছি, জ্যোৎস্না রাত্রি, হঠাৎ কোথা থেকে জানি না দুজন পুলিশ এসে আমাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করে মহিষাদল থানায় নিয়ে যায়। পরদিন তমলুক থানায় নিয়ে গিয়ে আগের মতই প্রহার ও পরে কোর্টে চালান দেয়। বিচারে এবার আমার ছয় মাস ও আমার সহকর্মী বীরেন দাসের চার মাস জেল হয়। এবার জেল বাস কুখ্যাত হিজলী জেলে।

এরপর আসে অগাস্ট আন্দোলন। সে ইতিহাস সকলেরই জানা। শুধু বলি সেদিন তমলুকের এমন একটি বাড়ী ছিলনা যে বাড়ীর কেউ না কেউ এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি বা পুলিশের অত্যাচার ভোগ করেনি। আমাদের বাড়ী একদিনে পাঁচবার তল্লাশী চালিয়ে ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট করে ও সকলের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, পুরুষ মহিলা শিশু কেউ বাদ যায় নি। এতকরেও সেদিন পুলিশ আমাদের মনোবল ভাঙ্গতে বা গান্ধী আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি—আজও না।

———

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী
শ্রী গোপীনন্দন গোস্বামী

জন্ম ১৯১৯ এর ২রা সেপ্টেম্বর অবিভক্ত তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার গোপালপুর গ্রামে। পিতা ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য পন্ডিত, লেখক ও বাগ্মী। তিনি ছিলেন তমলুক প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদক। পত্রিকার নাম ছিল "তমালিকা", চলেছিল—১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত।

ছাত্রনেতা হিসাবে আগষ্ট বিপ্লবে যোগদান করি, যদিও ১৯৪০ সাল থেকে কংগ্রেসের সংগে যুক্ত হয়েছিলাম। আগষ্ট বিপ্লবের একজন নায়ক রূপে চিহ্নিত। এবং 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের' জাতীয় সেনা বাহিনী 'বিদ্যুৎ বাহিনীও ভগিনী সেনার' একজন জি. ও. সি, রূপে সংগ্রামের সামিল হয়েছিলাম। তৎসহ থানা জাতীয় সরকারের "জনরক্ষা সচিব (মন্ত্রী) নিযুক্ত হয়েছিলাম। গান্ধীজীর নির্দেশে জাতীয় সরকারের কার্যকলাপ বন্ধ করার ফলে ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ এ আত্মপ্রকাশ করে গ্রেপ্তার বরণ করি। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর কারাদন্ড হয়। মুক্তি পাই দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে ২০শে জুলাই ১৯৪৭ এ।

জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে ২য় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করি এবং নূতন করে পড়াশুনা শুরু করি। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই, এস-সি পড়া শেষ করে বেসিক ট্রেনিং নেন এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হই। পরে শিক্ষকতার কাজ করি দুবছর। নিউ দিল্লীতে ইউনিয়ন একাডেমীতে (হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল) এক বছর শিক্ষক ছিলাম। পরে চার বছরের বেশি "সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকারী (E. O.S. E) রূপে এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি কলেজে (ইন্সষ্টিটিউট অফ রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশন) সিনিয়র ফিল্ড অর্গানাইজার হিসাবে সাড়ে ছ বছর চাকরি করি। শেষে সরকারী চাকরি করি প্রায় ২৪ বছর পঞ্চায়েতী রাজ্য ট্রেনিং সেন্টারে। সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে প্রায় তিনবার সারা ভারত ভ্রমণ করেছি। বহু বিষয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত।

আমি বহু মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। বিশেষতঃ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—"বাংলার হলদিঘাট তমলুক", 'মেদিনীপুরের শহীদ পরিচয়'

'তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা পঞ্জী," তমলুকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ও 'আমাদের সতীশদা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'তাম্রপত্র' প্রাপ্ত ৭৩ বছরের প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ডিষ্ট্রিক্ট লেবেল এডভাইসরী কমিটির সদস্য হিসাবে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কাজ করি। 'মেদিনীপুর জেলা স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতির' কার্যকরী কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য।

— — · —

স্মৃতির দর্পণে

শ্রী ক্ষুদিরাম ডাকুয়া

১৯০৯ সালে জুলাই মাসে মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার বরদা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম। পিতা কার্ত্তিকচন্দ্র ডাকুয়া বুদ্ধিমান ও গ্রামের মধ্যে খুব প্রভাবশালী লোক ছিলেন। মাতা অমলা দেবী খুব ধর্ম-পরায়না, সরলমনা ও সেবা পরায়না হওয়ায় তাঁকে সকলে ভালবাসতেন। প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যুর পর আমার জন্ম হওরায় পিতা মাতার অত্যন্ত আদরে প্রতিপালিত হয়েছিলাম। পাঠশালার পড়া শেষ হওয়ার পর আমি স্বদেশী নেতা কুমার চন্দ্র জানার প্রতিষ্ঠিত অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করি। কিছুদিন পর বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে পর ঘাসিপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ করে তখনকার দিনে তমলুক মহকুমার সর্বাপেক্ষা নাম করা হ্যামিলটন হাইস্কুলে পড়তে যাই। সেখানে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে ১৯৩০ সালে পড়া ছেড়ে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেই। এইদিন থেকে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অবসর নেয় নি। স্বাধীনতার প্রতিটি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

তমলুকে ১৯৩০ এ লবণ সত্যাগ্রহ প্রথম হয় নরঘাটে। সেখানে প্রথম যে পাঁচজন সত্যাগ্রহ করতে গিয়েছিলেন আমি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মোট ৭ বার জেলে যেতে হয়। মোট জেলের পরিমাণ হল ৭ বৎসরের অধিক কাল। শেষ বারে ৩ বছর ৬ মাস নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে জেলে ছিলাম। বাড়ীর লোকের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হত না। এ ছাড়া হাজত বাসতো ছিলই। গৃহবন্দীও কিছুদিন ছিলাম। জেলে সর্ব প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হয়। জেলের মধ্যে দীর্ঘদিন শেল বাসের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ি। শেষে প্রেমানন্দ স্বামীজীর যুক্তি ও পরামর্শের কাছে নতি স্বীকার করে কিছুদিন নিরস্ত ছিলাম বলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই।

লবণ সত্যাগ্রহের পর দেশ নেতা কুমার চন্দ্র জানার সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন কেটেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গান্ধী আশ্রমই ছিল আমার বাসস্থান। আমি একজন বড় গঠন মূলক কর্মী। প্রধানতঃ আমারই চেষ্টাতে সুতাহাটা থানায় এক হাজারের বেশী চরকা চলেছিল। সুতাহাটার প্রদর্শনী দেখে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

কৈলাশ নাথ কাজ্‌ু প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়রা খুব প্রশংসা করেছিলেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন গান্ধীজীর আশ্রম ওয়ার্ধায় ছিলাম। তাই গান্ধীজীও বিনোবাজীর সান্নিধ্য বেশ কিছু দিন লাভ করেছি। আমি কোন কথা পরকে বলার আগে নিজে পালন করি ও বাড়ীর সকলকে তা পালন করাই। আমি গান্ধীজীর প্রদর্শিত সমস্ত গঠনমূলক কাজে বিশ্বাসী ছিলাম শুধু নয়, নিজে তা পালনও করতাম। বর্ত্তমান পর্যন্ত তিনি দেশ সেবা মূলক কাজে নিযুক্ত আছি। গান্ধীবাদী হয়েও হিংসা অহিংসা প্রশ্নে আমার কোন গোঁড়ামী নেই। আমার ছোট ভাই পঞ্চানন ডাকুয়াও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও জেলে ছিলেন। স্ত্রীও জেলে ছিল।

কারা জীবনের স্মৃতি
শ্রী রামচন্দ্র দাস

রঙ্গলাল সাহা এবং অন্য আরও কয়েকজনের দ্বারা গঠিত যুগান্তর দলের পূর্নদাস 'গ্রুপ' যা শান্তি সেনা বলে পরিচিতি লাভ করেছিল—সেখানে যোগদানের মাধ্যমেই আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু। এর পর ১৯৩২ সালের ২রা মার্চ (তখন আমি বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র) সুরেন্দ্র মোহন কর, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুবল কর্মকার এবং সন্তোষ দত্ত এঁদের সাথে চারমুগারিয়া ডাকঘর লুঠ করার অভিযোগে আমিও পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হই। ফরিদপুরে এক বিশেষ আদালতে আমাদের বিচার হয় এবং বিচারে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রানদন্ড. সুরেন্দ্রমোহন করের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর আমাদের বাকী তিনজনের স্বল্প বয়স হেতু ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ও ৩৯৬ ধারা অনুযায়ী ৭ বছরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ১৯৩২ এর ১২ই মে বিচারের রায় বেরনোর পর ২২ শে আগষ্ট বরিশাল জেলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ফাঁসি দেওয়া হয়। যা হোক বিচারের রায় বেরনোর পর আমাকে প্রথমে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে পরে আলিপুর জেলে রাখা হলেও ১৯৩৩ এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

সেলুলার জেলে থাকাকালীন আমি জেলের বন্দীদের ডাকা অনশন ধর্মঘটে যোগ দিই। প্রথম পর্যায়ে ৪৬ দিনের অনশন ধর্মঘটে অনভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা জোর করে খাওয়ানো প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমাদের তিনজন বন্ধু মোহিত মোহন এবং মহাবীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং পরে তাদের দেহ ভারী পাথরের সাথে বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনশন ধর্মঘট চলেছিল ৩৭ দিন। এই দুটি পর্যায়ের অনশন ধর্মঘটের কারণও ছিল ভিন্ন। প্রথমটি ডাকা হয়েছিল জেলের বন্দীদের বন্দীজীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের দাবীতে। দাবীগুলির মধ্যে ছিল ভাল খাওয়ার, রাত্রিতে আলোর সুব্যবস্থা এবং পত্র পত্রিকা সহ অন্যান্য বই পত্র পড়ার সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনশন ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক কারণে। এই পর্যায়ে দাবীগুলির মধ্যে ছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর আশু মুক্তি, সেলুলার জেলে বন্দীদের স্ব স্ব প্রদেশে

ফেরৎ পাঠানো এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বিতীয় ডিভিসন বন্দী হিসেবে গণ্য করা—ইত্যাদি।

দেশের মূল ভূখণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্রেই এই অনশন ধর্মঘটের খবর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহনকারী ধর্মঘটীদের অনমনীয় মনোভাবের কাছে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার পরাজয় স্বীকার করে এবং দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করে ধর্মঘটীদের সমস্ত দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই দাবী আদায়েব ফলে আন্দামানে সেলুলার জেলের বন্দীদের দেশে ফেরানো শুরু হয় হয় এবং ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকেও দেশে ফেরৎ নিয়ে আসা হয়।

দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসায় পর আমাকে প্রথমে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হলেও পরে রাজশাহী ও ঢাকা জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১৯৩৮ এর এপ্রিল মাসে আমি পুরোপুরি মুক্তি পাই।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি প্রথমে আমার পুরোন কলেজে, পরে মেডিকেল স্কুলে ভর্তির আবেদন করি। কিন্তু দু'জায়গাতেই আমার আবেদন নামঞ্জুর হয়। এরপর আমি মোক্তারি পাশ করি কিন্তু আদালতে ওকালতি করার সরকারী অনুমোদন লাভে আমি বঞ্চিত হই।

স্বাধীনতার কয়েক মাস পরে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান সরকার আমাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ফলস্বরূপ আমাকে আমার পরিবার পরিজন সকলকে ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে হয়। দেশ বিভাগের ফলে আমার মত অনেকেই এই চরমতম দুর্ভোগের শিকার হয়। নিজের আত্মীয় পরিজন ছেড়ে নিজের বাড়ী ছেড়ে ভিন দেশে এসে মনে হচ্ছিল স্বাধীনতা যেন এক অভিশাপ।

পরে কলকাতায় আমরা কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী মিলে "আন্দামান প্রত্যাগত রাজনৈতিক বন্দী চক্র" নামে এক সংগঠন গড়ে তুলি।

পরে আমাদের সংগঠনের কতিপয় সদস্য বিভিন্ন সময়ে আন্দামানে বন্দী অবস্থায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সেলুকার জেল পরিদর্শনে যাই—তবে দুঃখের বিষয় যে আমাদের সদস্যরা সেলুলার জেলকে আর অক্ষত দেখতে পায়নি।

১৯৪৬ সালে তদানীন্তন অন্তবর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের এক আদেশ বলে সেলুলার জেল ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়। এই আদেশে

বিশেষ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের নৃশংসতার চিহ্নগুলি নিশ্চিহ্ন করার কথা বলা হয়। এ আদেশ আমরা যারা সেলুলার জেলে কোন না কোন সময়ে বন্দী ছিলাম আমাদের কাছে ছিল এক অভিশাপ স্বরূপ।

জাতির ইতিহাসে সেলুলার জেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় অত্যাচার, বর্বরতা, নৃশংসতার প্রতীক এই সেলুলার জেল। এই সেলুলার জেলকে নিশ্চিহ্ন করার সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে জনমতসংগঠিত হয়—সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যরা সেলুলার জেল ধ্বংস করার বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন—ফলস্বরূপ সরকার সেলুলার জেল ধ্বংস করা থেকে বিরত হয়।

স্মৃতির দর্পণে

শ্রী শীতাংশু দত্ত রায় (খুন্তু দত্ত রায়)

১৯২২ সালে নেত্রকোনাতে আমার জেঠতুতো দিদি স্বর্গীয় রাজলক্ষ্মী দত্ত ও তাঁর স্বামী স্বর্গীয় ধীরেন চন্দ্র দত্ত-র কাছে আমাকে পড়াশুনার জন্য পাঠানো হয়।

আমার এই জেঠতুতো দিদির বাড়ী ছিল তখনকার মুক্তি যোদ্ধাদের আখড়া-স্বরূপ। এখানে একদিকে যেমন আসতেন অনুশীলন সমিতির লোকজন—তেমনি আসতেন যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা। এই সমস্ত বিপ্লবীদের আমার দিদির বাড়ীতে আনাগোনা, তাদের দেশাত্মবোধক আলোচনা—আমার তরুণ মনকে নাড়া দেয় এবং আকৃষ্ট করে। বলা যায় আমার তরুণ মন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এরই ফলস্বরূপ আমি সরকারী বিদ্যালয় ছেড়ে নেত্রকোনায় জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ১৯২৫ সালে এই বিদ্যালয় চত্বরেই ময়মনসিং জেলা কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সম্মেলনে আমি ও আমার বহু বন্ধু-বান্ধব স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করি। বলা যায় এটাই ছিল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করার সুবাদে বহু জাতীয়তাবাদী নেতার সান্নিধ্যে আসারও সুযোগ পেলাম।

সেই সময়কার ময়মনসিং জেলার জেলাশাসক মিঃ গ্রাহাম সারা জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। এই সময়েই নেত্রকোনার শহরতলি অঞ্চল পুকুরিয়ার খাদি সেণ্টারে আগুন ধরানো এবং এখানকার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর পুলিশের লাঠি চালনা ও অত্যাচারের ঘটনায় আমার মনে যেন আগুন ধরে যায় এবং প্রত্যক্ষভাবে পুলিশ তথা প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুব আন্দোলনে লিপ্ত হই এবং আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়।

১৯৩২ এর ৪ঠা এপ্রিল পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করে এবং বিচারাধীন বন্দী হিসেবে প্রথমে ময়মনসিং জেলে ও পরে হিজলীতে অপরাধীদের শিবিরে রাখে। পরে ময়মনসিং জেলাশাসক মিঃ গ্রাহামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১২০ বি ধারা অনুযায়ী ৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই সময়ে ব্রিটিশ শাসকরা রাজনৈতিক বন্দীদের সাজা দেওয়ার জন্য সমস্ত বন্দীকে আন্দামানে সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠানোর এক

নির্মম পন্থা খুঁজে বার করল। বলা বাহুল্য যে আমাকেও আন্দামানে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন আমি জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের ডাকা অনশন ধর্মঘটে যোগ দিই। এই অনশন ধর্মঘটে জয়লাভের ফলে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং সমস্ত বন্দীকেই স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এর ফলেই আমাকে সেলুলার জেল থেকে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়। শেষে ১৯৩৮ এর জুন মাসে জেল থেকে পুরোপুরি ছাড়া পাই।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি নেত্রকোনায় ফিরে আসি। এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, জেলে থাকাকালীন আমার, কম্যুনিষ্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিছু বিপ্লবীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই কম্যুনিষ্ট আদর্শে এবং কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হই। নেত্রকোনায় ফিরে আসার পর আমি সরাসরি কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে যোগ দিই এবং শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন দেশের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে এই বিশ্বাসে স্থানীয় কৃষকদের সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করি। এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার্থে শ্রীশচীন হোম, ক্ষিতীশ সরকার, শচীন চক্রবর্তী, মৌলবী জাহিরুদ্দিন মুন্সী, মৌলবী আব্দুল হান্নাম, উমেশ সরকার, পরেশ সরকার, চন্দ্র সরকার, এঁদের সহযোগিতায় মুসলীম চাষীভাইদের এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করি।

এরপর দেশ স্বাধীন হল, আর দেশ বিভাগের মাধ্যমে দেশবাসী আর এক চক্রান্তের বলি হল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই সময়ে আমি আমার পরিবার পরিজনসমেত কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হই। তারপর আর এক সংগ্রাম। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। দেশের ভিটে মাটি ত্যাগ করে কলকাতায় এসে পরিবার পরিজনদের মুখের গ্রাস জোগাড়ের সংগ্রাম। পরিস্থিতির দায়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরাতে বাধ্য হলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় কর্মী হিসেবে ভারত সরকার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। আমি 'Ex-Andaman Political Prisoners fraternity circle' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এর ওপর বার্ধক্যজনিত কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করল। বর্তমানে আমি ৭৮ বছরের বৃদ্ধ এবং বলা যায় কার্যত গৃহে বন্দী।

———

সেই দিন হব শান্ত

শ্রী রবি নিয়োগী

সামন্তবাদী যুগের অস্তমিত কাল, জৌলুশ সান-সৌকত* ভাঁটার দিকে। এমনি একসময়ে ১৩১৭ (বাংলা) সনে একটি সুপরিচিত সামন্ত ভূস্বামীর পরিবারে জন্মেছিলাম। শেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারগুলির সাথে এই পরিবারটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। শুনেছি দাসদাসী পরিবেষ্টিত হয়ে, সোনার চামচে, রূপোর বাটিতে দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। আমার জন্মের পর মুখ দেখে আত্মীয় স্বজনেরা যে টাকা দেন সেই টাকা সুদে খাটিয়ে মা ১৬ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। যদিও পরবর্ত্তীকালে ঋণ-শালিসী বোর্ড চালু হলে তার সেই টাকার অনেকাংশই হারাতে হয়েছিল।

জন্মেই স্বদেশবাসীদের ক্ষুধা না দেখলেও মা বাবার মুখে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন, আসফাকুল্লা, রাজেন লাহিড়ী, বাঘা যতীনদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এরা স্বরাজ স্বাধীনতার কথা বলতেন, চরকায় সুতা কাটতেন, বিদেশী বর্জনের পক্ষেও ছিলেন। মা কারো বিপদ আপদের কথা শুনলে সাহায্যের জন্য ছুটে যেতেন। বাবা ছিলেন নির্বিবাদী, ভাল মানুষ।

১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লবের কথা শুনেছি—বলসেভিকদের ভাল লেগেছে। বিপ্লবের তাৎপর্য, লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয় বোঝার বয়স তখনো হয়নি। ১৯২১ সনে খেলাফত আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমানদের মিলিত প্রচেষ্টার উন্মাদনা দেখেছি। গান্ধীজী ও আলি ভাই দুজনের ব্যাজ লাগিয়ে বন্দেমাতরম, আল্লাহো আকবর শ্লোগান দিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছি। এই আন্দোলনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলেও এইটুকু বুঝেছিলাম আমরা বৃটিশ শাসনের অবসান চাই—আমরা স্বরাজ চাই।

১৯২৫ সনে গান্ধাজী এলেন ময়মনসিংহ সহরে। লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে আমরাও গিয়ে সামিল হলাম খদ্দরের কাপড় পরে টুপি মাথায় দিয়ে, মহারাজ ক্যাসেলে। ক্যাসেলের উপরতালা থেকে হাত নেড়ে শুধু চরকা কাটার জন্য উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন গান্ধীজী। বাল্যকাল থেকে এই ভাবে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলাম। ১৯২৭ সনে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের

---

* সান সৌকত=আড়ম্বর।

নিউ হোস্টেলে থেকে কলেজ জীবন সুরু হল। মার আলাদা তালুকদারি ও আলাদা তহবিল থাকায় বাবুগিরির শীর্ষ তালিকায় নাম থাকলেও শরীর চর্চার দিকে ছিল প্রবল ঝোঁক। প্রসিদ্ধ ধীরেন সেনের আখড়ায় জুটে গেলাম। সাথী হলেন হোস্টেলের অপরাপর ছাত্রদের মধ্যে অজিত রায়, মনমোহন সাহা। এরা যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত ছিলেন এখবর আমার জানা ছিল না। সরিষা বাড়ীর ধানায়ীর জমিদার প্রিয়নাথ রায় ছিলেন অনুশীলন দলের প্রাক্তন নেতা। তার ভাই হোসেন ও ছেলে সুধার সাথে একই রুমে থাকতাম। রুমমেট হিসাবে এদের সাথে যথেষ্ট খাতিরও ছিল। এরা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিল না। রাজনীতি নিয়ে এদের সাথে কোন আলোচনাও হত না। তবুও অনুশীলন দলের লোকেরা ধরে নিল অনুশীলন দলের প্রাক্তন নেতার পুত্র সুধা উত্তরাধিকার সূত্রে অনুশীলন দলের এবং যেহেতু আমি যুগান্তর দলের লোকেদের সাথে চলা ফেরা করি সেই হেতু আমি যুগান্তর দলের পক্ষে অনুশীলনের লোক ভাগিয়ে নিচ্ছি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে একদিন সন্ধ্যা বেলা সাপমারীর বি. এ ক্লাসের ছাত্র মধুসূদন গোপের সাথে সহর থেকে হোস্টেলে ফিরে আসার পথে টাউন হলের সামনে ১৫। ১৬ জন অনুশীলন দলের লোক আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। মধুসূদনবাবু ভয়ে পালিয়ে যান। আমি একাই আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার সময় জনৈক আক্রমণকারী নিজেকে রক্ষার জন্য আমার বাম চোখের ভুরুতে ছোরা দিয়ে আঘাত করে। আক্রমণকারীরা আর বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তারাও অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। এই ঘটনার পর থেকে আমার জীবনের মোড়টাই ঘুরে গেল। যুগান্তর অনুশীলন দলের মধ্যে কয়েকটি মারামারিও হয়ে গেল। আমিও যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মী হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরই আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। হিন্দু মুসলিম ছাত্রদের মিলিত আমাদের এই হোস্টেলের জনৈক ছাত্রের অভিযোগের তদন্ত করতে পুলিশবাহিনী সহ দারোগা সুপারিনটেণ্ডের রুমের দিকে যাওয়ার পথে কৌতূহলী ছাত্রেরা ভীড় জমালে দারোগা অপমানজনক মন্তব্য প্রকাশ করলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরা তাকে এবং কয়েকজন পুলিশকে মেরে পুকুরে ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে প্রচুর উত্তেজনা, বিক্ষোভের পর মামলায় আমাদের ১৭ জনকে ৩০ দিনের কারাদণ্ড দিলে আপীলে খালাস পেলেও বহু টালবাহনার পর কলেজের প্রিন্সিপাল আমাকে ২য় বর্ষে ভর্ত্তি করতে অস্বীকার করে। তার

সাথে কথা কাটাকাটি, ও একটি সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলে প্রিন্সিপাল ভয়ে তার অফিস কক্ষ ছেড়ে পাশের একটি ক্লাসে ঢুকে পড়লে ছাত্রদের মধ্যেও প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রিন্সিপাল আমাকে কলেজে ভর্তি তো করবেই না বরং আমার পড়শুনার ১২টা বাজিয়ে দিতে পারে এই আশংকায় পরদিনই কলকাতা গিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যাই। কলকাতায় এসে দলের কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়লে পড়াশুনা শিকেয় উঠল। শেরপুর ফিরে এসে মেতে উঠলাম আন্দোলন, সংগঠন গড়ার কাজে। জুটে গেল অনেকেই। জিতেন সেন—আমার সমবয়সী, সহপাঠী, আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী প্রবল প্রতাপান্বিত উমেশ রায়ের নাতি, ৪ জন ভৃত্যের তত্বাবধানে, সদা সতর্ক দৃষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তাকে চলতে হয়েছে, ভাল ছাত্র, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাংলায় ৯৫ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। সাহিত্য, সঙ্গীতে ছিল পারদর্শী—হেমন্ত ভট্টাচার্য আমার সহপাঠী, জমিদারদের কুল পুরোহিতের পুত্র, ভূপেন নাগ, নরেশ দত্ত, প্রমথ গুপ্ত, গবু নাগ, মাষ্টার সত্য বাগচি, ফণী সেন, প্রফুল্ল রায় আর্টিষ্ট, সুরেন কাহিলী প্রভৃতি অনেকে। ময়মনসিংহের ধীরেন সেনের আখড়ায়, ডন, কুস্তি, লাঠি, ছোরা খেলা, দড়ি বেঁধে মোটর আটকানো, শরীরের উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কসরত আমি শিখেছিলাম। অনুশীলন দলের অমর নাগও বুকের উপর রোলার পাস সহ অনেক কসরত জানতেন। তাই তাদের সাথে পাল্লা দিয়েই আমাদের গঠিত ক্লাবগুলিকে আমাদের প্রতি যুবকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হত। আমাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ পাঠাগার। লাঠি, ছোরা খেলা শেখা ও ব্যায়ামের আখড়াতে অনেক ছাত্র, যুবক ভীড় জমাতে থাকে। এখানে বলে রাখা দরকার সন্ত্রাসবাদী দলগুলির মধ্যে যুগান্তর দলও তখন কংগ্রেসের ভেতরের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। জমিদার শৈলেন চৌধুরী (জিশুদা) যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত থেকে কংগ্রেস করতেন, তাছাড়া যোগেশ নাগ, সতীশ মিত্র, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, উকিল ভূপতি রায়, ফণী মজুমদার, আসগর মোল্লা প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমার ছোট ভাই মনি আমার অনেক আগেই অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিল। সে আমাকে তখনকার দিনের শহীদদের জীবনের উপর লেখা নিষিদ্ধ ২/৪ খানা বই পড়তে দিয়েছে কিন্তু কোনদিন তাদের দলের কথা আমাকে বলেনি। সে ছিল দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া। লাঠি, ছোরা খেলায় ওস্তাদ। ১৯৩০ সনে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত

থাকার জন্য আমার জেলে যাওয়ার কয়েকদিন পর দিনের বেলায় জামালপুরে সহরের থানার (পুরাতন) সন্নিকটে পুলিশ মনিকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে সে গুলি চালিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতরে পালিয়ে যায়। পরবর্ত্তী সময়ে নিরাপত্তা আইনে ৬/৭ বছর বন্দী শিবিরে আটক থাকে। পার্টির কাজে প্রয়োজন হলে আমরা ২ ভাই মিলে মার অজান্তে তার সিন্দুক খুলে টাকাও নিয়েছি। সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই মনি বন্দীশিবির থেকে ফিরে এসেছিল এবং জ্যোৎস্না নিয়োগীর রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে তার যথেষ্ট অবদানও ছিল। দেশ ভাগের কয়েক বছর পর মনি আমাদের পরিবারের অন্যান্যদের সাথে পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। কলকাতা সহরের সন্নিকটে দমদমে লালগড় নামে যে কলোনিটি গড়ে উঠেছে সেটি গড়ে তোলার কাজে মনির অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। এই কাজটি করতে গিয়ে তাকে নির্যাতন, লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছে। মনি ১৯৫৪ সনে রোগ ভোগের পর দেহ ত্যাগ করে।

১৯২৯ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ভগৎসিংহ, শুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদের ফাঁসী হয়। বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয় সিংহ, জয়দেব কাপুর প্রভৃতি অন্যান্যদের সাথে যতীন দাসও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ব্রিটিশের কারাগারে বন্দীদের উপর অসহনীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের ন্যায্য মর্যাদা লাভের জন্য যতীন দাস ৬৫ দিন অনশন ধর্মঘট চালিয়ে মারা যান। তাঁর এই মহান মৃত্যুকে উপলক্ষ করে দেশব্যাপী এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে এলে বিক্ষুব্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য রাস্তায় নেমে আসে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে পরের দিন বিরাট শোভাযাত্রার সময় এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কয়েকজন নামকরা রাজকর্মচারীকে হত্যার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করলেও আমাদের এই কাজে দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একমাত্র নগেন্দ্র শেখর চক্রবর্তী আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ করে দিতে পারেন নি। "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা" এই শিরোনাম দিয়ে একটি লাল ইস্তাহার প্রকাশ করা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারিনি।

আন্দোলনের প্রবল চাপে পড়ে বৃটিশ সরকার বন্দীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনার মানদণ্ডে জেলে অবস্থানকারী দণ্ডিত বন্দীদের ১ম ও ২য় শ্রেণীর মর্যাদা দান করলেও রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য

পৃথক মর্যাদা স্বীকার করেনি। স্বাধীন বাংলা দেশেতে এখন পর্যন্ত বিচারাধীন বা দণ্ডিত বন্দীদের জন্য বৃটিশ সরকার প্রবর্ত্তিত সেই আইনই চালু রয়েছে।

১৯৩০ সনে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে উঠল—শিবির স্থাপিত হল। চাঁদা তুলে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। বিরাট গণ জাগরণ, উৎসাহ উদ্দীপনায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। গাঁজা মদের দোকানে আমরা ২১ জন স্বেচ্ছাসেবক 'পিকেটিং করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার লক্ষ্যে পুলিশের কাছে ধরা দিলাম। হাজার হাজার স্ত্রী, পুরুষ, যুবক যুবতী বালক বালিকা ফুল মালা দিয়ে আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানালো। জামালপুরের হাকিমের অনুরোধ উপেক্ষা করে আমরা স্বেচ্ছায় ৩ মাসের কারাদণ্ড ভোগের সাজা নিয়ে ময়মনসিংহ জেলে ঢুকলাম জেলার প্রথম দণ্ডিত সত্যাগ্রহী বন্দী হিসেবে। আমাদের পোষাক, ফুলের মালা খুলে ফেলে কয়েদীর জাঙ্গিয়া, কোর্ত্তা পরিধান করতে ও বুকে কয়েদী মার্কা চাক্‌তি ঝোলাতে বলা হল এবং লোহার থালা বাটিতে কুখাদ্য এনে হাজির করলে আমরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির হয় এবং আমাদের প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দেয়। জিতেন সেন, হেমন্ত ভট্টাচার্য, ভূপেন নাগ, বীরা ঘোষ, ঠাকুরদাস বসাক প্রভৃতি এবং কৃষক জলধর ক্ষত্রিয় এই দলে ছিলেন। আমাদের জেলে আসার পর পরই দলে দলে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার সত্যাগ্রহী জেলটা ভর্ত্তি করে ফেলে। নালিতাবাড়ীতে সুধেন্দু দাসের নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী কারাবরণ করে—আন্দোলন সারা জেলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা হিংসার আশ্রয় নিয়ে এই শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে অশান্তি সৃষ্টির পথে ঠেলে দেওয়ার উস্কানী দেওয়ায় ময়মনসিংহ ওয়ার হাউসে গুলি চালানো হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেহাম লেঙ্গুরা, কিশোরগঞ্জ সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস অফিসগুলি আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই আন্দোলনে জামালপুরের ডাঃ রমনীমোহন সাহা, কনেকশ্বর ভট্টশালী, সুধীর তালুকদার, সতীশ গুহ সহ বহু নেতা ও কর্মী কারাবরণ করেন। উল্লেখ্য, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে ছিলেন সব চেয়ে বেশী সংখ্যক খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা যাঁরা খেলাফত, ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁরা হলেন গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ (যুগান্তর পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন, যুক্তফ্রন্ট আমলে

খাদ্যমন্ত্রী), ফজলুল করিম (কারাটিয়া জমিদার চাঁন মিঞার সাথে একই জেলে ছিলেন খন্দকার মতিউর রহমান, নাসিরউদ্দিন আহম্মদ, তাহিরউদ্দিন আহম্মদ (মোক্তার). তৈয়ব আলী আহম্মদ (উকিল) সফিরউদ্দিন আহম্মদ ঘটি পালোয়ান, ডাঃ মোহসীন, ডাঃ কোরাইশ, কফিলউদ্দিন (মোক্তার) আব্দুল হামিদ মোক্তার (পাক হানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করে) মোসাহেব আলি খান, কারিমুজ্জমান, মুনীর ডাক্তার প্রমুখ। পরবর্তীকালে এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রগতিশীল আন্দোলনগুলিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে জমিরউদ্দিন ও তার কন্যা রাজিয়া যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত থেকে কংগ্রেসে কাজ করেছেন। রাজিয়া তখনকার দিনের সামাজিক জীবনের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করে, সারাজীবন অবিবাহিত থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নাসিরউদ্দিন প্রগতিশীল দলগুলির সমর্থক ছিলেন। তার বাড়িটি ছিল প্রগতিশীল বিভিন্ন দলের ঘাঁটি। রাজিয়া এখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থেকে মহিলা পরিষদের নেত্রী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পুত্র মোয়াজ্জেম গণতন্ত্রী পার্টির নেতা (কিছুদিন আগে পরলোক গমন করেছেন)। আত্মভোলা ও ত্যাগী আদর্শবাদী নেতা হিসাবে সুপরিচিত তাহিরউদ্দিন মোক্তার সাহেব অসচ্ছল অবস্থায় থেকেও আজীবন দেশের মেহনতী মানুষের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করেও কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে ন্যায়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ময়মনসিংহ জেলে আটক বন্দীদের থাকার জায়গা নেই, শোয়ার ব্যবস্থা নেই। হৈ চৈ কাণ্ড কারখানা শুরু হয়ে গেল। আমাদের পরে যাঁরা জেলে এসেছেন তাদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক বন্দী বাদে বাকী সবাইকে ৩য় শ্রেণীর বন্দী করে রাখা হল। সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হবার পর শেরপুরের কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা মুচলেকা দিয়ে মুক্তিলাভ করলে বিক্ষুব্ধ জনতা কুকুরের গলায় তাদের নাম ঝুলিয়ে মিছিল করে এদের ধিক্কার জানায়। শেরপুর শহরের অনেক বাড়ীর ছেলেরাই সত্যাগ্রহ করে জেলে গিয়েছেন। যেহেতু আমরা ছিলাম ১ম শ্রেণীর বন্দী তাই ময়মনসিংহ জেল থেকে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল দমদম বুলেট তৈরীর কারখানার স্থানটি কাঁটা তার দিয়ে ঘেরাও করে সাময়িক-ভাবে তৈরী একটা জেলে। বিভিন্ন দলের গ্রুপের নেতা, কর্মীরা ও গাড়োয়ান ধর্মঘটের নেতা বঙ্কিম মুখার্জী সহ কিছু নেতাও এই বন্দী শিবিরে সমবেত

হয়েছিলেন। জেলের মধ্যে জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলাপ আলোচনা প্রভৃতি কর্মকান্ড নিয়মিতভাবেই চলতে থাকল। বাইরে থেকে নেতারা এসে বন্দীদের সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগও পেয়েছিলেন। এই আন্দোলন চলাকালে, দেশব্যাপী নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর বর্বর পুলিশী জুলুম, নির্যাতন প্রতিরোধে নেতৃত্বের ব্যর্থতা, অযোগ্যতার ফলে আন্দোলনের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে।

তিন মাস জেল খেটে বাইরে এলাম। জেলে গিয়েছিলাম সবার আগে ফিরে এলামও সবার আগে। জেলে যাওয়ার সময় জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন পেয়েছিলাম, ফিরে আসার সময়ও পেলাম। কয়েকদিন পরই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবর জেনে দেশবাসী সচকিত হয়ে উঠলো। আমাদের রক্ত আগুন জ্বলে উঠল। "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। জীবন মৃত্যু তখন আমাদের কাছে পায়ের ভৃত্য। কিন্তু শুধু মনের আবেগ দিয়েই কাজ হবে না।" কি দিয়ে আমরা লড়বো—সাজ সরঞ্জাম চাই ; অস্ত্র চাই, অস্ত্র যোগাড় করার জন্য অর্থ চাই। লড়াইয়ের কোন প্রস্তুতিই আমাদের ছিল না। ছিল না সুসংগঠিত কোন দল। উপর তলার নেতাদের সাহায্য দানে ইতঃস্ততা সত্ত্বেও আমরা চুপ করে বসে থাকলাম না। দলের ডেপুটি নেতা শ্যামানন্দ সেন, খোকা রায়, হরেশ ভট্টাচার্য, জগদীশ মজুমদার প্রভৃতির উদ্যোগে ১টি মাওজার পিস্তল, একটি ৪৫০ ও একটি ৩৮০ সকার্যময় রিভলবার নিয়ে আমাদের কাজ সুরু হ'ল। ঠিক করা হল শেরপুরের জমিদার, ধনিকদের ভয় দেখিয়ে টাকা যোগাড় করতে হবে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ময়মনসিংহ থেকে শ্যামানন্দ সেন, খোকা রায়, নগেন দেব, বিধু সেন শেরপুর আসছেন—এবং আমাকে জামালপুর গিয়ে তাদের নিয়ে আসতে হবে এই খবর পেঁছিল। ঠিক করা হল আমাদের গতিবিধি পুলিশ যাতে লক্ষ্য করতে না পারে সে জন্য সন্ধ্যায় গোদাড়া পার হয়ে শেরপুরে যাওয়া হবে। নদী পার হওয়ার জন্য আমরা সন্ধ্যায় গোদাড়া ঘাটে সমবেত হলে গোদাড়া ঘাটের ঠাকুর (সে সময়ে অধিকাংশ গোদাড়া ঘাটের ইজারাদার ছিল হিন্দুস্থানী) ইচ্ছাকৃত ভাবে, নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করতে সময় ক্ষেপন করছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম

আই. বিরে নির্দেশেই সে ঐ ধরণের কাজ করেছিল—ওরা সন্দেহ করেছিল গোদাড়া ঘাট দিয়ে আমাদের নদী পার হওয়ার সম্ভাবনার কথা। কিছুক্ষণ পর আমরা দেখতে পাই আই. বি ইনস্পেকটর মফিজ ও তার দেহ রক্ষক সার্প সুটার খলিল আমাদের কাছে পৌঁছাবার জন্য রাস্তা থেকে ঘাটে নামার জন্য নির্মিত পাকা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে এবং রাস্তার উপর সশস্ত্র পুলিশ ব্যারিকেড তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের হাতে ধরা পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে আমরা প্রথমেই গুলি চালাতে সুরু করলে অপর পক্ষও আমাদের ঘায়েল করার জন্য ইতস্ততঃ গুলি ছুঁড়তে থাকে। কয়েক মিনিট গোলাগুলি ছোঁড়ার পর চেয়ে দেখি চারিদিকে অন্ধকার, দোকান পাট বন্ধ। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি বন্ধুরা কে কোথায় বুঝতে পারছি না। সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় উঠে দেখলাম কয়েকটি জুতা ও লাল পাগড়ী পড়ে আছে। এতগুলি সশস্ত্র লোক থাকলেও কেন তারা এইভাবে পালিয়ে গেল তার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তারা জানতো 'স্বদেশীরা' বেপরোয়া, প্রাণের ভয় করে না। যে কোন সময়ে বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। তাই মাসিক ১৮টাকা বেতনে নিয়োজিত পুলিশেরা প্রাণ হারাতে চায় নি। জনমানব শূন্য রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পথে সুকুমার মজুমদারের সাথে দেখা হয়। গোলাগুলির শব্দ শুনে কি ঘটেছে জানার জন্য চেষ্টা করছিল। তার সাথে ষ্টেশনের সামনে অবস্থিত তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ট্রেন বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জামালপুর সহর ঘেরাও করে ফেলল। তারা সকাল বেলা সুকুমারের বাড়ী হানা দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল। আমি পালিয়ে গেলাম। ময়মনসিংহ জেলার সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম ঘটনা।

জামালপুর গোদাড়া ঘাটের এই খণ্ড যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অনেক হৈ চৈ করল—অনেক গল্প কাহিনী তৈরী হল। একদিকে আই. বি বাহিনীর সশস্ত্র লোক ও বিরাট এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী—প্রায় ৫০ জন—অন্য দিকে আমরা ৫ জন সম্বল ১ টি মাওজার পিস্তল, ৪৫০ বোরের একটি রিভলবার এবং ৩৮০ বোরের প্রায় অচল রিভলবার—অসম যুদ্ধ, তবুও আমরা জিতেছিলাম —তারা ভয়ে পালিয়েছিল।

জামালপুর সুটিং কেস নামে অভিহিত এই মামলায় ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত খোকা রায়, নগেন দেব, বিধু সেনকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল।

এই ঘটনায় আমাদের অর্থ সংগ্রহের প্লানটাই বানচাল হয়ে যায়। অর্থ ছাড়া

আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সহজ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। শেরপুর শহর থেকে ১১।১২ মাইল দূরে আমাদের দলভুক্ত প্রমথ গুপ্ত থাকতো পাটকুড়ায়, আর ফনী সেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম মালধায়। তাদের কাছ থেকে আমরা খবর পেলাম মালধা জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসবাসকারী একজন হিন্দুস্থানী বাট্টাদারের কাছে ১৯।২০ হাজার টাকা আছে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে টাকাটা আনতে হবে। তবে জমিদার বাড়ীতে ২।৩টি বন্দুকও আছে তাই হুঁশিয়ার হয়েই যেতে হবে। শুধু মাত্র ১টি রিভলভারের উপর ভরসা করে যাওয়া যাবে না। যে কোন দুর্ঘটনার মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়েই আমাদের যেতে হবে। জিতেন সেনের বোন রানী, আমার বোন মলিনা, আড়াই আনি ছোট তরফের জমিদার যতীন চৌধুরীর মেয়ে খুকিদি আমাদের কাজে সাহায্য করত। রানীর সাহায্যে তাদের বাড়ীর বন্দুকটি, গবু নাগের এবং তাদের বাড়ীর সুরেশ নাগের বন্দুকটি একই সাথে আমাদের হাতে এসে গেল। মাধবপুরের নরেশ দত্তের উপর আর একটি বন্দুক নিয়ে আসার দায়িত্ব অর্পিত ছিল কিন্তু সে বন্দুকটি আনতে পারেনি—কারণ শহরের ২টি বন্দুক এক সাথে উধাও হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে অন্য বন্দুকগুলির অধিকারীরা সতর্ক হয়ে যায়। ছোট বাড়ীর জমিদার কন্যা খুকিদির সাহায্যে আমরা তার বাবার রিভলভারের কিছুগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে ছোট বাড়ীর বাগান বাড়ীতে দীর্ঘকাল আন্দামানে কারাদণ্ড ভোগের পর প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল জমিদারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষক হিসাবে বসবাস করতেন। অবশ্য তখন তার রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না—আমাদের সাথেও তার কোন যোগাযোগও ছিল না।

বন্দুকগুলি চুরির ঘটনায় শহরে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় পুলিশী তৎপরতাও বেড়ে যায়। আমাদের প্লানটি কার্যকরী করার ব্যাপারে কালক্ষেপণের কোন সুযোগও ছিল না। তাই কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কয়েকজন বন্ধুকে ময়মনসিংহ থেকে এখানে পৌঁছাবার খবর পাঠালে প্রবোধ রায়, ধীরেন দাস, প্রবীর গোস্বামী, চন্দ্রকোনার সুধেন্দু দাস পৌঁছে গেলো। আমরা ৮ জন তরুণ। অনভিজ্ঞ সুধেন্দু দাসের নেতৃত্বে সালধায় গিয়ে হাজির হলাম। সালধায় বাট্টাদারের ঘরে পৌঁছে অনেক ডাকাডাকির পর সে ঘরের দরজা খুলে না দিলে আমরা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ঘরের দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, যে কাঠের সিন্দুকে টাকা আছে সেটির উপর সে ভীত

সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়ীতেই থাকতো আর্টিষ্ট প্রফুল্ল রায়, রাজনীতি করতো আমাদের সাথেই, বেপরোয়া ধরণের, সেই বলপূর্বক তাকে সিন্দুকের উপর থেকে নামিয়ে আনে। তালা ভেঙ্গে আগে পাওয়া খবর অনুসারে যে সব পাত্রে টাকা ছিল আন্দাজ করে সেগুলি নেওয়া হল। বাত্রাদারের হৈ চৈ শুনে জমিদার ও তার কর্মচারীরা এবং শত শত লোক আমাদের ঘেরাও করে ফেলে। একটা সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারা গুলি ছোঁড়ার আগেই আত্মরক্ষার জন্য আমরা প্রথমে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হই। পায়ে গুলি লেগে জমিদার মাখন চক্রবর্ত্তী ও ২।৩ জন আহত হলে এটা স্বদেশী ডাকাতদের কাণ্ড টের পেয়ে সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়— জমিদার বাড়ীর লোকেরা ভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বয়সে ছিলাম আমরা সবাই তরুণ, ছিল না কোন অভিজ্ঞতা। ডাকাতি করার ইচ্ছা থাকলে আমরা সেদিন অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করতে পারতাম। আমরা যে সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলাম পথে খুলে দেখা যায় সেগুলির মধ্যে টাকা নেই। পরের দিন পুলিশ সেই সিন্দুক থেকে ১৫ হাজার টাকা পেয়েছিল।

এই ঘটনা অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত হয়। একটি হুলুস্থুল বেধে যায়। জেলা, মহকুমা সদরের সম্মিলিত পুলিশ বাহিনী, আই বি বাহিনী শেরপুরে জমা হয়ে তাদের অভিযান শুরু করে দেয়। সুপরিকল্পিত কোন প্ল্যান আমাদের ছিল না, ছিল না কোন গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা তাই শহর থেকে সরে পড়তে হ'ল। সেদিন এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে পিয়ারপুর ষ্টেশনে পুলিশ চন্দ্রকোনার নগেন মোদককে গ্রেপ্তার করে ২টি রিভলভার ও গুলি রক্ষিত একটি সুটকেশ সহ। সংগঠন ছিল খুবই দুর্বল। কোন কোন জায়গায় ২/৪ জন যারা ছিলেন তারাও ছিল অসংগঠিত এবং যোগাযোগ ও নেতৃত্ববিহীন।

ময়মনসিংহ এলে পার্টি নেতারা নির্দেশ দিলেন আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রদের মাহিনার টাকা ব্যাংকে জমা দিতে নিয়ে যাওয়ার সময় পথ থেকে সেই টাকা নিয়ে আসতে হবে। আমি ও কিশোরগঞ্জের জগদীশ ভট্টাচার্য টাউন হলের সামনে ২টি রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম ভয় দেখিয়ে সহজেই টাকা নেওয়া যাবে এই আশায়। কিন্তু কলেজ থেকে আমাদের কাছে খবর পৌঁছলো কড়া পুলিশ পাহারায় গাড়ীতে করে টাকা নিয়ে আসা হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হ'ল। আমাদের জানা ছিল না কিছুদিন আগে ঢাকায় এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিল বলেই পুলিশ অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করেছিল।

ময়মনসিংহ থেকে গফর গাঁয়ে এসে কৌতূহল বশে রিভলভার ২ টি কার্যকর অবস্থায় আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল একটি অচল। সেই দিনের ঘটনার সময় অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হলে ফলাফল কি দাঁড়াতো সহজেই অনুমান করা যায়। আজকের দিনে আমাদের দেশে এখন নানা ধরণের অস্ত্র সহজ লভ্য। সমাজবিরোধী ও সরকারী দল সহ অনেক রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী বাহিনীর কাছে প্রচুর রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু তখনকার দিনে অস্ত্র সংগ্রহের কাজটি ছিল খুবই দুরূহ। আজকের দিনের মত সে সময়ে আমাদের কিছু অস্ত্র থাকলে আমরা বৃটিশ সরকারকে ব্যাপক ভাবে নাস্তনাবুদ করতে পারতাম। যায় যাক প্রাণ দেশের তরে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, নিবেদিত তরুণ যুবকের তখন অভাব ছিল না।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও কাজের সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার অভাবে চুপচাপ বসে থাকার অসহনীয় বিড়ম্বনার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী ঘোরাফেরা করে নেত্রকোনায় এসে পেঁৗছলাম। স্থানীয় পার্টি নেতা সুধীর মজুমদার আমাকে একটি উন্নত মানের রিভলবার দিলেন। কিন্তু আশ্রয়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। সিদ্ধেশ্বরী পুকুর পাড়ে কংগ্রেসী আমার একজন আত্মীয় উকীল শ্রী অশ্বিনী সেন ও তার একজন বন্ধু শ্রী শ্রীশধর উকিল থাকতেন। সাগ্রহে তারা আমাকে আশ্রয় দিলেন। সন্ত্রাসবাদের রোমান্টিক আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীশ বাবুর মেয়ে লিলি সারাক্ষণ আমার নিরাপত্তা বিধানের কাজে নিয়োজিত থাকতো। কয়েকদিন পর লিলির বিবাহ অনুষ্ঠানে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও উপস্থিত ছিলাম। নেত্রকোনার ঝানু আমলা, এস্ ডি ও কে হত্যা করার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাগে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে সব সময়ে সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতো। সফলভাবে কোন একটি কাজও করতে না পারার ব্যর্থতার গ্লানির জ্বালায় জর্জরিত অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থা নিয়ে কালক্ষেপন অসহনীয় হয়ে উঠছিল। তাই কিছু করার আশায় ময়মনসিংহ এসে জানলাম কয়েকজন বন্ধু ধরা পড়েছেন, কিছু আত্মগোপন করে আছেন এবং ২।৪ জন যারা সতর্ক অবস্থায় তাদেরও কাজের কোন পরিকল্পনা নেই। হতাশ হয়ে একটি মাত্র রিভলবার সম্বল করে প্রমথ গুপ্তকে সাথে নিয়ে বাড়ীর দিকে আসার সময় শহরের প্রবেশের পথে নবীনগাঁয়ের মোড়ে একদল

সশস্ত্র পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গিয়ে ধরা পড়তে হয়। ঘড়ি না থাকায় সময় নির্দ্ধারণের উপায় ছিল না এবং সতর্কমূলক ব্যবস্থার জন্য সেখানে একদল সশস্ত্র পুলিশ ঘাঁটি করে বসে আছে না জানায় এই বিপর্যয় ঘটে। পুলিশ আমাদের পরিচিতি না জানায় ৫ আইনে গ্রেপ্তার করে থানার হাজতে নিয়ে যায়। রিভলবারটার ব্যবহার করে পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না বলে সেটি রাস্তার একস্থানে রেখে আসতে হয়। পরের দিন সকালে পুলিশ আমাদের পরিচয় জানতে পারে, শহরেও খবরটি রটে যায়। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবেরা দেখা করতে এলে তাদের কাছে রিভলবারের সন্ধান দিলে তারা সেটি নিয়ে যায়। এই ভাবেই সন্ত্রাসবাদী জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ময়মনসিংহ জেলায় সন্ত্রাসবাদী ২টি বড় দল থাকলেও কোন উল্লেখযোগ্য, চমকপ্রদ ঘটনার ইতিহাস সৃষ্টি করা যায়নি।

শুধু মাত্র ভাবপ্রবনতা নির্ভর এই আন্দোলনের সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের ত্রুটি, দুর্বলতার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এই ধরণের আন্দোলনের কোন ভবিষ্যত নেই।

মামলার সংস্পর্শে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। স্পেশাল ট্রাইবুনালে দেড় মাস বিচারের পর আমাদের ৬ জনকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। এখানে বলে রাখা ভাল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে সক্রিয় অংশগ্রহনকারী হিসাবে যাদের বিচারে দণ্ড দেওয়া হয় তাদের জেলে ২য় শ্রেণীর বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হলেও পরে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য হওয়ার সব রকম আইনগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিহিংসা বশে বৃটিশ সরকার তাদের সে সুযোগ দেয়নি।

মুক্তির নূতন পথের সন্ধান করতে হবে এই ধরণের মানসিক অবস্থা নিয়েই রাজশাহী জেলে এসে মিলিত হলাম সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, সুনির্মল সেন, সুবোধ চক্রবর্তী প্রভৃতি বন্ধুদের সাথে।

রুশ বিপ্লবের ঢেউ এ দেশেও পৌঁছে গিয়েছিল নানাভাবে, বিভিন্ন পথে। বিপ্লবের জন্ম লগ্ন থেকেই দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিভিন্নমুখী অভিযান, কুৎসা প্রচারনায় লিপ্ত ছিল। এ দেশের বিপ্লবীদের মধ্যেও অনেকেই ঐ বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সন্ত্রাসবাদী পথ তখনি পরিহার করতে পারেনি। এদের মধ্যে কয়েকজন সমাজতন্ত্রের উপর লেখা

কিছু বইও সাথে এনেছিলেন। সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ যোগাতে পারে এমন কোন বইপত্র না দিলেও সমাজতন্ত্রের উপর লেখা কিছু বইয়ের উপর সেন্সাসের কড়াকড়ি ছিল না। তাই এখানে এসেই পড়াশুনা ও আলোচনার সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থা বাড়তে থাকলো।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শুরুর দিকে যারা ধরা পড়েছিল তাদের জেলে ভালভাবে থাকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া সহ কর্তৃপক্ষের বন্দীদের সাথে ব্যবহারের নমনীয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরবর্তীকালে যখন বাইরে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকল বন্দীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাবও প্রকাশ পেতে থাকল। শুরু হয়ে গেল নির্যাতনের পালা। জেল আইন ভঙ্গ করে চলার অভিযোগে প্রতিদিন সাজা প্রদান—পত্রিকা পড়া বন্ধ করা, বই পত্র কেড়ে নেওয়া, চিঠি লেখা বা পাওয়া এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ বাতিল—খাট, চেয়ার, টেবিল নিয়ে যাওয়া। রাত্রিতে হাতকড়ি, পায়ে ডাণ্ডা বেড়ী, আতরা বেড়ী লাগানো, ভাতের বদলে ৪ দিন মাড়ভাতের ব্যবস্থা, রেমিশন কেটে নেওয়া প্রভৃতি জেল কোডের ব্যবস্থা অনুযায়ী যত রকমের সাজা দেওয়ার বিধান আছে সবগুলি একের পর এক আমাদের উপর প্রয়োগ হতে থাকল। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা সরকারী ভাবে দেওয়া হয়েছিল বলেই ইচ্ছা থাকলেও জেল সুপার আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নিতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের নতি স্বীকার করাতে ব্যর্থ হওয়ায় ওয়ার্ড থেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কনডেমণ্ড সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। জেল সুপারিনটেনডেণ্ট লিউকের জুলুম-বাজির খবর বাইরের বন্ধুরাও জেনে গেলেন। একদিন বিকাল বেলা যখন আমরা সেলের সংকীর্ণ নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতরে পায়চারি করছিলাম তখন সেল সংলগ্ন জেলে ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীরের বাইরের রাস্তায় পর পর কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা গেল। তড়িৎ গতিতে খবর পৌঁছে গেল সুপারকে. তার বাংলোয় যাওয়ার পথে গুলি করা হয়েছে। বুক পকেটে রক্ষিত নোট বইটি ভেদ করে পিস্তলের গুলি বুকে বিদ্ধ না হওয়ায় সে বেঁচে যায় আহত অবস্থায়। এই ঘটনার সাথে সাথে জেলের ভেতরে পাগলা ঘণ্টি বাজতে শুরু হল। জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য আমাদের উপরও চড়াও হবার সম্ভাবনা। সেলের ভেতর ঢুকে আমরা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। অবশ্য জেলের ভেতরে সশস্ত্র বাহিনীর সামনে বন্দীরা খুবই অসহায়। হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে বন্দীরা জেল থেকে যাতে

পালিয়ে যেতে না পারে মূলতঃ সেই কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পাগলা ঘণ্টি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। নামকরা মামলার দুর্ধর্ষ বন্দীদের রাখার জন্য সুরক্ষিত ওয়ার্ড বোম্বে ওয়ার্ড নামে পরিচিত 'ওয়ার্ডে' এসে দেখলাম ইতিমধ্যে আন্দামানে পাঠাবার জন্য আরও কিছু বন্দীদের বিভিন্ন জেল থেকে এনে সেখানে জড়ো করা হয়েছে। প্রথম দফায় আন্দামান যাওয়ার কৌলিণ্য লাভে বঞ্চিত হওয়ায় মনটা খারাপ হয়েছিল তাই দ্বিতীয় দফায় আন্দামান যাচ্ছি জেনে ভালই লেগেছিল। আন্দামান যাওয়ার প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে ছিল শেষ বারের মত বাড়ীর লোকদের সাথে দেখা করে যাওয়া আর সাথে কিছু বইপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া।

১৯২১ সনে চাঞ্চল্যকর শিবপুর ডাকাতি মামলায় যাবত জীবন দণ্ডে দণ্ডিত এবং বেশ কিছু কাল আন্দামানে নির্বাসিত জীবন যাপনের পর শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি প্রাপ্ত প্রৌঢ় নিখিল গুহকে আবার ধরে আনা হয়েছিল বাকী দণ্ড ভোগের জন্য। তিনিও আমাদের সাথে আন্দামানের যাত্রী ছিলেন। আন্দামান যাত্রার দিন তিনি সাথে নিলেন একটি শিশিতে বাংলার জল অপর একটি কৌটায় বাংলার মাটি। আমরা সাথে নিলাম সমাজতন্ত্র শেখার ও অন্যান্য বইপত্র। হাতে কয়ড়া, পায়ে ভারী ডাণ্ডাবেড়ী লাগিয়ে, কয়েদী গাড়ীতে উঠিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পাথর ঘাটার জাহাজ ঘাটাতে—সেই দীর্ঘ রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ করে নিরাপত্তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে— আমরা ২৫ জন ডাণ্ডাবেড়ী বাজিয়ে, বৃটিশ সরকার ধ্বংস হোক শ্লোগান দিয়ে, হৈচৈ করে আদ্যিকালের জাহাজ "মহারাজে"—উঠলাম। বেশ কয়েক বছর আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রেরণ করা বন্ধ থাকার পর আমাদের সেখানে আবার পাঠাবার জন্য বিশেষ আইন তৈরী করা হয়েছিল। এই সাবেক কালের জাহাজটি বন্দীদের আনা নেওয়া এবং মালপত্র আমদানি-রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হত। জাহাজের খোলের ভিতর (জাহাজের নিম্ন ভাগে বন্দীদের রাখার জন্য তৈরী সেলে) আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। সমুদ্র বক্ষে বিচরণে অনভ্যস্ত বলেই ঢেউয়ের দোলায় মাথা ঘোরা, বমি বমি বোধ করা প্রভৃতি উপসর্গে ভুগে ভুগেই যাত্রার চতুর্থ দিনে লোক চক্ষুর অন্তরালে সমুদ্রের সন্নিকটেই অবস্থিত আন্দামান সেলুলার জেলে পৌঁছে গেলাম। এখানে আমাদের পাঠাবার আগেও পাঠানো হয়েছিল ১৮৫৭ সনের মহান সিপাহী বিদ্রোহের বীর অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের।

১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সনে ওয়াহাবী বন্দীদের, ১৯১৫ সনে পাঞ্জাবের গদর পার্টির বন্দীদের (এরা আমেরিকা থেকে একটি ভাড়াটিয়া জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করার জন্য) ১৯২২—১৯২৪ সনে মোপলা বিদ্রোহীদের, তাছাড়াও আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল ১৯০৯ থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে বৃটিশ রাজকে উৎখাতের জন্য সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে লিপ্ত বিপ্লবীদের। সর্বশেষে পাঠানো হয়েছিল আমাদের ১৯৩২ সনে। নূতন কায়দায় নির্মিত সেলুলার জেলটির নির্মাণ কাজ সুরু হয় ১৮৯৬ সনে—শেষ হয় ১৯০৬ সনে। সস্তা বন্দীশ্রম দ্বারা নূতন কায়দায় নির্মিত এই জেলটি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৫,১৭৩৫২ টাকা। যারা প্রথমদিকে এসেছিলেন আন্দামানে তাদের বিচরণ করতে হয়েছে আদিম কালের গভীর জঙ্গলে, অস্বাস্থ্যকর, ঈশ্বর পরিত্যক্ত, শত্রুমনোভাবাপন্ন জংলীদের দ্বারা পরিচালিত, নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী শাসকদের কঠিন বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে।

১৮৫৭ সনের মহান বিদ্রোহ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একটি পেনাল সেটেলমেন্ট (বন্দী উপনিবেশ) তৈরী করার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলির নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে প্রধানতঃ সস্তা বন্দীদের শ্রম ব্যবহার করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৭৮৯ সনে ক্যাপ্টেন ব্লায়ারকে এই দ্বীপপুঞ্জটি দখল করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্যাপক ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, জংলিদের উৎপাত ও অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য বিবেচিত হওয়ায় ১৭৯৬ সন থেকে এই দ্বীপপুঞ্জটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। ১৮৫৭ সনে অগণিত বিদ্রোহী বন্দীদের কোথায় রাখা যায় এই জটিল সমস্যাটি দেখা দিলে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে এই দ্বীপটি পুনরায় দখল করে বিদ্রোহী বন্দীদের সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ৬০ বছর আগে বাসযোগ্য নয় বলে যে স্থানটি পরিত্যক্ত হয়েছিল সেই স্থানটিকেই বন্দীদের বাসোপযোগী বলে বিবেচিত হল। নিশ্চিত মরণের পথে ঠেলে দেওয়ার কৌশল হিসাবেই যে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী বন্দীদের এখানে পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না। ১৮৫৭ সনে যারা হাজার হাজার লোককে নির্বিবাদে হত্যা করেছে, শত শত লোককে রাস্তার পাশে গাছের ডালে লটকে ফাঁসি দিয়েছে, মৃত দেহের উপর যারা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে বহু লোককে—সাম্রাজ্য হারাবার ভয়ে, অন্ধ আক্রোশে। তারা বন্দীদের প্রতি সদয় হবে ভাবা যায় না।

আন্দামান জেলে এসে একটি নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। শ্রেণী হিসাবে বন্দীদের ২ ভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছিল। বেশীর ভাগ বন্দী যারা ৩য় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন খাওয়া থাকার ব্যাপারে তাদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়। এইভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জেল কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রবীর গোঁসাই, সুধেন্দু দাস প্রভৃতি কয়েকজনকে বেত্রদণ্ড ভোগ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত আমরণ অনশন ধর্মঘটের পথ বেছে নেওয়া হয়। ৪৩ দিন স্থায়ী এই ধর্মঘট, মোহিত, মহাবীর, মোহনের আত্মাহুতির পর সরকার বন্দীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বাধ্য হয়। আমরা জেলের ভেতরে অবাধে চলাফেরা করা, খেলাধূলা, আলাপ আলোচনা, সভা, ক্লাস করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, নাটক মঞ্চায়ণ করার সুযোগ পাই। একটা নরককে আমরা মানুষের বাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। প্রথমে আমরা ৩২ জন মিলে কমিউনিষ্ট কন্সলিডেশন গঠন করে একটি মার্কসিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করি। বাইরের পার্টির সাথেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রেরিত বন্দীদের কয়েকজন বাদে আর সবাই কমিউনিষ্ট কন্সলিডেশান-এ যোগ দিয়ে, মুক্তি লাভের পর কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী করেন।

আন্দামান ও আন্দামান বন্দীদের উপর নলিনী দাস, বঙ্গেশ্বর রায়, কালী চক্রবর্ত্তী সহ আরও কয়েকজনের লেখা বই এবং আমারও কয়েকটি লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আন্দামানের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রোয়জন।

১৯৩৬ সনে আমাদের কয়েক জনের মুক্তির দিন এগিয়ে এলো—আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি—আন্দোলনের সুযোগ হবে তাই এ সময়টি বেছে নিয়ে—মুক্তি ও দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবীতে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব গৃহীত হল—দেশাভিমুখি আমাদের যাত্রা ও অনশন ধর্মঘট একসাথে শুরু হল। কলকাতার জাহাজ ঘাটে নেমেই আমরা অনশন ধর্মঘটের প্রচার সুরু করলাম এবং জেলে পৌঁছে বাইরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দেশব্যাপী এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারলাম। প্রচার কালে আমার লেখা একটি চিঠি কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে যায় তাই মনে হয়েছে ময়মনসিংহ জেল থেকে মুক্তি লাভের পরের দিন আবার আমাকে গ্রেপ্তার করে দিনাজপুর ঘোড়াঘাট থানায় অন্তরীণ করা হয়। ৭ বছর জেলে থেকে মুক্তি লাভের পরের দিন এইভাবে গ্রেপ্তার ও

অন্তরীণ করার প্রতিবাদে "আনন্দবাজারে" পত্রিকায় আমার মায়ের একটি চিঠি প্রকাশের পর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বন্দীদের পেছনে পড়া থানাগুলিতে অন্তরীণ করে রাখার ব্যবস্থাও চালু করেছিল। বৃটিশ সরকার আন্দামানে, দেশের বিভিন্ন জেলগুলিতে, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বন্দী শিবিরগুলিতে, বিভিন্ন থানাগুলিতে অন্তরীণ রেখে বন্দীদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। "তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"—বন্দীরা শাণিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি চেতনা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলেন।

১৯৩৮ সনে মুক্তি লাভের সাথে সাথে বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে কলকাতায় গিয়ে কাজ করতে থাকি। কমরেড মুজাফফর আহমদ, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আবদুল হালিম, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি নেতৃবর্গের সক্রিয় সহযোগিতায় ভারত বন্ধু নামে খ্যাত জন এনড্রুজকে সভাপতি নির্বাচন করে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভার আয়োজন করি। আজকের দিনের মত তখন মাইকের প্রচলন খুবই কম ছিল। কষ্টে সৃষ্টে একটি মাইক সংগ্রহ করে খোলা ট্রাকে আমরা কজন শহরের নানা স্থান থেকে প্রচারনা শুরু করলে কলকাতা শহরে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রচারের কাজে চোঙ্গা চাটাই (পোষ্টারের জন্য) আমরাই প্রথম চালু করেছিলাম। আমাদের এই ধরণের আকস্মিক প্রচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ট্রাক সহ আমাদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। আমাদের এইভাবে গ্রেপ্তারের খবর, খবরের কাগজের স্পেসাল বুলিটিনে প্রকাশিত হয়—যথেষ্ট চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়। আমাদের এই ধরণের চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী প্রচার বন্ধ করার লক্ষ্যেই পুলিশ আমাদের ৫ আইনে গ্রেপ্তার করেছিল এবং সভার আগেই ছেড়ে দিলে সভার কাজও খুব জমে উঠেছিল।

পার্টির নির্দেশে ময়মনসিংহ ফিরে এসে পার্টি ও গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করি। মনি সিংহ, খোকা রায়, আলতাব আলী, পুলিন বক্সী, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, সুনির্মল সেন প্রভৃতি কয়েকজন মিলে জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করি আমাদের সাথে, নগেন সরকার, অলিলেয়াজ, শচীন হোমু, খুসু দত্ত রায়, অজিত রায়, প্রতুল ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক নেতা এবং বিভিন্ন মহকুমার শত শত কর্মী আমাদের সাথে যোগ দেন। প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উল্কার বেগে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পার্টি ছিল নিষিদ্ধ তবুও পার্টির নামে না হলেও

কমিউনিস্ট হিসাবে কাজ করে সুযোগকে আমরা ব্যবহার করে পার্টি ও গণসংগঠন গঠনের কাজ চালাতে থাকি। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বিরোধি একটি প্লাটফরমে পরিণত করার কৌশল নিয়ে আমরা কংগ্রেসের ভেতরেও কাজ শুরু করি এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর কংগ্রেসের নেতৃত্ব আমরা গ্রহণ করতে পারি। মনি সিংহ, খোকা রায়, নগেন সরকার, ক্ষিতীশ সরকার, শচীন হোম ও আমি প্রাদেশিক কমিটির সভ্য এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হই। সংঘাত পূর্ণ ত্রিপুরি কংগ্রেসেও আমরা যোগ দিয়ে ছিলাম। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর শেরপুরে আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় সুভাষ বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের ভেতরে কাজ করার সাথে সাথে আমরা জমিদারী, মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন স্থানে, গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করে টংক, নানকার, ভাওয়ালী, মহাজনী প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার অবসানের জন্য কৃষক সভার শাখা গঠন করে আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলাম। (এই অঞ্চলের শোষিত, নির্যাতিত কৃষকেরা, নির্বিবাদে জমিদার মহাজনদের অত্যাচার, জুলুম মেনে নেয় নি—৩০ বছর ধরে বার বার বিদ্রোহ করেছে। মজনু শাহের নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, টিপু পাগলের নেতৃত্বে পাগল বিদ্রোহ, ক্ষত্রিয় দুবরাজ ও জানকু পাথরের নেতৃত্বে কৃষকদের গৌরবোজ্জ্বল, চমকপ্রদ, রক্তক্ষয়ী কৃষক বিদ্রোহগুলি তার প্রমাণ।)

আমাদের উদ্যোগে ১৯৩৮ সনে ময়মনসিংহ শহরের সন্নিকট কেওয়টখালি ময়দানে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কমরেড মুজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা এডভোকেট আবুল মনসুর আহমদ, সম্পাদক কমরেড ফয়েজউদ্দিন। কৃষক সম্মেলনের একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় জেলার প্রথম যুব সম্মেলন। বিপ্লবী নেত্রী কমলা মুখার্জি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ বক্তা, কৃষক শ্রমিক নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী। শেরপুর অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন, সংগঠন গড়ে তোলার কাজে কমরেড মুজাফফর আহমদ ও কমরেড ধরণী গোসাঁইয়ের প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। তারা দুজনেই পায়ে হেঁটে, শহরের সংলগ্ন শেখহাটি, ঢাকলহাটি, বয়ড়া, নৌহাটা প্রভৃতি গ্রামে আমাদের সাথে প্রচার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

এই সম্মেলনের ৩ মাস পরই কৃষক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে এবং বঙ্কিম মুখার্জি, অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতি নেতার

উপস্থিতিতে কুমিল্লায় সারা ভারত কৃষক সভার তৃতীয় অধিবেশন মুসলীম লীগের সক্রিয়ভাবে বাধা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য আমরাও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা জেলার বিভিন্ন মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন, সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। স্বল্পকালের নিরবচ্ছিন্ন কাজের ফলকে চমকপ্রদই বলা যায়। এই পটভূমিতে জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন কিশোরগঞ্জের রথ খোলার মাঠে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রেবতী বর্মন, সম্পাদক ছিলেন নগেন সরকার। জেলার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য সব রকমের হীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায় এবং ধর্মীয় ভিন্নগীর ও জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্রচারনা চালাতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত সুদূর গারো পাহাড় ও টাঙ্গাইল, জামালপুর, সদর, নেত্রকোণা মহকুমা-গুলি থেকে ২।৩ দিনের পথ পায়ে হেঁটে হিন্দু, মুসলমান আদিবাসী কৃষকদের বিরাট বিরাট মিছিলগুলির পথরোধ করতে রাস্তায় পবিত্র কোরাণের পাতা ছড়িয়ে রাখে। কিন্তু সম্মেলনের চূড়ান্ত সাফল্যকে তারা আটকে রাখতে পারে নি। ১৯৩৯ সনের কিশোরগঞ্জের কৃষক সম্মেলনের পরই সারা জেলায় মনি সিংহের নেতৃত্বে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

১৯৩৯ সনে সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমরা "না এক ভাই—না এক পাই" এই শ্লোগান নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললে আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রনাদেশ জারি করা হলেও আমরা গোপন অবস্থায় থেকে আন্দোলন নানা কায়দায় জোরে সোরে চালিয়ে যাই। শহরের সীমা অতিক্রম করা যাবে না, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাড়িতে থাকতে হবে প্রভৃতি নানা ধরণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে—ভোরে শেরপুর থেকে সাইকেলে ময়মনসিংহ পৌঁছে সভা করে যাতায়াতে ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে আসাছিল একটা দুঃসাধ্য কাজ। এই ধরণের দুঃসাধ্য কাজ করতে নেতা, কর্মীরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না। আজকের দিনে অবশ্য এই ধরনের নেতা ও কর্মীর সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

দেহ, মন সুস্থ রেখে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিয়েও একটি প্রয়োজনীয় কাজ। তাই আন্দামন থেকে ফিরে আসার আগে বাইরে এসে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রেম করে বিয়ে করার ঝুঁকি নিতে চাইনি।

কমরেড মুজাফফর আহমদও বিয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে সংগ্রাম করে টিকে থেকে লেখা পড়া শিখেছে এরকম একটি মেয়ের খবর একজন বন্ধুর কাছে পেয়ে তাকে বিয়ে করেছিলাম। বিক্রমপুরের নয়না গ্রামের জাতীয়তাবাদী ডাক্তার যোগেশ চন্দ্র মজুমদারের মেয়ে জ্যোৎস্নার মা, বাবা, ভাই, বোন সহ পরিবারের সবাই ভয়াবহ বসন্ত মহামারিতে মারা যায়। আক্রান্ত হয়েও সে ও তার শিশু বোনটি রক্ষা পায়। এই দুর্ঘটনার পর তার কাকা তাদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সরোজ নলিনী স্কুলে জ্যোৎস্নাকে ভর্ত্তি করে দেয়। বিয়ের খরচের সব টাকা মা জুগিয়েছিলেন। বিয়েতে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালে তখনকার দিনের কমিউনিষ্ট পার্টিসহ সব রাজনৈতিক দলের নেতা ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, কমরেড মুজাফফর আহমদ, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, শ্রমিক নেতা ইসমাইল, গোপাল আচার্য, আবদুল হালিম, সতীশ পাকরাশী, নিরঞ্জন সেন, সুনির্মল সেন সহ অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের পর ময়মনসিংহ জেলার পার্টির সব নেতারা, মনি সিংহ, খোকা রায়, আলতাব আলী, নগেন সরকার, শচীন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য, সুনির্মল সেন প্রমুখ পার্টি নেতা ও কর্মীরা আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ২ দিন ব্যাপী দিনরাত জেলা কমিটির ও কর্মী সভা করেন।

জ্যোৎস্না ছিল বুদ্ধিমতী, মানুষের মন জুগিয়ে চলার অসাধারণ ক্ষমতা। সে বুঝতে পেরেছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাশে না থাকলে আমার সাথে একাত্ম হওয়া যাবে না। ৬ বছর নিরাপত্তা আইনে বন্দী শিবিরে আটক থাকার পর মুক্তি পেয়ে আমার ছোট ভাই মনিও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে এসেছিল। রাজনৈতিক শিক্ষা লাভের ব্যাপারে জ্যোৎস্নাকে আমার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, আত্মীয়, সহপাঠি ও সহকর্মী জিতেন সেন ও মণি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বিয়ের কিছুদিন পর যুদ্ধের চাঁদা তুলতে লাট সাহেব ময়মনসিংহে আসার প্রাক্কালে মনি সিংহ সহ আমাদের সবাইকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ জেলে পাঠানো হয়। এই সময়ে সুভাষ বসু দেশত্যাগ করেন। কয়েক মাস জেলে থেকে ফিরে এসে দেখি জ্যোৎস্না সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৪২ সনে পার্টির জেলা কমিটির সংগঠক ও মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিতা হয়ে পার্টি কমিউনে থেকে কাজ করতে থাকে।

এই সময়ে সাফিউদ্দিন, খন্দকার মুজিবর রহমান, নাছিরউদ্দিন, সৈয়দ আলী, মফিজ মাস্টার, মাহমুদ আলী, নূর মহম্মদ, সৈয়দ আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ আব্দুস সোভাহান প্রভৃতি বেশ কয়েক বন্ধু পার্টির কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন তাছাড়া মুসলিম লীগ নেতা খান বাহাদুর ফজলুর রহমান, খান সাহেব আফসর আলী প্রভৃতি নেতারা ছিলেন অসম্প্রদায়িক, এই কারণে এই এলাকা কখনো সাম্প্রদায়িক অশান্তির শিকার হয়নি।

মুষ্টিমেয় হলেও জমিদারদের মধ্যেও কয়েক জন ছিলেন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ১৯৪৩ সনে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সময় ক্ষুধার জ্বালায় পথে ঘাটে মানুষের লাস পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। তখন আমরা বিরাট প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। খাদ্যের দাবীতে শেরপুর থেকে হাজার হাজার লোকের মিছিল জামালপুর এস ডি. ওর বাসা ঘেরাও করে, মজুদ উদ্ধার করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ, লঙ্গর খানা খুলে হাজার হাজার লোককে খাওয়ানো, শিশু, রুগ্নদের মধ্যে দুগ্ধ ও ঔষধ পথ্য বিতরণ, কলেরা মহামারীতে আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি মানব সেবামূলক কাজে জ্যোৎস্নার নেতৃত্বে শত শত মহিলা কর্মী এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের সেবার কাজ এখন খুব কমই চোখে পড়ে।

মধ্যযুগীয় বর্বর শোষণের প্রতীক ভাওয়ালী, নানকার প্রথার অবসান কল্পে আমাদের গড়া বিরাট আন্দোলন, সংগঠন ঐ প্রথাগুলির অবসান ঘটায়। জেলা ব্যাপী, ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা জেলার সর্বত্র আন্দোলন সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চালাতে থাকি। নালিতাবাড়ীতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন এবং ১৯৪৫ সনে নেত্রকোণায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করি।

১৯৪৬ সনে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রচণ্ড দমন নীতি চালানো হয়। সর্বেশ্বর ডালু রাসমনি শহীদ হন—শত শত নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়—আমরা আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকি। প্রচণ্ড দমন নীতি তুচ্ছ করে আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখার জন্য জ্যোৎস্না, কণা, পূর্ণিমা বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে কাজ চালিয়েছে—তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৪৭ সনে দেশ ভাগ হ'ল। রাজনৈতিক কর্মী, নেতা সহ অনেকেই

দেশত্যাগ করলেন। ১৯৪৮ সনে পাকিস্তানী জুম যখন প্রবল তখন টংক উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু হল। পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এই ধুয়া তুলে এই আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য প্রচণ্ড দমন নীতি চালানো হল। শত শত নেতা কর্মীদের হত্যা করা হল—গ্রেপ্তার করা হল কয়েক হাজার। লুট পাট, আগুন জ্বালিয়ে গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া, ধর্ষণ প্রভৃতি ধরনের অত্যাচারের জন্য হাজার হাজার কৃষক (বিশেষভাবে উপজাতীয়) তাদের ঘর বাড়ী জমিজমা ফেলে প্রাণের ভয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হল। আমাকে গুলি করে, জলধর পালের মাথায় লাঠি মেরে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তারের পর থানায় নিয়ে গেলে আমাদের উপর সারারাত অসহ্য শারীরিক নির্যাতন চালানোর ফলে ৯ মাস পঙ্গু অবস্থায় জেল হাসপাতালে থাকতে হয়। এই সময় সংগ্রামী এলাকা থেকে জ্যোৎস্না নিয়োগী ও হারু চক্রবর্তীকে এক সাথে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হ'ল। প্রায় ৬ বছর তাদের জেলে থাকতে হয়। ৬ বছর জেলে থাকার পর ১৯৫৩ সনে কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ আদেশ সহ আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সনে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনের প্রাক্কালে আবার আমাকে জেলে পাঠানো হয়। করেক মাস জেলে থাকার পর মুক্তি পাওয়ার পরই ৯২ (ক) ধারার আমলে আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়—আমাকে না পেয়ে পুলিশ বাড়ীর সব মালপত্র, গরু বাছুর নিয়ে যায়। জ্যোৎস্নাকে গ্রেপ্তার করে—৮ মাসের শিশুপুত্র সহ তাকে জেলে যেতে হয়। কিছুদিন পর আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী সভা গঠিত হলে পুলিশ ধর্মঘটের অজুহাতে আবার আমাকে জেলে পাঠায়। ১৯৫৬ সনে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের পর মুক্তিলাভ করি এবং দিন কয়েক পর চোরাচালানীদের দমন কল্পে "রুদ্ধদ্বার অভিযানের" সময় বেছে বেছে আমাদের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করলে তুমুল আন্দোলনের ফলে কয়েকদিন পরই মুক্তিলাভ করি—এখানে উল্লেখ্য এই ঘটনার কিছুদিন আগে চোরাচালানী খাদ্য আটক করার সময়ও কিছুদিনের জন্য হাজতবাস করতে হয়েছে।

১৯৫৮ সন—আইয়ুবী মার্শাল ল জারি হওয়ার সাথে সাথেই প্রথম দফায় বেছে বেছে মৌঃ ভাসানী সহ আমাদের মত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সন পর্যন্ত আটক থাকার পর কিছু নিয়ন্ত্রণ আদেশ সহ মুক্তিলাভ করি।

যুদ্ধ শুরু হলে আবার জেলে যেতে হয়। ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানের চাপে মুক্তিলাভ করি। শুরু হল ইয়াহিয়ার শাসন—এক পর্যায়ে চোরদের ধরে ধরে পুড়ানোর এক হিড়িক সৃষ্টি হলে আমরা প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে মতলববাজদের এই পাগলামী রোধ করার চেষ্টা করলেও চোর পুড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়ে ৭/৮ মাস থাকার পর মুক্তি পেলাম।

জীবনের এক খণ্ড

অধ্যক্ষ ডঃ শান্তি কুমার দাশগুপ্ত

প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা করেন এবং সেই কারণেই তাঁদের জীবনের কথা সাধারণ মানুষদের সামনে তুলে ধরতে চান। এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। ফাঁসীর মঞ্চে অনেকেই জীবনের জয়গান করে গেছেন। বঙ্গদেশে বাঘা যতীনের কার্যকলাপ, শ্রী অরবিন্দের প্রচেষ্টা, ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবীদের গোপন সাহায্য, চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান। স্বাধীন মেদিনীপুর এবং নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বকথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সব প্রচেষ্টার পাশে আমরা কতটুকু! তবু একথা জানি যে, সূর্যের কাজ কারও পক্ষেই করা সম্ভব না হলেও হাজার প্রদীপ কিছুটা আলোও তো দিতে পারে। এই হাজার হাজার প্রদীপে সর্বাপেক্ষা স্তিমিত হয়তো আমি। তবু আমার কথাটাও আপনারা শুনতে চেয়েছেন বলে আমি আনন্দিত।

আমরা ঢাকা জেলার বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর অন্তর্গত চূড়াইনের অধিবাসী ছিলাম। সেই ভিটে ছেড়ে আমার ঠাকুর্দা অটল চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং তাঁর দাদা সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত ফরিদপুর শহরে চলে আসেন। ঠাকুর্দা ছিলেন সামান্য হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। তাঁর দাদা ছিলেন লোন অফিসের সচিব। অবস্থা আমাদের বিশেষ ভালো ছিল বলা চলে না। সতীশ বাবুর দুই ছেলে সুরেশ দাশগুপ্ত এবং দীনেশ দাশগুপ্ত। আমার বাবা যোগেশ দাশগুপ্ত কলকাতায় থেকে ওকালতি করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য ছিলেন এবং কোন এক সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ সচিব ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটা রাজনীতির আবহাওয়া ছিল। কাকা দীনেশ দাশগুপ্ত রাজাবাজার বোমার মামলায় ধরা পড়েন শশাঙ্ক হাজরার সঙ্গে। দেশবন্ধু সেই মামলা চালিয়ে কাকাকে খালাস করেন। শুনেছি প্রায় সমকালে আমার জন্ম হয়েছিল। কাকার মুক্তিতেই বাড়ীতে শান্তি আসায় আমার নাম দেওয়া হয়েছে শান্তি। জেল না হলেও কাকাকে গ্রামে অন্তরীণ করা হয়।

ফরিদপুরের বাড়ীতে থাকতেন আমার এক ধর্মপ্রাণ জ্যাঠামশায়—বাবা-

কাকাদের পিসতুতো ভাই। আমার বাল্যকালে তিনিই হয়েছিলেন আমার জীবনের পরিচালক। যেটুকু সংবুদ্ধি আমার আছে তা তাঁরই দান।

৭/৮ বছরের একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। আমি তখন ঈশান স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ফরিদপুর জেলা-জেলের পাশ দিয়েই আমাকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হতো। একদিন কি মনে হলো, বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে জেল গেটের সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়েছিলাম আমরা। সে-সময় জেলে অনেক 'স্বদেশী' বন্দী ছিলেন—ছিলেন আমার জ্যাঠামশায় সুরেশ দাশগুপ্তও। বর্তমানকালের হিসেবে একে বোধ হয় বিক্ষোভ প্রদর্শন বলে। আমাদের সেদিনের সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত। এই বালখিল্যদের কেউ উৎসাহ দেয় নি, কেউ কিছু বলেও নি। সম্ভবত সে-কালের স্বদেশী-চেতনা সৃষ্ট আবহাওয়াই আমাদের মনে নাড়া দিয়েছিল। পরদিন প্রধান শিক্ষক মশায় ক্লাসে এসে জানতে চাইলেন কারা কারা এই কাজ করেছি। আমরা প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়িয়ে জানিয়েদিলাম যে, এ কাজ আমরাই করেছি। মনে কোন রকম ভয়-ভাবনা জাগে নি। সত্যকে স্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে শৃঙ্খলা রক্ষা করা বোধ হয় সেকালের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। প্রধান শিক্ষকমশায় আমাদের ক'জনকে ছুটির পরেও আধঘণ্টা ঘরে বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ আমরা খুশীতে ভরপুর হয়েই সময় কাটিয়েছিলাম। বোধ হয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেকালে সরকারের বিরাগ-ভাজন হতে চাইতেন না।

আরও বছর আষ্টেক পরে জীবনের যবনিকা উত্তোলন করি। তখন আমি হাওড়ায়—কাকা পুর সভার সেক্রেটারী। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম ১৯৩০ সালের মার্চের গোড়ার দিকে (৬ই মার্চ ?) পরীক্ষার ফল বের হতে তখন একালের মত বিলম্ব হত না।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। ডাণ্ডি মার্চ উত্তাল করে তুলেছিল সারা ভারতবর্ষকে। হাওড়াতেও ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লাগল। অধ্যাপক বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পুর-কমিশনার বিজয় কৃষ্ণ হাজরা এবং কাতিক চন্দ্র দত্তের (পরে পুরসভার চেয়ারম্যান হন ; নেতৃত্বে দুটো দল রওনা হয় শ্যামপুরের দিকে—প্রথম দলেই ছিলাম আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু। একটা রাত পথের এক আস্তানায় থেকে পরের দিন রাত্রে আমরা পৌঁছোলাম বিরাট দুটো তাঁবুর তলায়। ৬০/৭০ জন ছিলাম তাঁবু দুটোতে। পথে বিদ্যালয়ের

বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে ছোট-খাট জমিদাররাও বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এই পদ যাত্রীদের। বিপিন বিহারী বোসের 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সমবেত সকলের রক্তে নাড়া দিত। একালের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত যেন সেই উন্মাদনা সৃষ্টি করতে অক্ষম।

আশ্চর্য এই যে, আমাদের উপর কোন পুলিশি হামলা হয় নি। নুন তৈরী করে হাটে হাটে আমরা তা বিক্রি করেছি—থানার পাশ দিয়ে কতবার যাতায়াত করেছি কিন্তু কোন কিছু হয়নি। আমাদের তৈরীর পরিমাণ খুবই সামান্য ছিল বলেই হয়তো পুলিশ আমাদের গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু আমরা তো আইন অমান্য করেছিলাম।

এবার চলে আসতে হলো হাওড়ার শহরে। বিলাতি কাপড়ের দোকানে এবং মদের দোকানে পিকেটিং করতে হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে—বন্ধুদের সঙ্গে ভর্তি হয়ে যাই বঙ্গবাসী কলেজে আই এস সিতে।

হাওড়া হাটে বিলাতী কাপড়ের দোকনে পিকেটিং ক'রে ধরা পড়লাম আমরা। সে সময়ের হাওড়া পুরসভার চেয়ারম্যান জেলের ভেতরে যেতেন সকলের সঙ্গে দেখা করতে, হয়তো বা পরামর্শ করতেও।

বিচারে বিজয়দা, কার্তিকদা এবং বিপ্রদার জেল হল—আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। এই ছেড়ে দেওয়াটা আমাদের কাছে খুবই লজ্জার এবং বেদনার বলে মনে হয়েছিল। অবশ্যই বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে ৬ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলাম। এখানে সাধারণ মানুষের মনোভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পিকেটাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন—তাঁদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে সাধারণ মানুষরা পাঠিয়ে দিতেন সরবৎ ও মিষ্টি। দেশজুড়ে যেন প্রীতি-ভালবাসার বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

জেলে ঢুকেছিলাম ৯ই জুলাই ১৯৩০—বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কোন ছুটি নেই, তবু আমাকে নিতান্ত বালক বলেই হয়তো (১৫ বছর ৮ মাস - ৯ই জুলাই) নয় দিন ছুটি দিয়ে ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৩০ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১ রাত্রি ছিলাম প্রেসিডেন্সীতে। মাস তিনেক আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এবং বাকী সময়টা ছিলাম দমদমে একটা কাঁটা তারে ঘেরা জেলে—যেটা এখন হয়েছে এ্যামুনেশন ফ্যাক্টরী।

জেলে নবজীবন পেয়েছিলাম। দেখলাম সুভাষচন্দ্রকে, যতীন্দ্রমোহন সেন

গুপ্তকে, সতীশ দাশ গুপ্তকে, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, প্রভাত গাঙ্গুলী, বিপিন গাঙ্গুলী পূর্ণ দাস প্রভৃতি সেকালের নেতাদের। সুভাষচন্দ্রের স্পর্শ পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম কিছু কিছু নেতার বিপ্লবী জীবনের কাহিনী। সুভাষচন্দ্রের অনশনকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের সৃষ্টি হয় তাতে কার্তিকদার নেতৃত্বে সেই বালক বয়সেই লাঠিধারী জেল ওয়ার্ডারদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাদের। শেষ পর্যন্ত সে কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে নেয় সব। ·

জেলেই আমার নবজীবনের প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হয়। শুধু কংগ্রেসী আন্দোলন নয়—বিপ্লবী জীবনের প্রতি মনে প্রাণে একটা আকর্ষণ অনুভবও করলাম। দমদমের স্পেশাল জেলে থাকাকালীন বগুড়ার যতীনদা (যতীন রায়) সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন 'দাদা'দের কথা শুনে রাজনীতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপের পূর্বে বিচার করে দেখো—বাবাকেও জিজ্ঞাসা করো, মনে রেখো তোমার বাবাও একসময় 'দাদা' ছিলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে বঙ্গবাসী কলেজে। এই সুযোগে সে যুগের একজন অধ্যক্ষকে সামনে এসে দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আমাদের সময়কার অধ্যক্ষ গিরিশ বসু—আমি জেলে থাকায় ৬ মাস অনুপস্থিত ছিলাম কলেজে। কয়েকটি জেলে গিয়ে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমাকে আমি ডিস কলেজিয়েট করবো না—নন-কলেজিয়েট করবো—তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আর যে ৬ মাসের মাইনে বাকী পড়েছে তা দিয়োদিয়ো তিন ক্ষেপে। আজকের দিনে কজন অধ্যক্ষ এমন সহানুভূতিশীল! আর দেখেছিলাম সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়কে—তিনি কলেজে উপস্থিত থাকলে সামান্য শব্দ মাত্রও শোনা যেতো না সেই সহ-শিক্ষার কলেজেও। সেটা এমনি শৃঙ্খলার দিনই ছিল।

আমাদের বাড়ীতে বহুদিন ছিলেন বাবার এক বন্ধুর ভাই—বিনোদ বিহারী গুপ্ত। উনি ছিলেন বিপ্লবীদলের লোক। বিনা বেতনে আমাকে এবং বন্ধুদের তিনি কেমিস্ট্রি পড়াতেন। অপূর্ব ছিল তাঁর পঠন পাঠন! সেই সঙ্গে ফিজিক্স ও অংক পড়াতেন ডঃ অনন্ত কুমার সেন (পরে কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন)। এই দু'জন আমাদের বিপ্লবী চেতনার পথে নিয়ে যান। আমি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম: বন্ধু নন্দদুলাল মুখার্জী হয়েছিলেন আমার পোষ্ট অফিস। আমার গোপন নাম হয়েছিল রমেন মজুমদার।

বিনোদ কাকা ধরা পড়লেন। আমাকে কয়েকজন বন্ধু সহ ধরে নিয়ে

যাওয়া হলো লর্ড সিংহ রোডে। সেখানে হলো কয়েক ঘণ্টা ধরে জেরার পর জেরা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এই জেরার ভয়ে দিশাহারা। সেটা সম্ভবত ১৯৩৩ সাল। পুলিশের লোক তখন আমাদের নিত্য সঙ্গী। পাবনার এক প্রত্যন্ত গ্রাম গুবগাছা—সেখানে গিয়েছিলাম আমি আর বন্ধু বিশ্বনাথ দত্ত সাইকেলে চড়ে। সেখানে পৌছনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে হাজির পুলিশ।

এরপর জড়াবার চেষ্টা হয়েছে নানা মামলায়। হাওড়ার বাড়ী থেকে গভীর রাত্রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ এক ডাকাতির মামলায় জড়াবার চেষ্টায়। প্রায় তিন মাস পুলিশ সে মামলা চালায়। কিন্তু বরদা প্রসন্ন আইনে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন সাজানো সাক্ষীদের। লেবং-এ লাট সাহেবকে মারার চেষ্টার সঙ্গে, হিলির ট্রেন ডাকাতির সঙ্গেও আমাকে জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। অনেকগুলো মামলায় আমাকে জড়াবার চেষ্টা করে পুলিশ ব্যর্থ হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্তত একটি মামলায় পুলিশ আমাকে সঠিক ভাবেই ধরেছিল। সম্ভবত সেকালের সাধারণ মানুষের স্বদেশী চেতনাই পুলিশের সমস্ত চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ব্যর্থ পুলিশ যে খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিল সেটা বেশ বোঝা যায় তাদের নির্দেশের বহর দেখে। বছর দু'য়েক আমার ওপর নির্দেশ ছিল সপ্তাহে একদিন করে থানায় হাজিরা দিতে হবে। প্রায় বছর দুয়েক আমাকে প্রতিদিন থানায় হাজিরা দিতে হতো।

হাওড়ায় টেনিশ বল দিয়ে ফুটবল খেলার খুবই রেওয়াজ ছিল। আমি ছিলাম একজন দক্ষ গোল রক্ষক—ব্যাক ছিল নন্দ। পুলিশের আদেশ হলো নন্দ বিশ্বনাথ এবং ভোলানাথের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারব না। ব্যাকের সঙ্গে গোলরক্ষক কথা বলতে পারবে না—এমন হাস্যকর আদেশ ইংরেজের পুলিশই দিতে পারতো। একমাত্র কলেজে যাওয়ার আদেশটাই ছিল—সন্ধ্যে সাতটার পর বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছিল আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও রাত্রি প্রায় নটার সময় একদিন পুলিশ আমায় ধরলো হাওড়ায় ট্রামের মধ্যে। জেল হলো তিন মাসের জন্যে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। তখন সুপারের সামনে টুপি না পরার আন্দোলন চলছে। আমিও আন্দোলনে সামিল হলাম। সারারাত্রি হ্যান্ড কাপ হলো শাস্তি। পরদিন শাস্তি বেড়ে হলো ডান্ডাবেড়ির আদেশ। অবশ্যই সেই শাস্তি নেবার জন্যে জেলে থাকা হয়নি। হাইকোর্ট ৫০ টাকা জরিমানা করে

আমাকে খালাস করে দেয়। জেলখানার বাইরে এসেই দেখলাম ইনটেলিজেন্স বিভাগের লোককে। তিনি আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বাড়ী যেতে গিয়ে যদি আমি হারিয়ে যাই এটাই বোধ হয় ছিল তাঁর আশঙ্খা।

কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে যোগ হলো ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের গড়া লেবার পার্টির সঙ্গে তখন আমার বিশেষ যোগ। হাওড়ার, উত্তর চব্বিশ পরগণার জুট মিলের বস্তিতে বস্তিতে তখন আমার আনাগোনা। বস্তিতে রাতও কাটিয়েছি কখনো কখনো। হাওড়া স্টেশনে মালবাহকেরাও ছিল এই ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। নীহারেন্দু ছাড়াও নেতৃত্বে ছিল কালী মুখার্জী (ছোট কালী—প্রয়াত)। আমার কাকা নরেশ দাশগুপ্ত (বর্তমানে হাওড়ার সি পি এম সম্পাদক) আমি এবং আমার ভাই সুশীল দাশগুপ্ত। আমাদের হাওড়ার ভাড়াটে বাড়ীতেও (৪৫ নং ধর্মতলা লেন, শিবপুর) একটা রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল এ কথা সর্বজন বিদিত।

রাজনীতির সঙ্গে ১৯৪২ সাল নাগাদ অর্থ রোজগারের জন্যে ঠিকাদারী কাজ হাতে নিয়েছিলাম। বেশ অর্থ আসছিল হাতে। আমার মাসীমা মীরা দত্তগুপ্ত (যিনি পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মহিলা শাখার অধ্যক্ষা হয়েছিলেন) তখন নীহারেন্দুর সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত। নীহারেন্দুবাবু তখন আত্মগোপন করে আছেন। আমি এলাম এখানে কাজের দায়িত্ব নিয়ে। শিয়ালদা বাজারের ভিতরে একটা তিনতলা বাড়ীর ঘরে আমাদের মাঝে মাঝে কার্যধারা আলোচনার সভা বসতো। উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু স্থানে তখন আমার পরিচয় রমেন মজুমদার নামে। সেখান থেকেও লোক আসত আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার পোস্ট অফিস নন্দের মাধ্যমে।

বোমা বানাবার কিছু সরঞ্জাম ছিল বাড়ীতে। তার পরীক্ষা করেছি বেশী রাতে ব্যারকাপুর যাত্রী ট্রেনে বসে। সেই মিলিটারীর যুগে রাত্রে ট্রেনের যাত্রী থাকতো খুবই কম। পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসুবিধা ছিল না। মিলিটারী ধ্বংসের জন্যে অন্য চিন্তাও করতাম। পটাসিয়াম সায়নাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের যোগে গ্যাস তৈরী করে মিলিটারীদের মোকাবিলা করা সহজ মনে হয়েছিল। প্রচুর পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করেছিলাম কিন্তু আমি একটু বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠায় সেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেয় অন্য এক সহযোগী বন্ধু। তারপর তারও আর কোন সন্ধান পাই নি।

কেবল কলকাতাতেই নয়—কার্যকলাপ আরও একটু ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হলো। একসঙ্গে কয়েকটি জায়গায় কিছু করা যায় কিনা এটাই ছিল তখন বিবেচ্য।

গোপন সংবাদ পেয়ে গেলাম টালিগঞ্জে রিজেন্ট পার্কে এইচ এল সরকারের বাড়ীতে। তাঁরই শ্যালক এবং সুভাষচন্দ্রের দাদা সতীশ বসু মশায়ের শ্যালক গোপাল মিত্র থাকতেন সেই বাড়ীতে। সেখানে উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছেন আনসার হারবালী। তাঁদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলাম রমেন মজুমদার নামেই।

বিপ্লবীর সব সময়ে সচেতন থাকতে হয়। ক্ষণকালের জন্য ভুলে গিয়ে ছিলাম সেকথাটা। এইচ, এল, সরকারের বাড়ীর পাশেই দেখলাম আমার এক সমবয়সী সম্পর্কিত মামার বাড়ী। বহুদিন দেখা নেই, তাই দেখা করার লোভ সামলাতে না পেরে ঢুকে পড়লাম বাড়ীর ভেতরে। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে এসে গেলেন গোপাল মিত্র। বুঝলাম, সর্বনাশ হলো। গোপাল বাবুর কাছে পরিচয় আর গোপন থাকবে না ঃ রমেন মজুমদার যে শান্তি দাশগুপ্ত তা তিনি জেনে নেবেন। গোপালবাবু ধরা পড়লে আমিও ধরা পড়বো এরূপ সন্দেহই হলো। আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে সামান্য টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা হচ্ছিল রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র। বেশ চিন্তিত ভাবেই বাড়ী ফিরলাম।

বড়ো বড়ো হরফে লাল কালিতে ছাপা সাইক্লোস্টাইল করা একটা চার পাতার কাগজ মাঝে মাঝে বের করা হতো। সেই কাগজ নিয়ে আমিও গেছি ফরিদপুরে —বিলি করেছি গোপনে।

বেশী দিন অপেক্ষা করতে হলো না। গোপাল মিত্র ধরা পড়লেন। পরের দিনই হাওড়ার ৪৫ নং ধর্মতলা লেনের লাল বাড়ী ঘিরে ফেলল লাল পাগড়ী। কিন্তু অনেক পুলিশই ছিল মনে মনে আমাদের কাজের সমর্থক। বাইরের শোবার ঘর থেকে আমি যখন আমার বড়ো সুটকেশটা সরিয়ে নিয়ে যাই যখন তারা চুপ করেই ছিল। বাবার বিশেষ সম্মান থাকায় আই বি অফিসারের পক্ষে সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি ; তাই আমার জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলাও খুবই সহজ হয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী বিশ্বনাথ দত্তও রেহাই পায় নি। অবশ্য জেলে তাকে বছর খানেক থাকতে হয়েছিল। আমার সঙ্গে তাকে প্রায় তিন বছর থাকতে হয় নি।

আমাদের মামলাকে একটা আন্তঃ রাজ্য রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছিল। ১৭ জনকে নিয়ে মাস তিনেক টানাটানি করা হয়। উত্তর প্রদেশের অফিসার হারবানী, পঞ্জাবের প্রবোধচন্দ্র (পরে বিধান সভার স্পিকার এবং শিক্ষামন্ত্রী হন), বিলাসপুর থেকে একজন বাঙালী যুবক, চায়না মিশনের ডাঃ দেবেশ মুখার্জী, আর-সি-পি-আই, আর এস-পি-আই , ফরওয়ার্ড ব্লক এবং নীহারেন্দুর সঙ্গীরা হয়েছিলেন এই মামলার আসামী।

অফিসার একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের কার্ডে লেখা আছে যে, আমাদের ধরা হয়েছে এই অভিযোগে যে, আমরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম। এ অভিযোগ নিশ্চিতরূপেই হাস্যাস্পদ। তবে একটা সংঘর্ষের চেষ্টা করা হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জেল থেকে বের হই ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি (২৫শে)। নীহারেন্দু বাবুর বাড়ীতে আমাদের ৫।৬ জনের সভা বসেছে। খবর এল যে, ঝিকরগাছাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য এবং অফিসারদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। অবশ্যই পাহারার ব্যবস্থা কিছু নেই। তাঁরা নেতাজীর দাদার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। আমরা ৪।৫ জন গেলাম তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। নেতাজীর চরিত্রের প্রভাব তাঁদের চিত্তে যে উম্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তা দেখে এলাম। তাঁদের কথা লিখেছিলাম আনন্দবাজারে এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে। দুটো কাগজের প্রথম পাতাতেই বেরিয়েছিল আমাদের সেই লেখা।

চরিত্রই চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে। আজ সেই চরিত্রের অভাব ঘটেছে। তাই হতাশা দেখা দিয়েছে সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য আমি—আমি আশাবাদী, আশার ভিত আমার দৃঢ় কিন্তু সেখানে বার বার পড়ছে আঘাত। বীরের আসন আজ শূন্য হলেও তা নিশ্চিত পূর্ণ হবে এই বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই।

অগ্নিযুগের এক সৈনিকের জীবন স্মৃতি

শ্রী নৃপেন্দ্র মৈত্র

১৯১৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমার ঠাকুরদা স্বর্গীয় বসন্তকুমার মৈত্র অধুনা বাংলা দেশ অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার মেঘনা থেকে বহরমপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি বহরমপুরে নীলকুঠির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর চার পুত্র, তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মৈত্র আমার পিতা। মাতা স্বর্গীয় শৈলবালা দেবী। আমার বাল্যশিক্ষা গোরা বাজারের I. C. Institution এ শুরু। সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে ১৯২৯ সালে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হই। আমার এগার বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়ি এবং কিছু সহযোগী স্বর্গীয় তারাপদ গুপ্ত, স্বর্গীয় রাধাপদ দুবে, স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র দুবে, স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার গুপ্ত, স্বর্গীয় সবিতা শেখর রায় চৌধুরী, তারাভূষণ রায়, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখের সহায়তায় "বিহারীলাল মেমোরিয়াল ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করি।

১৯২৫ সাল। দুশ বছরের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার বাসনা বাংলার প্রত্যেক জেলাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সেই অত্যুগ্র বাসনার ঢেউ বহরমপুরের কিছু কিশোরের মনেও ঝড় তুলেছিল। বিহারীলাল মেমোরিয়াল ক্লাব এবং কিছু ব্যায়ামাগারের সদস্যদের তরুন রক্তে চাঞ্চল্য জাগাবার মধ্য দিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হই। সেই সময় প্রখ্যাত বিপ্লবী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে বহরমপুর শহরে গড়ে ওঠে একটি গোপন বিপ্লবী সংগঠন। গোরাবাজারে তখন সি, আই, ডি ডিপার্টমেন্টের একজন বড়কর্তা থাকতেন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বিপ্লবীদের জীবনী ও কর্ম কাহিনী সম্বলিত বহু নিষিদ্ধ বই ছিল। একদিন রাত্রে ঐ অবসর প্রাপ্ত অফিসারের অজান্তে বইগুলি আমরা আমাদের ক্লাবের জন্য হস্তগত করি। ক্লাবের সদস্যদের ঐ নিষিদ্ধ বইগুলোর মাধ্যমে গোপন বিপ্লবের মন্ত্র দীক্ষিত করার কাজে নিযুক্ত হই। এভাবেই ধীরে ধীরে বহরমপুর তথা গোরাবাজারে

গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। শাসক গোষ্ঠীও নীরব ছিল না। প্রায়শই আমার বাড়ী এবং আমাদের প্রিয় ক্লাব ঘর সার্চ হতে থাকে।

ইতিমধ্যে বাংলার কিছু বিক্ষুব্ধ বিপ্লবী একটা প্রত্যক্ষ বিপ্লব অনুষ্ঠান করার কথা ভাবতে থাকে। ১৯২৯ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত বিপ্লবীদের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে বিক্ষুব্ধ বিপ্লবী প্রতিনিধি নিরঞ্জন সেন গুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী অম্বিকা চক্রবর্তী, যতীন দাস, বিজয় রায় প্রমুখ গোপনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন চট্টগ্রাম, বরিশাল ও ময়মনসিং এর সরকারী অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করার। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি লাল ইস্তেহার প্রচার করা হয় যুবকদের এই পরিকল্পনায় আহ্বান জানিয়ে।

সশস্ত্র আক্রমণের জন্য যে অস্ত্রের প্রয়োজন তা কেনার জন্য আমি এবং আমার সহকর্মীরা বাড়ী থেকে মূল্যবান গয়না চুরি করে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। অকস্মাৎ ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় মেছুয়া-বাজার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের আস্তানায় পুলিশ হানা দিয়ে লাল ইস্তেহার, বোমা, রিভলবার সহ সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শুধাংশু সেনগুপ্ত, পান্নালাল দাশগুপ্ত, তারাপদ গুপ্ত এবং আমাকে গ্রেপ্তার করে একটি মামলা দায়ের করে, যা মেছুয়াবাজার বোমার মামলা নামে পরিচিত। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় ৫।৬ দিন আটকে রেখে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে, পরে আই, বি, হেড অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। সেখানেও কিছু অত্যাচারের পর প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল জেলে ১০ নং সেল ওয়ার্ডে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে আটকে রাখে। তৎকালীন চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্স বার্গের কোর্টে আমাদের মামলা শুরু হয়, কিছুদিন পরে এই মামলা সেসন কোর্টে স্থানান্তরিত হয়। চিফ্ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে আমি মুক্তি পেলেও সেসন কোর্ট উল্লেখ্য বন্দীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

১৯৩০ সাল ১৮ এপ্রিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর দিনই আমার ও আমার কিছু সহকর্মীর বাড়ী পুলিশ ঘেরাও করে। ঐ সময় আমি বাড়ীতে ছিলাম না। সি, আই, বি ইনস্পেক্টর মোহিনী মোহন সান্যাল আমাকে অন্য একটি বাড়ী থেকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে আমি তাদের বাধা দিয়ে আমার নিজের বাড়ীতে চলে আসি। ইনস্পেক্টর আমাদের ঘরে ঢুকলে আমি দরজা বন্ধ করে তাঁকে আটকে রাখি। ইতিমধ্যে দেহরক্ষীরা থানায় খবর দিলে পুলিশের বড়কর্তা

প্রচুর সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে আমাদের বাড়ী এসে আমাকে গ্রেপ্তার করে। সন্ধ্যাবেলা বহরমপুর থানা থেকে আমার হাতে হাতকড়ি ও মাজায় দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে বহরমপুর জেলে নিয়ে যায় ও ফাঁসির আসামীদের একটি সেলে আটকে রাখে। পাশাপাশি আর দুটি পাগলবন্দী আগে থেকেই ছিল, তাদের চিৎকারে সারারাত চোখের পাতা বন্ধ করতে পারিনি। জেলরকে অভিযোগ করায় কিছুদিন পর আমাকে অন্য বিচারাধীন বন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়। বহরমপুর জেলে পাঁচমাস থাকার পর আমাকে জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে একটি পরিত্যক্ত সেলে (যার পরিধি ছয় বাই চার হাত) আটকে রাখে। এই সেলটির ভেতর দিকে ছিল আলকাতরার আস্তরণ। প্রচণ্ড গরমে আলকাতরা গলে গলে পড়ে আমার বিছানাপত্র নষ্ট হয়ে যেত। গ্রীষ্মকালে এই সেলটি মনুষ্য বাসের অযোগ্য হয়ে উঠত। এখানে ছ'মাস বন্দী জীবন কাটাবার পর আমর শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়ে। কর্তৃপক্ষের কাছে, আমাকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের জন্য আবেদন জানাই, তাতে কোন ফল না হওয়ায় আমি আমরণ অনশন শুরু করি। দু'সপ্তাহ পর আমার শরীরের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতে বদলির অর্ডার বার করে আমাকে দেখালে আমি ১৯ দিনের মাথায় অনশন ভঙ্গ করি। এক সপ্তাহ পরে আমাকে সিউরি জেলে পাঠানো হয়। সেখানে আরো রাজবন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তী অসুস্থ অবস্থায় এই জেলের একটি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর ওয়ার্ডে কাউকে যেতে দেওয়া হত না। আমি লুকিয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। কিছুদিন পর আমাকে বক্সা বন্দী শিবিরে বদলি করে। বক্সা যাওয়ার পথে ট্রেনে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বক্সা স্টেশন থেকে শিবির বহুদূর। যান বলতে ছোট ছোট ঘোড়া। আমাকে ঘোড়ায় চাপানো হয় কিন্তু আমার অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমার সঙ্গী সিপাহিরা আমাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে প্রায় কাঁধে করে দুর্গম পথ অতিক্রম করে রাত্রি প্রথম প্রহরে বন্দী শিবিরে পৌঁছয়। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকেই বহু বিপ্লবী বন্দী এখানে ছিলেন। তাঁদের সান্নিধ্যে দিনগুলো ভালই কাটছিল। এই শিবিরে বন্দীরা খেলা ধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতেন। আমি গান-বাজনার অনুরাগী। নিজেও একটু আধটু গাইতে পারি। বন্দী শিবিরে ভাল গাইয়ে হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলাম। বক্সা শিবিরে

বন্দীদের প্রভূত প্রাচুর্যের মধ্যে রাখা হয়েছিল যাতে তারা পরবর্তীকালে শ্রমবিমুখ হয়ে ওঠে। বকসা শিবিরে বন্দীদের সঙ্গে প্রহরীদের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আমি সংকট জনক ভাবে আহত হই, পরদিনই আমাকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। চিকিৎসান্তে খড়্গপুর হিজলি বন্দী নিবাসে স্থানান্তরিত হই, সেখানে আমার পূর্বতন সহকর্মী যতীন্দ্রমোহন সিংহ, সবিতাশেখর রায় চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই বন্দী শিবিরটি একটি বিরাট পরিত্যক্ত অট্টালিকা, চারিদিক কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বন্দীদের নজরে রাখার জন্য মাঝে মাঝে ছোট ছোট নিরীক্ষণ টাওয়ার। এই বন্দী শিবিরের দোতলায় তের নম্বর ঘরে আমি আমার গোরাবাজারের সহকর্মীদের সঙ্গে ছিলাম। এই ঘরটি "গোরাবাজার বন্দী নিবাস" নামে পরিচিত ছিল। এই বন্দী শিবিরে যতীনদার স্নেহ-ভালোবাসার ছত্র-ছায়ায় আমাদের দিনগুলো কেটেছে। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের আড্ডা বসত ১৩নং ঘরে। যতীনদা ছিলেন আড্ডার মধ্যমণি। বিনা বিচারে বন্দী থাকার যন্ত্রনা থেকে মুক্তির জন্য হিজলী ক্যাম্পের মাঠে খেলাধুলা, প্যারেড, ব্যায়াম ইত্যাদি আরম্ভ করি। কথায় বলে সুখ ক্ষণস্থায়ী। বিনা কারণে বন্দীদের প্রতি বৃটিশ শাসকের নগ্ন আক্রমন শুরু হল যা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় "হিজলী ফায়ারিং"।

বন্দীশালার রক্ষীবাহিনীর আর্মস্ ইন্সপেক্টর ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। বন্দীদের খেলাধুলা, প্যারেড তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। এ বিষয়ে বন্দীদের বহুবার নিষেধ করেছেন এবং শাসিয়েছেন। বন্দীরা তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও খেলাধুলা করতেন।

এই অবস্থায় পুনরায় ইন্স্পেক্টর একদিন বন্দীদের অশালীনভাবে শাসাচ্ছিলেন। বন্দীরা তাঁকে অপমান করে ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনি হিজলী ক্যাম্পের কমাণ্ডেণ্ট ই, বি, বেকারের কাছে এ সম্বন্ধে অভিযোগ করায় তিনি তাঁকে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকতে নিষেধ করেন। ফলে ইন্স্পেক্টর অপমানিত বোধ করেন এবং বন্দীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন ও সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। বন্দী নিবাসের মেন বিল্ডিং থেকে দূরে কতকগুলি অস্থায়ী সেল ছিল যা বন্দীদের শাস্তি দেবার জন্য ব্যবহার হত। বন্দীদের মধ্যে কিছু অত্যুৎসাহী যুবক ঐ সেলে মধ্যে মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিত, ফলে গভীর রাত্রে হঠাৎ এলার্ম বেজে উঠলে রক্ষীবাহিনীদের সবাইকেই

যেখানে যে অবস্থায় থাকুক ছুটে এসে ঐ আগুন নেভাতে হত। এই কারণেও রক্ষীবাহিনীর ভিতর অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ফলে ক্যাম্পের গেট দিয়ে যাতায়াতের সময় বন্দীদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর প্রায়ই বচসা ও গন্ডগোল হতে থাকে। পূর্বে বন্দীদের রাত্রে চলাফেরায় কোন বাধা নিষেধ ছিল না। পরে এই এই গন্ডগোলের দরুণ বন্দীদের রাত্রি ৮টার পর মেন বিল্ডিং-এর বাইরে বেরোনোর নিষেধ আজ্ঞা জারি হয়। বিল্ডিং-এর একতলাটি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। বাইরে বেরনোর ৪টি গেট ছিল। গন্ডগোলের পর থেকে রাত্রি ৮টার পর গেটগুলো বন্ধ করে দিত যাতে বন্দীরা বাইরে না আসতে পারে। এদিকে আর্মস্ ইন্স্পেক্টর সিপাইদের অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে তাদের উত্তেজিত করতে থাকে এবং বন্দীদের শিক্ষা দেবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে।

অবশেষে ১৯৩১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর সেই স্মরণীয় দিন এলো যা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল লেখা থাকবে।

ঘটনার দিনও বন্দীরা যথারীতি প্যারেড করেছেন। সন্ধ্যার দিকে বন্দীরা ক্যাম্পের মাঠে বেড়াতেন। সেদিনও তাঁরা যথারীতি বেড়াচ্ছিলেন। স্বর্গীয় তারাপদ গুপ্ত এবং আশুতোষ হাজরা মাঠে বেড়াতে বেড়াতে সেন্ট্রি বক্সের কাছাকাছি যেতেই সেন্ট্রি চিৎকার করে উঠলো—"ইধার মাৎ আনা"—এবং এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশী বাজিয়ে দিল ও পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। বন্দী শিবিরে বাইরে যাবার দুটি গেট ছিল। সেই গেটের দরজাও খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ও সঙ্গীনধারী সিপাইরা ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকেই সিপাইরা মেন বিল্ডিংটির চতুর্দিক বন্দুক উঁচিয়ে ঘিরে ফেলল। আর্মস্ ইন্স্পেক্টর আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গুলি চালাবার হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের ঘর লক্ষ্য করে সিপাইরা অজস্র ধারায় গুলি চালাতে লাগল। শিলা বৃষ্টির মতো দরজা জানালা ভেদ করে গুলি ঘরের দেওয়ালে আঘাত করতে লাগল। আমি জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলাম। গাগলা ঘন্টি শুনে আমরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যাই। গাগলা ঘন্টি ও গোলমাল শুনে আমি ধীরে ধীরে আমাদের ঘরের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই। সেই সময় তারকেশ্বর সেন কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখতে পাই নি। ইতিমধ্যে এলোপাথারি গুলি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তারকেশ্বর সেন হঠাৎ গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমি হাত দিয়ে তাঁর নাক, কান স্পর্শ করে দেখলাম

বেগুলি তাঁর নাকের ভেতর দিয়ে মাথা ভেদ করে গেছে এবং নাক, কান ও মুখ দিয়ে তাজা রক্ত অঝোরে ঝরে পড়ছে। এই আকস্মিক অবস্থায় আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। হঠাৎ আমার কানে আসে যে তারাদা গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। এই কথাটা শোনা মাত্রই আমার ধারণা হয় যে আমার প্রিয় সহকর্মী তারাভূষণ রায় গুলি বিদ্ধ হয়েছেন। অকস্মাৎ কেন জানি না আমি আমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি এবং "তারা রায় মরেছে—তারা রায় মরেছে" চিৎকার করতে করতে একটি লোহার রড হাতে নিয়ে প্রতিশোধ বাসনায় পাগলের মতন ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নিচে নামতে থাকি। আমাদের যতীনদা আমাকে ঐ অবস্থায় ছুটে নামতে দেখে জোর করে চেপে ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে আসেন অজ্ঞান অবস্থায়। এইভাবে তিনি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন। আমার অজ্ঞান অবস্থায় মারমুখী নৃশংস সিপাইরা উপরে উঠে আসে। ১৩নং ঘরটি সামনে থাকায় তারা প্রথমেই আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে সবিতা শেখর রায় চৌধুরী ও আশু হাজরা তখন খাটে শায়িত তারকেশ্বর সেনের পরিচর্যায় রত ছিল। সিপাইরা বেয়োনেট উঠিয়ে ঘরে হুই হুই করে ঢুকতেই সবিতা প্রতিরোধকল্পে যে ঘটি দিয়ে তারকের মাথায় জল ঢালছিল তা ছুঁড়ে সিপাইদের আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি ছুটে এসে তার হাতের পাঞ্জার মাংস পেশিতে লাগে। উন্মত্ত সিপাইরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথায় সঙ্গিনের আঘাত হেনে মারাত্মক ভাবে জখম করে এবং চতুর্দিক থেকে লাঠির আঘাতে তার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এদিকে আমাদের ক্যাম্পে শ্রদ্ধেয় বন্দী শ্রী সন্তোষকুমার মিত্র তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্য ক্যাম্পের হাসপাতালে ছিলেন। তিনি হঠাৎ এই পাগলা ঘণ্টি ও গুলির আওয়াজ শুনে হাসপাতালের বেড ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটি রড হাতে করে বারান্দা দিয়ে আমাদের ঘরের নিচের তলায় এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ও মারা গেলেন। সিপাইদের হিংসা-বৃত্তি এতেও প্রশমিত হল না। তারা সন্তোষ মিত্রের মৃতদেহের উপর সঙ্গীনের খোঁচা এবং বন্দুকের কুঁদো দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করতে লাগল। এরপর মৃতদেহ সরিয়ে নেবার জন্য পা ধরে টানাটানি করতে থাকে। অন্যদিকে বন্দীরা সন্তোষ মিত্রের হাত ধরে বাধা দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন তাদের না মেরে শবদেহ নিয়ে যেতে দেবেন না। সিপাইরা বন্দীদের নির্মমভাবে প্রহার করে মৃতদেহ ফেলে রেখে উপর তলার আর সব বন্দীদের আক্রমণ করে, তখনও

উপর তলার ঘরগুলি লক্ষ্য করে অজস্রধারায় গুলি বর্ষণ চলতে থাকে। আমার জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখি ১৩ নং ঘরের মধ্যে বন্দুকধারী সিপাই পরিবেষ্টিত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন হিজলী ক্যাম্পের কমানডেন্ট ই, বি, বেকার। তাঁর সামনে তারকেশ্বরের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও সবিতা শেখরের মৃত্যু পথযাত্রী সংজ্ঞাহীন দেহ। ঘটনার গভীরতা চিন্তা করে বেকার সাহেব সিপাই সহ তৎক্ষণাৎ ফিরে যান। কিছুক্ষণ পরেই আরোকিছু বেশী সিপাই ও খড়্গপুর হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেন্ট, ডাক্তার সরকার সহ ঘরে উপস্থিত হলেন ও আহতদের ডাক্তার সরকারকে দেখতে বললেন। আহতদের পরীক্ষা করে ডাক্তার এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি সর্ব্ব সমক্ষে বেকারকে সম্বোধন করে বললেন: "তুমি যা করেছ আমাকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হলে আমি তোমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেব। আমি এই আহতদের দায়িত্ব নিতে পারব না যদি না এই আহতদের সমস্ত আইন শৃঙ্খলার বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমার হাতে তুলে দাও এবং এই একটি মাত্র শর্তেই আমার পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব।"

বেকার নিরুপায় হয়ে সমস্ত দায় দায়িত্ব ডাক্তারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। ডাক্তারবাবুও তৎক্ষণাৎ এ্যাম্বুলেন্স ডাকিয়ে আহতদের খড়্গপুর সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এরপর ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় মিঃ বেকার মৃতদেহ দুটি সরকারের হাতে তুলে দিতে রাজবন্দীদের অনুরোধ করেন। রাজবন্দীরা প্রত্যুত্তরে জানান যে মৃতদেহের আত্মীয় স্বজন ছাড়া কারো হাতে এই মৃতদেহ দেবেন না। বারবার দেহ দুটি নেবার চেষ্টা করেও তা সরিয়ে নিতে অপারগ হন।

১৭ ই সেপ্টেম্বর খবরের কাগজে এই নারকীয় ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত,ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল রায় চৌধুরী প্রভৃতি আরো কিছু কর্মীসহ খড়্গপুরে উপস্থিত হন ও হাসপাতালে আহত বন্দীদের কাছ থেকে দুর্ভাগ্য জনক ঘটনার খোঁজ খবর নিতে থাকেন। অবশেষে মৃতদেহ নিয়ে দুটি বিনিদ্র রজনী কাটাবার পর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বন্দীরা গ্রহণ করেন এবং সেই মত সমর্পন করা হয়। শবদেহ নিয়ে যে শোকমিছিল বার হয় তাতে বিশাল জন সমুদ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে এবং এই চরম এবং পরম আকাঙ্ক্ষিত বীরের মৃত্যুকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দন জানায়।

এই বর্বর নারকীয় ঘটনা যাতে সভ্য জগতে প্রকাশিত না হয় তার জন্য

তদানীন্তন শাসক শ্রেণীর চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে সারা দেশময় সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত নেতা শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু এক বিবৃতির মাধ্যমে এই বর্বরোচিত গুলি চালনার ঘটনার প্রকৃত তথ্য দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন হিজলী বন্দীদের উপর এই হীন আক্রমণ চালাবার পক্ষে উত্তেজনার কোনই কারণ ছিল না। তিনি এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে অবিলম্বে একটি বেসরকারী তদন্তের দাবী করেন। ইতিমধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তদানীন্তন বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী হাচিন্স সাহেব প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী তদন্তের প্রহসন শুরু হয়। বন্দীরা তাদের এই তদন্তে যোগদিতে অস্বীকার করেন। বন্দীগন এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বেসরকারী তদন্ত ও দোষী সিপাইদের বদলির দাবী করে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। এই পাশবিক গুলি চালনার ফলে যারা আহত ও মরনাপন্ন হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন তাদের একটি তালিকা উল্লেখ করলাম।

১। শচীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত
৩। সবিতা শেখর রায় চৌধুরী
৪। হেমন্ত কুমার তরফদার
৫। শরৎ চন্দ্র দত্ত
৬। নরেশ চন্দ্র ঘোষ
৭। মনোহরি মুখার্জী
৮। কৃষ্ণপদ ব্যানার্জ্জী
৯। কুঞ্জ বসু
১০। করুণা নিদান রায়
১১। অশ্বিনী কুমার গুহ
১২। রমেশ চন্দ্র চাকী
১৩। শিবদাস লাহিড়ী
১৪। সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৫। তারাপদ গুপ্ত
১৬। আশুতোষ হাজরা
১৭। সুরেশ চন্দ্র দাস
১৮। সুধীর সেনগুপ্ত
১৯। প্রবোধ কুমার গুপ্ত
২০। সুবোধ চৌধুরী

উপরিউক্ত সকলেই বুলেটের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন একমাত্র সবিতা শেখর রায়চৌধুরী বুলেট ও বেয়নেট দ্বারা আহত হন। তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ কুমার মিত্র এই দুই জন গুলির আঘাতে তৎক্ষণাৎ মারা যান এবং হাসপাতাল অবধি যাওয়ার অবসর পাননি। চিকিৎসার পর সকলেই একে একে পুনরায় হিজলী বন্দী শালায় ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে, বাইরে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠায় কর্তৃপক্ষ কিছু

কিছু শিবির কর্মচারী ও সিপাইদের বদলি করে অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন ও অচল অবস্থার অবসানে প্রয়াসী হন। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর আমাকে রংপুর জেলার একটি গ্রামে নজর বন্দী করে রাখে। সেখানে প্রায় দুই বৎসর কাটাবার পর আমাকে পুনরায় ২৪ পরগণা অন্তর্গত খড়দহে আটকে রাখে। সেখান থেকে ১৯৩৭ সালে আমি মুক্তি পাই। বন্দী জীবনের শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতা প্রয়াসী বিপ্লবীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠে কোন পথ অবলম্বন করে বৃটিশ শাসনকে পরাস্ত করা সম্ভব। এই নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা চলে এবং ক্রমে ক্রমে কার্লমার্কস ও লেনিনের নবতম পথই প্রশস্ত বলে বিবেচিত হয়। সেই সময় প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী সৌমেন ঠাকুরের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে আর, সি, পি, আই দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করি এবং বহিরে বেরিয়ে এসে প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্তর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদিই। পরিশেষে ১৯৪৭ সালে দেশ দুই ভাগ করে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। এই প্রসঙ্গে একটা অভিমত উল্লেখ করাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও এটা আমার একান্ত নিজস্ব অভিমত। ১৯৪৭ এর বহু আগেই এই স্বাধীনতা আমরা লাভ করতে পারতাম। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটজনক মুহূর্তে যখন নেতাজী I. N, A. সেনা বাহিনী নিয়ে ভারতের দরজায় আঘাত হান্‌ছিলেন এবং কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' ও 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র ডাকে গন অভ্যুত্থানে সমগ্র ভারত উদ্বেলিত তখনই ইংরেজ সরকার ভারত পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল। সেই সময় অহিংসার পুজারী তথা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই সার্বিক অভ্যুত্থানকে যোগ্য নেতৃত্ব দানে সফল করে তোলার পরিবর্তে 'ভারত ছাড়ো' ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঐচ্ছিকভাবে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ইংরেজের নিরাপদ জেলে আশ্রয় নিলেন। তখন তাঁদের উচিত ছিল অন্তরাল থেকে প্রত্যেক গ্রামের কোনে কোনে ঢুকে গিয়ে সেই আগষ্ট অন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে ইংরেজ কর্মচারী ও তার অনুগত প্রহরীরা সত্যাগ্রহীর নাম শুনেই জ্ঞান হারায়। বর্মায় I. N.A এর বিরুদ্ধে লড়াই ও দেশের অভ্যন্তরে সেই আগষ্ট বিপ্লবকে একই সঙ্গে মোকাবিলা করা ইংরেজের সাধ্যাতীত ছিল। তাই তারা প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে অবিলম্বে তাদের ভারত ছেড়ে পালাতে হবে। সেই মতো তার প্রস্তুতিও নিতে আরম্ভ করেছিল। কংগ্রেস নেতারা জেলে বন্দী হলে সেই আগষ্ট আন্দোলন অহিংসার পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হচ্ছিল। এই আন্দোলনকে যাঁরা পরিচালনা করে ছিলেন তাঁরা

কেউই বাপুজীর অনুগত অহিংস সত্যাগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা হলেন অচ্যুত পটবর্ধন, অরুণা-আসফআলি, রামমনোহর লোহিয়া, জয় প্রকাশ নারায়নের মতো বাপুজীর অবাধ্য ভারতীয়রা। সেই জন্যই বোধ হয় অহিংসার মর্যাদা রক্ষার্থে স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করেও ভারতকে বলি দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হল। এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত না হলে ইংরেজ সরকার সুযোগই পেত না ভারতকে এমন দাঙ্গায় পুড়িয়ে, দেশভাগের ছুরি চালিয়ে ভারত ছেড়ে নিরুপদ্রবে তাদের নিজেদের দেশে ফেরার জাহাজে ওঠার।

পরিশেষে দেশ দুই ভাগ করে আমরা স্বাধীনতা ক্রয় করলাম। এইভাবে স্বাধীনতা লাভ আমাদের আগামী প্রজন্মের মনে কোনই বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। সেই জন্যই আজ আমরা সর্বদিক দিয়েই অবক্ষয়ের পথে চলেছি। আজ আমি বার্ধক্যের প্রভাবে পঙ্গু ও জর্জরিত এবং এই অবক্ষয় অসহায় ভাবে নিরীক্ষণ করছি। পরিশেষে একটা কথাই আমার মনে হয় যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যদি এই অবসর প্রাপ্ত বিপ্লবীদের স্বাধীনতা লাভের পর দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় ভাবে নিয়োগ করতেন তা হলে হয়তো কিছুটা সুফল পাওয়া যেত। আজ, কালের স্রোতে ও জরার কবলে আমি জীর্ণ। তবুও আশা রাখি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যোগ্য হাতে হাল ধরে একদিন ভারতকে সঠিক পথ-নির্দেশ দেবে এবং জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দেবে। তখন হয়তো ভারতের সেই সমৃদ্ধি দেখার আমার সৌভাগ্য হবে না।

পরিশেষে শহীদ ক্ষুদিরাম ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনপঞ্জী ও স্মৃতিকথা সম্বলিত "স্মারকগ্রন্থ" প্রকাশের উদ্‌যোগকে স্বাগত জানাই।

———

স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিচারণ

শ্রী সমরেন্দ্র ঘোষ

বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর জন্মকালের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন —'জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি!'

আমার জন্মকালে শুধু আমার জন্মভূমিই ক্ষুব্ধ ছিল না। সেই সময় ক্ষুব্ধতা সারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ইউরোপে চলছিল মহাসমর তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতেও লাহোর থেকে বর্মা তো বটেই, এমন কি সিঙ্গাপুরেও ভারতীয় সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে। বুড়ি বালামের তীরে বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন তাঁর চার যুবক সঙ্গীর সঙ্গে ইংরাজ সেনার সঙ্গে সংগ্রাম করে দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কুরুক্ষেত্রে মহাভারতে পঞ্চ-পান্ডবের সংগ্রামের কথা। অন্যদিকে বাংলার বীর যুবকেরা 'ফর্টিনাইন বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে চলে গেছে, তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলও যোগ দিয়ে হাতে কলমের বদলে রাইফেল তুলে নিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার গঙ্গাতীরে বজবজ বন্দরে আমেরিকা হতে জাহাজ ভর্তি করে এসে পাঞ্জাবের গদর পার্টির বীরেরা ইংরাজের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে সারা ভূধর সংগ্রামে থরথর। আমার জন্মকালীন পরিস্থিতি এই রকম ছিল বলেই আমার ঠাকুর্দা রাজেশ্বর ঘোষ আমার নামকরণ করলেন 'সমর'। জানি না এই সমর নামকরণের ফলেই কিনা আমার সারা জীবনটাই লড়াইয়ের মধ্যে কেটেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই, শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই। এর জন্য আমায় কারাবাস করতে হয়েছে, নির্বাসনে সাগরপারে আন্দামানে যেতে হয়েছে, অনশন করতে হয়েছে, নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাসে আমার জীবনটা জড়িয়ে গিয়েছিল। আজ আমার বন্ধুরা অনুরোধ করছেন সেই সংগ্রামী ইতিহাস বা আমার জীবন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করার জন্য। তাই এই জীবনের 'গোধূলি বেলায় এসে পিছনে চাহি ফিরে…'

১৯১৬ খৃঃ সালে ৩১'শে জানুয়ারী ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের বনযুরি গ্রামের এক বিখ্যাত বংশে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার বাবার নাম নরেন্দ্র ঘোষ,

মাতা ননীবালা দেবী। আমরা পাঁচ ভাই, আমি দ্বিতীয়। সকলের বড় এক বোন ছিলেন।

খাল বিল জলের জালে ঘেরা পদ্মাপারে আমার বাল্যকাল কাটে, যৌবন কাটে সাগর ঘেরা দ্বীপের সেলুলার জেলে। যৌবনোত্তর জীবন কাটাই গঙ্গাপারের পশ্চিম বাংলায়। কর্মক্ষেত্র করেছিলাম বর্ধমান জেলায়। নদী মেখলা দেশের মানুষ হলেও আমি প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি. এমন কি বরফ ঢাকা হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে গৌরীকুণ্ডে গিয়ে স্নান করে এসেছি। বঙ্গোপসাগরের ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ে প্রায় জাহাজডুবি হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। অবশ্য সে সব পরের কথা, পরেই বলা উচিত। স্মৃতিচারণ করতে বসলে একটা মুস্কিল হয় যে সিনেমার ছবির মতো সারা জীবনটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, ঘটনাগুলি কালানুযায়ী না এসে গুরুত্ব অনুযায়ী এসে হাজির হয়। যাহোক, লেখনীকে সংযত করে ঘটনার পরম্পরা রক্ষার চেষ্টা করা যাক্। শৈশবে ফিরে যাই।···

আমাদের গ্রামের পাঠশালাতেই আমি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। তারপর ভর্তি হই মাণিকগঞ্জ শহরের আনন্দময়ী জাতীয় বিদ্যালয়ে। তারপর মডেল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই। যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। এই অঞ্চলে বিপ্লবীদলের প্রধান সংগঠক হীরালাল মহিন্তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো।

হীরালাল মহিন্তা আমার মনে জাতীয়তার বীজ বপন করলেন, ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখালেন। তিনি সংগ্রামী বীরদের জীবনী পড়ালেন, যেমন শিবাজী, রাণা প্রতাপ লক্ষ্মীবাই, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন প্রভৃতির কাহিনী। দেশের মানুষের সঙ্গে বিদেশের বীররাও বাদ যান না ; ডি-ভ্যালেরা, ডানট্রিন, গ্যারীবল্ডি, নেপোলিয়ান প্রভৃতির সঙ্গেও পরিচয় হয়। বলাবাহুল্য সেই সব জীবনীগ্রন্থের মধ্যে শাসকদের ঘোষিত নিষিদ্ধ পুস্তকও ছিল। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমিও সক্রিয় অংশ নেব। কিশোর শহীদ ক্ষুদিরামের মত হবো, যার বোমায় ভারতের কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও ফাঁসিতে মৃত্যু মানুষকে স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুভয় ভুলিয়ে দেয়।

১৯২৭ সালে আমি ছাত্র সংঘের সদস্য হলাম এবং স্বাধীনতার সৈনিকরূপে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। নিয়মিত ব্যায়াম ও লাঠি খেলা শুরু করি।

১৯২৮ সালে কলিকতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সামরিক পোশাকে সজ্জিত অশ্বারোহী তাঁর সেই মূর্তি আমাদের মনের মন্দিরে চিরস্থায়ী হয়ে আছে, যার পূর্ণপ্রকাশ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আজাদ হিন্দ সরকারে 'নেতাজী' রূপে। সেই স্মরণীয় কংগ্রেস অধিবেশনে হীরালালদার উৎসাহে আমি ও ছাত্র সংঘের অন্যতম নেতা সমরেন্দ্র চৌধুরী যোগ দিই।

১৯২৯ সালে মাণিকগঞ্জে ঢাকা জেলা কংগ্রেস সম্মেলন হয়। ক্ষিতীশ মজুমদারের নেতৃত্বে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। আমি সেই বাহিনীতে যোগ দিই। এই উপলক্ষে অমৃত হাজরা, নরেন বোস, রজনী বসাক, অশ্বিনী ঘোষ, অনুকূল চৌধুরী প্রভৃতির সংস্পর্শে আসি। আমার সহপাঠী অপরেশ চৌধুরীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। এই সময়েই আমি গুপ্ত বিপ্লবীদল যুগান্তরে যোগ দিই! আমি ১৯২৯ সালে ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম যেখানে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

১৯৩০ সালে শুরু হলো আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ ইত্যাদি সারা দেশব্যাপী অহিংস সংগ্রাম। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরাও চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁদের দ্বারা সংগঠিত এক অভূতপূর্ব ঘটনায় সকলে চমকে উঠে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলো। ১৮'ই এপ্রিল চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ইংরাজের অস্ত্রাগার অধিকার করলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিলেন রেলপথ ও টেলিফোন-টেলিগ্রাফ সংযোগ ছিন্ন করে। শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা সহর থেকে পালিয়ে বন্দরের জাহাজে আশ্রয় নেয়। ২২'শে এপ্রিল তাঁরা জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধে ইংরাজ সেনাবাহিনীকে পযুর্দস্ত করে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করলেন। বেশ কিছু তরুণ অসীম সাহসের সঙ্গে শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁরা সংগ্রামে প্রাণ দিয়ে সারা দেশের বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করলেন।

আমরাও ব্যাকুল হয়ে উঠলাম ইংরাজ শাসনের নাগপাশ থেকে মাণিকগঞ্জকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু কিছু করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন অস্ত্রের। গোপনে মার গয়না বিক্রি করে আমি একটি রিভলবার সংগ্রহ করলাম। কিন্তু আরও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজন প্রভূত অর্থ।

অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হল মাণিকগঞ্জ পোস্টাফিসের মেল ব্যাগ লুণ্ঠন করে। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা হতে যে টাকা আসে তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হল।

হীরালাল মহিন্তা তখন মারা গেছেন। মাণিকগঞ্জের বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের মতো অল্প বয়স্ক ছাত্রদের উপর। আমি ও অপরেশ সর্বত্র ঘুরে সংগঠনকে চাঙ্গা করে তুলেছিলাম। আমাদের দলে তখন আছেন ঢাকার আইন কলেজের ছাত্র অজিত সিংহ রায়, সমরেশ চৌধুরী, নারায়ণ মুখার্জী (কেমিক্যাল কোম্পানী অ্যাডকোর মালিক) ও মিলনদা (প্রতুল নিয়োগী)।

স্থির হয় অর্থ অপহরণে অংশ নেব আমি, অপরেশ চৌধুরী, ভোলা মুখার্জী ও রবি দাস। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে অপরেশ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেদিনের পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। পরবর্তী অভিযানে আমার সঙ্গী নির্বাচিত হয় রবি দাস, ভূপেশ গাঙ্গুলি, খগেন সরকার ও যাদব চ্যাটার্জী। আমার উপর ভার ছিল ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ানকে 'ট্যাকল' করা। আমার সঙ্গে পিস্তল ও রিভলবার ছিল। যাদব চ্যাটার্জীর উপর ভার ছিল চামড়ার মেলব্যাগ কেটে অন্য তিন জনের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার, তারা অর্থ নিয়ে এক দিকে পালাবে এবং আমি ও যাদব অন্য দিকে অর্থাৎ খালি হাতে শহরের দিকে।

পরিকল্পনা অনুযায়ীই গাড়ি থামিয়ে ব্যাগ নামিয়ে কেটে ফেলা হয়, অর্থ নিয়ে সঙ্গী তিনজন পালায়, আমি ও যাদব সাইকেলে শহরের রাস্তা ধরি। আমাদের পালায়নরত দেখে গাড়োয়ান গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে তার পিঠে চড়ে 'ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের অনুসরণ করে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে সঙ্গে অপহৃত অর্থ না থাকায় আমাদের ডাকাত ভেবে কেউ ধরলেও বিভ্রান্ত হবে। কিন্তু আমি স্বয়ং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি যখন যাদব আমায় জানাল যে টাকা ভরা 'ইন্সিসিউরড' খামগুলি তার সঙ্গে আছে। তাড়াতাড়িতে সঙ্গী তিনজনের হাতে সেগুলি তুলে দিতে পারেনি। কথা শুনে আমি চমকে উঠি। ধরা পড়লে আমরা যে নিরীহ ছাত্র নই, সত্যিই ডাকাত তার প্রমান সঙ্গে রয়েছে।

সাময়িক বিভ্রান্তির ফলে ভুল সিদ্ধান্ত করা হল। আমাদের দুজনের উচিত ছিল শহরের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে যাওয়া এবং অনুসরণকারীর ঘোড়াটিকে রিভলবারের গুলিতে মেরে ফেলা। অবস্থানুযায়ী সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই শহরের দিকে প্রাণপনে সাইকেল চালাই।

ইতিমধ্যে আর এক বিপত্তি ঘটল। আমাদের পালাবার পথে মহাদেবপুরে রাস্তার মাঝে একটা খাল ছিল। সকালে আমাদের যাওয়ার সময় সেটি শুকনো থাকায় সাইকেল নিয়ে পার হতে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখন দেখি সেই

খালটি জলে ভরে গেছে। আগের দিন রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল এবং কোন স্থানের জমা জল বাঁধ ভাঙার ফলে এই খাল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সাইকেল নিয়ে এই জল পার হওয়া সম্ভব নয় বলে আমরা বাহন পরিত্যাগ করে পদযুগলের সাহায্য নিই। খাল পেরিয়ে দৌড়াই। কিন্তু খালটা পার হতে বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়। এদিকে ওই ঘোড়ার গাড়িটির মালিক হৃষিকেশ মুখার্জী মহাদেবপুরেরই বাসিন্দা। ডাক লুঠের খবর শুনে তিনি ও তাঁর ছেলেরা অন্য ভাল ঘোড়া নিয়ে আমাদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। মানিকগঞ্জ থানাতেও ডাক লুঠের খবর পৌঁছে যাওয়ায় থানার ইন্সপেক্টর ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে আমাদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়েন। আশপাশের গ্রামের লোকেরাও ডাকাত ধরতে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসতে থাকে।

সময়টা ছিল ১৯৩৩ সালের মে মাস। গ্রীষ্মের সূর্য আমাদের মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে। প্রচণ্ড উত্তাপে দেহ তাড়াতাড়িই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও আমরা প্রায় পাঁচ মাইল এক টানা দৌড়ে বাইনাজুরিতে ঘেরাও হয়ে পড়ি। আমি বাধ্য হই রিভলভার বের করে গুলি বর্ষণ করতে। গাঁয়ের নিরীহ মানুষদের মারার ইচ্ছা ছিল না, ভয় দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করি। গুলি বর্ষনের আগেও অবশ্য আমরা চিৎকার করে বলেছিলাম,—'আমরা ডাকাত নই। 'স্বদেশী' লোক। এ টাকা স্বদেশের স্বাধীনতার কাজে লাগবে।'

কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তখনো জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়নি। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেনি। বিপ্লবী আমরাও জনসাধারণ সম্বন্ধে সঠিক মনোভাব সে যুগে নিইনি। আমরা মনে করতাম জনসাধারণকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় আমরা কজনেই সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হব।

গুলি বর্ষন করে পালাবার পথ করতে গিয়েও আর একটি ভুল টের পেলাম। আমাদের দলের নিরাপত্তার জন্য আমি একটি দশ বোরের পিস্তল ও একটা ছোট রিবলভার সঙ্গে রেখেছিলাম। অর্থ লুণ্ঠনের পর ওই তিন বন্ধুর হাতে টাকা তুলে দেবার সময় পিস্তলটিও তাদের দিয়ে দিই। অ্যাকসনে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন না হওয়ায় সেটিকে নিরাপদে রাখার জন্য বন্ধুদের বলি—টাকার সঙ্গে পিস্তলটাও যেন মনোরঞ্জন কুণ্ডুর কাছে জমা দেয়। ছোট রিভলবারটা আমি রাখছি।

কিন্তু ভুল হয়ে যায় গুলি বদলির ব্যাপারে। আমার কাছে পিস্তলের গুলি থেকে যায় আর রিভলবারের চারটি ছাড়া সব গুলি চলে যায় খগেনের সঙ্গে। সেই চারটি গুলি ছুঁড়েই আমি অনুসরণকারী বিরাট এক দল লোককে কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে দৌড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারটি গুলি নিঃশেষ হয়ে যায়। অনুসরণকারীরা যখন বুঝতে পারল আর গুলি ছুঁড়তে পারছি না, তখন তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা ধরা পড়লাম।

ঢাকার এস. পি তাঁর লঞ্চে আমায় বন্দী করে ঢাকা নিয়ে আসে। ঢাকা জেলে আমাকে রাখা হয়। কিছু দিন পরে আমার অন্য সঙ্গীরাও ধরা পড়ে যায়। আমাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির ও বেআইনী অস্ত্র রাখার মামলা শুরু হয় স্পেসাল কোর্টে।

মামলা চলাকালে আমার বাবার কাছ থেকে খবর পেলাম আমি তিনটি লেটার পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছি।

বিচারে আইনের বিভিন্ন ধারায় আমার উনিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঢাকার কুখ্যাত '৪০ ডিগ্রি' সেলে আমায় বন্দী করে রাখা হয়। '৪০ ডিগ্রি' অর্থ হচ্ছে এই ওয়ার্ডে চল্লিশটি সেল বা কুঠরী আছে। ২নং সেলে আমায় রাখা হয়। আমার পাশে ১নং সেলে ছিল কুখ্যাত কয়েদী দেওকী দুবে। সে দু'বার জেল থেকে পালিয়ে ধরা পড়েছিল। দ্বিতীয়বার মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র জেলের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে যাওয়ায় তার হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে যায়। জেল হাসপাতালে অপারেশন করে তার হাঁটু ঠিক করে না দিয়ে ওইভাবেই রেখে দেওয়া হয়, যাতে সে আবার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা না করে। জেলের কয়েদীরা এইরকম কৃতি পুরুষকে খুব সমীহ করতো, 'মহারাজ' বলে ডাকতো। কয়েক দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার ভাল আলাপ হয়ে যায়।

আমার অন্য পাশে ৩নং সেলে ছিল ময়মনসিংয়ের দুর্দান্ত ডাকাত মুরারী পাল।

মেদিনীপুরের বার্জ মার্ডার কেসের আসামী বিপ্লবী কামাখ্যা ঘোষকে ঢাকা জেলে এনে রাখা হয়। তার কিছুদিন আগে সিন্ধু প্রদেশের বিখ্যাত মুসলীম নেতা ও সত্তর বছরের কারাদণ্ড পাওয়া পীর পাগয়োকে এখানে আনা হয়। কামাখ্যা ঘোষের সঙ্গে ইতিপূর্বে মেদিনীপুর জেলে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল, যারা তাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতো। সেই টাকা সাধারণ কয়েদী থেকে জেলার পর্যন্ত সকলকে তিনি নিয়মিত বেতনের মতো দিতেন।

তারফলে জেলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সুযোগ সুবিধা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর খুনী কয়েদী হলেও তাঁর খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। বাইরের থেকে অনেক কিছুই তিনি জেলের মধ্যে আমদানী করতে পারতেন। কামাখ্যা ঘোষের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি কিছু টাকা জোগাড় করি বিশেষ উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যটা আর কিছু নয়, জেল থেকে পলায়ন। পলায়ন বিশেষজ্ঞ দেওকী দুবের সঙ্গে বিশেষ ভাব জমিয়ে তার মারফৎ বাইরে থেকে লোহার গরাদ কাটার করাত আনাই।

ধীরে ধীরে যখন পলায়নের পরিকল্পনা পাকা করছি, তখন একদিন সকালে জেলার সদলে এসে আমার সেল সার্চ করান। মনে হয় কয়েদীদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার মতলব তার কাছে ফাঁস করেছিল। বলাবাহুল্য সার্চের ফলে কিছু পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও আমাকে তখুনি ৮ ডিগ্রির সেলে ট্রান্সফার করল। ৮ ডিগ্রি হচ্ছে ফাঁসীর ওয়ার্ড—প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত বন্দীদের এখানে রাখা হয়। আর রাখা হয় জেল আইন ভঙ্গকারী বন্দীকে শায়েস্তা করার জন্য।

আমাকে যখন ফাঁসির ওয়ার্ডে রাখা হয়, তখন সেখানে ছিলেন 'দেওভোগ শুটিং'-কেসের প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত বিপ্লবী মতি মল্লিক। নারায়ণ গঞ্জের নিকট দেওভোগ গ্রামের পথে বিপ্লবী সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী, মতি মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে গ্রামের চৌকিদারদের সংঘর্ষ হয়। রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে বিপ্লবীরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিলেন। চৌকিদাররা তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে সংঘর্ষ হয়। এক চৌকিদার নিহত হয় এবং মতি মল্লিক ধরা পড়েন। ফাঁসির কয়েকদিন পূর্বে শহীদ মতি মল্লিকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল।

জেল কর্তৃপক্ষের চোখে আমি ছিলাম 'অত্যন্ত বদমাইস আসামী।' তার কারণ আমি প্রায়ই জেলের নিয়ম-কানুন মানতাম না। অফিসারদের পরিদর্শনের সময় 'সরকার সেলাম' বলে তাদের সম্মান জানাতাম না। ফলে আমার শাস্তি একবার হলো সেলের মধ্যে জাঁতা ঘুরিয়ে গম পেশাই করা। আমি জাঁতাটাকেই ভেঙে রেখে দিই। সুপার ভিজিটে এলে ভাঙা এক অংশ নিয়ে রুখে দাঁড়াই। সে ভয়ে আমার সেলে ঢোকে না। ফলে আরো কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হয়। আমাকে গরুর মতো ঘানিতে জোড়া হয় হাতকড়া পরিয়ে অন্য দুজন সাজা প্রাপ্ত কয়েদীর সঙ্গে। ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করার বদলে আমি শিব হয়ে শবাসন করি, মাটিতে

শুয়ে একবারে 'নট নড়ন চড়ন'। আমাকে শায়েস্তা করার জন্য 'কেস্টাবিল' করা হয়। জেলে এমন অনেক কথা শুনি যার অর্থ প্রথমে আমার বোধগম্য হতো না। 'কেস্টাবিল'হচ্ছে কেস ও টেবিল শব্দের সমাস। অর্থাৎ কেসটা সুপারিনটেনডেন্টের টেবিলে পেশ করা হবে এবং তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। যা হোক, গুরুতর অপরাধের জন্য সাহেব সুপার আমার বেত্রদণ্ডের হুকুম দিল। আমার বয়স তখন সতেরো হয় নি। পূর্ণ বয়স্ক নই বলে এই সাজা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে অনুমোদন করানো প্রয়োজন। ম্যাজিস্ট্রেট বেত্রদণ্ডের বদলে আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো দুমাস বাড়িয়েদিল। জেলার ডাণ্ডাবেড়ি ও চটের কোর্তা পরার হুকুম দেয়। ফলে নির্জন সেলে হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি ও চটের ইজের ফতুয়া পরে আমার দিন কাটাতে হয়। মশারি জড়িয়ে রাত কাটাই। নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে আমাদের দেশের গরীব জেলেরা গায়ে জাল জড়িয়ে শীত কাটায়, তা আমি তো এখন জেলে, তাই মশারী জড়িয়ে রাত কাটাই। একদিন আমার ইজের ফতুয়া ভিজে যাওয়ায় আর এক সেট চেয়ে পাই না। ভিজে চটের পোষাক পরে অসুস্থ হওয়ার চেয়ে উলঙ্গ থাকাই শ্রেয় মনে করি। আমায় নগ্ন অবস্থায় দেখে সেপাই-সান্ত্রীদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে যায়—'স্বদেশীবাবু পাগলা হো গিয়া! নাঙ্গা হো গিয়া!'

সুপার ছুটে আসে আমি কতটা পাগল হয়েছি দেখার জন্য। দেখে শুনে আর এক প্রস্থ পোষাক মঞ্জুর করল বটে, তবে আমাকে penal diet দেওয়ার হুকুম হল, অর্থাৎ ভাতের বদলে চাল গুঁড়ো করে তার ফেন।

বন্দী অবস্থাতেও সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে ও তার জন্য দণ্ডভোগ করে ঢাকা জেলে ফাঁসির সেলে বছর খানেক কাটল। ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে আমাকে কালাপানির পারে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো শায়েস্তা করার জন্য। আন্দামানে নির্বাসিত করার জন্য আমাকে ঢাকা জেল থেকে আলিপুরে জেলে পাঠানো হয়। এখানে সেলুলার জেলে যাবার সঙ্গী পাই—বাংলার অন্য জেলার কিছু বীর বিপ্লবীকে।

* * *

(২)

ত্রিশ জন বন্দী বিপ্লবীকে 'মহারাজা' জাহাজে আন্দামান পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। আমরা সকলেই গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলাম বলে আজকালকার

রাজনৈতিক কর্মীদের মতো পরস্পর পরস্পরকে চিনতাম না। অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটতো যাঁরা ধরা পড়ে সাজা খেয়ে জেলে আসতেন। একত্রে কারাবাসের ফলে বিভিন্ন দলের সদস্য হলেও একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতাম। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ঢাকা জেলেই মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার আসামী কামাখ্যা ঘোষ (বর্তমানে এম. এল. এ) ও সুকুমার সেনগুপ্ত (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার, জালালাবাদ যুদ্ধ ও ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের আসামী কালি দে ; কুমিল্লার কালিকচ্ছ শুটিং কেস ও আসামে ইটাছার মেল ডাকাতির বিরাজ দেব, যাঁকে বাংলা ও আসাম গভর্ণমেণ্ট মিলিতভাবে ৪৫ বৎসর সাজা দিয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গী অসিত ভট্টাচার্যকে ফাঁসি দিয়েছিল। তরাইয়ের জঙ্গলে বক্সা দুর্গের মিলিটারী পাহারা এড়িয়ে একদা পলায়নকারী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী এবং ঢাকার প্রশান্ত দাশগুপ্ত ; যিনি মেদিনীপুর জেল থেকে একবার পালিয়েছিলেন।

আলিপুর জেলে নির্বাসন-যাত্রীদের ডাক্তারী পরীক্ষা হয়। তারপর ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে একটি দিনে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় আমাদের জেল থেকে আউটরাম ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। বহুলোক আমাদের দেখার জন্য ঘাটে ও পথে দাঁড়িয়েছিল। আমরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলি আর সমবেত জনতা তার প্রতিধ্বনি তোলে। কেষ্টদা ছিলেন প্রাণবন্ত আমুদে লোক। তিনি বেসুরো গলায় গান ধরেন—'জন্মভূমি করে আহ্বান···।' আমরাও স্ব স্ব কণ্ঠ অনুযায়ী সুরে ধুয়োধরি। আমাদের হুল্লোড় ও গান দেখে সঙ্গের সশস্ত্র পুলিশরা বুঝতে পারে না যে আমরা যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী, না বিবাহোৎসবের আনন্দ মুখর বরযাত্রী।

জাহাজের সেলে এক খাঁচার মধ্যে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়ে ভেড়া-ছাগলের মতো আমাদের পুরে দেওয়া হয়। এক লালমুখো সাহেব এসে ইন্সপেকসন করে। পরে জেনেছিলাম সে হচ্ছে জাহাজের ক্যাপ্টেন। তার পরিদর্শনের পরে আমাদের ডাণ্ডাবেড়ি ও হাতকড়া খুলে দেওয়া হয়। শুনি যে হাতপা বেঁধে জাহাজে রাখা বেআইনী। জাহাজ ডুবলে অন্ততঃ যাতে আমরা নিজেদের ভাগ্যের মোকাবিলা করতে পারি তাই একটু স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

আমাদের তিন দিন জাহাজে কাটাতে হয়। সকালে ও বিকালে এক ঘণ্টা করে নিচের খোয়াড় হতে উপরের ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো। ডেকে নেওয়ার সময় শিকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডক্যাপ দিয়ে রাখতো।

দু' দিন সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়। আমি কবি বা সাহিত্যিক নই, তাই সেই সুন্দর দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। দূর দিগন্তের চারদিকেই আকাশ এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে সোনার থালার মতো উজ্জ্বল সূর্য ধীরে ধীরে সমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে যায়। সারা আকাশ যেন আবির মেখে লাল হয়ে যায়। বিপ্লবী আমরা সকলেই ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতের মানুষ, তাই আমাদের সকলের মনই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়। বাক্যহারা হয়ে নির্নিমেষে আমরা সেই অপরূপ দৃশ্য দেখি।

জাহাজে প্রথম দিন খাওয়ার সময় আমাদের ষাঁড়ের বা মোষের মাংস দেওয়া হয়। জাহাজের খালাসীরা সবাই হয় চট্টগ্রাম নয় সিলেটের মুসলমান। বন্দীদের আহার তাদের পাকশালা থেকেই আসে। ইংরাজ সরকারের হিন্দু বন্দীদের এইভাবে আপ্যায়ন দেখে ভাবলাম তারা বোধহয় নজরুলের কবিতা বাস্তবায়িত করছে—'দাও পাজিটার জাত মেরে।' ··· জাত-পাত নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করি। কিন্তু মাংসটা এমন শক্ত যে প্রাণপণে দাঁত দিয়ে কামড়িয়েও হাড়ের থেকে আলাদা করতে পারি না। অতএব জানিয়ে দিলাম যে এরপর থেকে আমি নিরামিষ ভোজন করবো। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিরাজ আমাকে নিরামিষাশী হতে বাধা দেয়। খালাসীরা শুট্‌কি মাছও রান্না করে। বিরাজের শুট্‌কী মাছ খেতে বাধা নেই, সে তার প্রাপ্য অংশ থেকে খানিকটা দিয়ে অনুরোধ করে আমিষাশী থাকার জন্য। শুনেছি লোকে "উপরোধে ঢেঁকি গেলে,". তাই আমি বন্ধুর অনুরোধে শুট্‌কি গেলার চেষ্টা করি। খেতে মন্দ লাগল না, তবে প্রচণ্ড ঝাল, আমার মতো ঢাকার বাঙালেরও নাকে-চোখে জল এসে গিয়েছিল। অবশ্য পরে সেলুলার জেলে আমি চাটগাঁইয়াদের সঙ্গে অনেকবার শুট্‌কি মাছ খেয়েছি।

একদিন রাত্রে জাহাজে খুবই 'রোলিং' হয়। শুনলাম সব ঋতুতেই সমুদ্রের এই অঞ্চলে প্রচণ্ড ঢেউ থাকে। অন্য বন্দীদের 'সি-সিকনেস' হলেও আমার কিছু হয়নি। তারা বমি করে শয্যাশায়ী হয় আর আমি দোলনায় দোল খাওয়ার মজা উপভোগ করি।

তৃতীয় দিন সকালে জাহাজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 'এবারডিন' দ্বীপের পোর্ট-ব্লেয়ারে ভিড়বে বলে আমাদের আর ডেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় না। আমি জাহাজের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পাই দ্বীপের গাছপালা।

সেলুলার জেলের নিকটেই একটা জেটি ছিল। এখন সে জেটিটা নেই।

জাহাজ জেটিতে ভেড়ার আগে আমাদের উপর হুকুম হলো তৈরি হয়ে নেবার জন্য। তৈরি আর কী হবো ? সাধারণ যাত্রীদের মতো আমাদের সঙ্গে তো আর মালপত্রের লটবহর নেই। সামান্য কয়েকটা বইপত্তর আর ইংরাজ-রাজের দেওয়া রয়েল ড্রেস—'জাঙ্গিয়া-কোর্তা।'

আমাদের হাতকড়া লাগিয়ে জাহাজের খোল থেকে ডেকে আনা হলো। দেখতে পেলাম উঁচু এক টিলার উপর এক বড় বিল্ডিং। চারদিকে গাছপালা, তার মাঝে-মধ্যে কিছু কাঠের ঘর। সমুদ্রের খাঁড়ির অপর পাশে আর একটা দ্বীপ—সেখানে কয়েকটা সুন্দর বাড়ি। সবই কাঠের মনে হলো। শুনলাম এটা 'রস' দ্বীপ। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন বিভাগের সব অফিস এখানে। হাসপাতাল, চিফ কমিশনারের বাংলো প্রভৃতিও এখানেই।

আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে লম্বা শিকল দিয়ে সকলকে বাঁধা হয়। তারপর উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলের বিরাট গেট খুলে ভেতরে পোরা হয়। মনে হলো এক দৈত্য বিরাট মুখ ব্যাদন করে আমাদের গিলে ফেলল। প্রাণ থাকতে তার উদর থেকে বের হতে পারবো না।

ইংরাজ ডেপুটি জেলার এসে নামের লিস্টি অনুযায়ী আমাদের মিলিয়ে দেখে নিল। এরপর থেকে আমরা হয়ে যাবো নামহারা মানুষ, আমাদের পরিচয় শুধু নম্বরে, পদবী হবে পি. আই অর্থাৎ Permanent Incarcerated। তার মানে 'চিরস্থায়ী বন্দী'। আমার নম্বর হলো—পি. আই. ২৩৬।

জেল অফিস থেকে আর এক ইংরাজ এসে জানালো যে সদ্য আগত আমাদের এখন অন্য বন্দীদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে না। দু সপ্তাহ ১নং উইং-এ 'কোরেনটাইনে' থাকতে হবে। ডাক্তারী সার্টিফিকেট থাকলেও মূল ভূখণ্ড থেকে আগতদের জন্যে এটাই নিয়ম। সেই সাহেব কর্তাতি করে আমাদের একটু শাসানীও দিল—"You should know that this is Cellular Jail. Here lions are tamed. So be careful!"

আমাদের মধ্যে একজন উপযুক্ত জবাব দিল—You may tame lions here, but we are Royal Bengal Tigers. We should rather die than to be tamed.

কথাটা শুনে সাহেব চুপ মেরে যায়। কারণ ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে আমরা পৌঁছাবার আগেই যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন বিপ্লবী বন্দী—মোহিত

মৈত্র, মোহন দাস ও মহাবীর সিং—জেল কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নত করার বদলে অনশন ধর্মঘট করে শহীদ হয়েছেন। তাঁরা প্রাণদান করে সহবন্দীদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন।

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'দের সাগর পারে পুরে রাখার খাঁচা, তথা সেলুলার জেলের একটু বিবরণ দেওয়া যাক্।

সেলুলার জেলে ছিল ছ'শো ষাটটি সেল। বিরাট জেলটি সাতটি উইংয়ে বিভক্ত। প্রতিটি উইং ছিল তিনতলা। ২নং উইং বর্তমানে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ৩নং, ৪নং ও ৫নং ভেঙ্গে করা হয়েছে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের নামে এক হাসপাতাল। স্বাধীন ভারত সরকারের মতলব ছিল সশস্ত্র সংগ্রামী বিপ্লবীদের কাহিনী দেশবাসীর মন থেকে মুছে দেবার। প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের সংগঠন ও কিছু সচেতন দেশবাসীর প্রতিবাদে ভারতের 'বাস্তিল' এই ঐতিহাসিক কারাগার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

আমাদের দু সপ্তাহ ১নং উইং-এ রাখার পর 'কোয়েরেনটাইন' শেষে ২নং উইংয়ের সেলে রাখা হয়। বন্দী আমাদের মুখপাত্র ছিলেন লোকনাথ বল, তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকারের অন্যতম নেতা ও জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি।

বন্দীদশায় আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা শুরু করলাম। মাকর্সবাদ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। জেল কর্তৃপক্ষ ভাবতো মাকর্সবাদী গ্রন্থ পাঠ করে বাংলার তরুণেরা যদি শাসক বধের পালা শেষ করে দেয় তাহলে তাদের পক্ষে ভালই হবে, ইংরাজ শাসন কর্তারা প্রাণে বাঁচবেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা জেলের মধ্যে ওই বিষয়ের বই আমদানীতে কোন কড়াকড়ি করতো না, সেন্সার করতো না। ফলে জেলের মধ্যে যেন এক 'মাকর্সবাদের ইউনিভারসিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ নারায়ণ রায়, সুনীল চ্যাটার্জী, খোকা রায়, সতীশ পাকড়াশী, নলিনী দাস প্রভৃতি হন অধ্যাপক আর আমরা হই আগ্রহী ছাত্র। এক একটা বই আমারা পালা করে পড়তাম কিংবা নকল করে নিতাম। মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনা, লেনিন-স্ট্যালিনের রচনা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের বিখ্যাত পুস্তকগুলি আমরা অধ্যয়ন করি, বিষয়-বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি।

চট্টগ্রামের গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং বন্দী জীবনের প্রথম দিকে মার্ক্সই-জমের নতুন চিন্তাধারাকে বিশেষ আমল দিতেন না। কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে সমাজ ব্যবস্থা বদলের পরিবর্তে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বণিক বিদেশী

শোষকদের কবল হতে মুক্তির কথা তাঁরা বলতেন। যাহোক, পড়াশোনার মধ্য দিয়ে তাঁরা উগ্র জাতীয়তাবাদের বদলে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

অনন্তদার মধ্যে এক বিস্ময়কর 'মিলিট্যান্সী' ছিল এবং গোপন ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক কার্যে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। অনন্তদা-গণেশদা বিপ্লবী সংগঠনের উপর সর্বদা গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা জেলের মধ্যে গঠিত 'কম্যুনিস্ট কনসলিডেশন ব্লক-এ প্রথমে যোগ না দিলেও লেনিন-স্ট্যালিনের লেখা 'হোয়াট ইজ টু বি ডান', 'ওয়ান স্টেপ ফরোয়ার্ড, টু স্টেপস ব্যাক', 'অন অর্গানিজেশন' 'রাশিয়ান রেভ্যুলিউশন' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁদের খুব প্রিয় হয়। আমিও উক্ত গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ি। অ্যালেক ব্রাউনের লেখা 'ফেট অফ দি মিডল ক্লাস' বইটি পড়ে আমি কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করলেও 'কম্যুনিস্ট কনসলিডেশনে' প্রথমে যোগ দিই না? আমি মনে করি যে শহরে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রয়েছে তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোন এক নতুন দলে যোগ দেওয়া আমার উচিত হবে না। আমি জানি যে কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করলে তাঁর ঘনিষ্ঠজন ধর্ম সম্বন্ধে তার আলোচনা গ্রাহ্য করবে না, তার কর্তব্য আগে আলোচনা করে ঘনিষ্ঠজনদের প্রতিক্রিয়া বিচার করে ধর্মান্তর গ্রহণ করা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে চাই কি তার ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে কিছু ঘনিষ্ঠজনকে তার সঙ্গী হিসাবে পেয়ে যেতেও পারে।

ভবিষ্যতে কোন একদিন মুক্তি পেলে যাতে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে পারি তার জন্য অনন্তদা-নলিনীদার নেতৃত্বে মিলিটারী ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়। 'মিলিটারী সায়েন্স' সম্বন্ধে অনন্তদা প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। তিনি নানা ভাবে বাইরে থেকে সামরিক বিদ্যাশিক্ষার বই আনতেন। ইনফ্যাণ্ট্রি ট্রেনিং সম্পর্কে তিন ভল্যুমের গ্রন্থরাজি তিনি নিজে পড়ে আমাকেও পড়ান। এক কথায় তাঁকে 'বিপ্লবীদলের সমর-বিদ্যা বিশারদ' বলা চলে। আর অনন্তদা-গণেশদা ছাত্র জীবনে ছিলেন 'যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে' (তখন সেটা ইউনিভারসিটি হয় নি) সহপাঠী, বিপ্লবী জীবনে 'হরিহর-আত্মা', পরস্পরের পরিপূরক।

প্রতিদিন সকালে আমাদের নিয়মিত ভাবে প্যারেড শুরু হলো। আমাদের insignia বা ব্যাজ হলো—C. P F. (Cellular Political Force). সৈন্যরা রাইফেল নিয়ে প্যারেড করে। তাই আমরাও নকল রাইফেল নিয়ে প্যারেডে মাতলাম। এই নকল রাইফেল ও ইউনিফর্ম প্রস্তুতের কথা একটু বলা যাক্।

আমাদের সময় জেলে সুপারিনটেনডেণ্টের নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে বেঞ্জ (Benz) বলে এক জেলার ছিল। সে এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত বন্দীদের দেখাশোনার জন্য বিশেষ ভাতা পেত। সে আমাদের বেশি ঘাঁটাতো না। কারণ ইতিপূর্বে তিনজন বন্দী অনশনে মৃত্যু বরণ করায় সারা দেশে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল। সে জেলখানায় শান্তি বজায় রেখে কর্তৃপক্ষের কাছে সুনাম অর্জনের পক্ষপাতী ছিল। আমাদের অনেক কিছু কার্য না দেখার ভান করে সে মেনে নিতো। তাই আমরা মিলিটারী ট্রেনিং ও প্যারেড করায় বাধা পাই না। সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত অনেককে খুব হাল্কা ধরণের কাজ করতে হতো, যেমন জামাকাপড় সেলাই। পূর্বসূরীদের মতো আমাদের ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করা বা নারকেল ছোবড়া থেকে দড়ি পাকানো বা পাথর ভেঙে রাস্তাঘাট তৈরি করার দুর্ভাগ্য হয়নি। আমাদের উত্তরবঙ্গের দর্জির কাজ জানা এক কমরেড সকলকার জন্য ইউনিফর্ম খুব সহজেই তৈরি করে দিল জেলেরই সেলাই মেশিনে। নৌবাহিনীর মতো সাদা ইউনিফর্ম আমাদের হলো।

কাঠের ডাণ্ডা কেটে আমরা রাইফেলের কুঁদো তৈরি করলাম। তক্তাপোষের কাঠ ও মশারির ডাণ্ডা আমরা এই নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করি। রাইফেলের ধাতব অংশ নির্মিত হয় এ্যালুমিনিয়ামের থালা কেটে। রোদ্দুরে ড্রিল করার সময় লোহার বন্দুকের চেয়ে আমাদের বন্দুক ঝক্‌ঝকে হয়। আর তার ফলে এক মজার ঘটনা ঘটে। বৃটিশ নৌবাহিনীর এক জাহাজ আন্দামানে এসে নোঙর করেছিল। সেই 'গানবোট' থেকে কয়েকজন নৌসেনা দূরবীন দিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করছিল। তারা জেলের মাঠে ঝকঝকে বন্দুক নিয়ে আমাদের প্যারেড দেখতে পায়। আমাদের অজ্ঞাতে তারা কয়েকটি ফোটো তুলে নেয়।

সুপারের অফিসে আমাদের মুখপাত্র লোকনাথ বলের ডাক পড়ে। লোকদা ফিরে এসে জানাল যে সুপার সিক্রেট রিপোর্ট পেয়েছে আমরা রাইফেল নিয়ে ড্রিল করি। উত্তরে লোকদা বলেছেন যে জেলের মধ্যে অতগুলি রাইফেল আমদানী করা কি সহজ কথা ? সুপার তাঁর কথা কতটা বিশ্বাস করেছে বলা যায় না। তবে প্রতিটি সেল 'থরো সার্চ' করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা তখনি তক্তাপোষ থেকে কাটা রাইফেলের কাঠগুলি নিয়ে তক্তাপোষে ঠিক মতো সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে ফেলি। বাইরের থেকে কয়েকজন অফিসার এসে সুপারকে নিয়ে খানা-তল্লাসী করে। বলাবাহুল্য কোন বন্দুক তারা খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে চলে যায়। কিন্তু আমাদের বন্দুক সহ প্যারেডের জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ ফটোগুলি থাকার জন্য

সুপারের উপর প্রচণ্ড চাপ আসে। তিনি আমাদের সঙ্গে একটা আপোষ করেন—যদি আমরা নকল বন্দুকগুলি জমা দিই, তাহলে একটা করে মোটা বেতের লাঠি 'ড্যামি রাইফেল ছিসাবে ড্রিলের সময় ব্যবহারের অনুমতি তিনি আমাদের দেবেন। আমরা 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' মনে করে বেতের লাঠিকেই বন্দুকরূপে গ্রহণ করি।

১৯৩৭ সালে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। ইংরাজ কিছুটা শাসন সংস্কার করে। তাদের কর্তৃত্ব বজায় থাকলেও বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করার ক্ষমতা ভারতীয়রা পেল।

নির্বাসিত রাজবন্দী আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ও মুক্তি দেবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। আমরাও দেশে প্রত্যাবর্তন ও মুক্তির দাবীতে সরকারকে এক স্মারক লিপি দিয়ে দাবী পূরণ না হলে আমরণ অনশনের সংকল্প ঘোষণা করলাম।

আন্দামান বন্দীরা দ্বিতীয়বার যে অনশন ধর্মঘট করেন তাতে আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

জেলের বাইরে দেশবাসীর ও জেলের ভিতরে বন্দীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে আন্দামান বন্দীদের মূল ভূখণ্ড ভারতে ফিরিয়ে এনে বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। সেটা ছিল ১৯৩৮ সাল।

ইতিমধ্যে আন্দামান সেলুলার জেলে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে গ্রেপ্তারের পর কারাদণ্ড দিয়ে বন্দীদের নির্বাসনে পাঠানো হতো। তাই আমরা ছিলাম ভারতের বিভিন্ন স্থানের গুপ্ত সমিতির সদস্য অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত, যেগুলি প্রদেশ বা জেলা অনুযায়ী বিভক্ত। আন্দামানে এসে একত্রে মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা করলেও এই বিভেদ সূক্ষ্মভাবে আমাদের মধ্যে কিছুটা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের আলাদা রান্নাঘর বা 'কিচেন' ছিল। আমি জেনারেল 'কিচেন'-এ আহার করতাম।

যে সময় রাজবন্দীরা পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে একই আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে জেলের মধ্যে 'কম্যুনিস্ট কনসলিডেসন' ব্লক গড়ে তুলেছেন,সেই সময় গদর পার্টির নেতা বাবা গুরুমুখ সিং বন্দী হয়ে দ্বিতীয়বার আন্দামানে আসেন। কলকাতা থেকে কম্যুনিস্ট নেতাদের পরিচিতি পত্র তিনি আনেন। তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা

তাঁর ছিল। তিনি এসেই 'কম্যুনিস্ট কনসলিডেশনের' সদস্য হলেও বন্দীদের পৃথক পৃথক আহার ব্যবস্থা দেখে তীব্র সমালোচনা করলেন। যারা দেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলবে, তাদের নিজেদের মধ্যে এই বিভেদ দেখে নিন্দায় মুখর হলেন। 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি' প্রবাদ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সকলকে উপদেশ দিলেন। তাঁর এই আত্মসমালোচনার নির্দেশ আমাদের জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন করাল। আমরা বুঝলাম বিপ্লবীদের 'Self criticism' রূপ যে অস্ত্র লেনিন দিয়ে গেছেন, তার সদ্ব্যবহার আমরা করিনি। তিনি বন্দীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্য গঠন করে দিলেন। আমরা মন্ত্র নিলাম—'জাগো নব ভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা!'

১৯৩৯ সালের ৩১ শে আগস্ট আমি জেল থেকে মুক্তি লাভ করি। বন্দী অবস্থা শেষ হয়ে আমার জীবনে শুরু হলো আর এক নতুন অধ্যায়।

* * *

(৩)

আন্দামান থেকে আমাদের ভারতে ফিরিয়ে আনার সময় জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল। আমাদের অবস্থা সাংঘাতিক হয়। জাহাজের খোলের মধ্যে সকলেই বমি করে গড়াগড়ি দিই। ঝড়ের জন্য জাহাজ কলকাতার দিকে আসতে না পেরে মাদ্রাজ বন্দরের দিকে যায়। নির্দিষ্ট তারিখের দু'দিন পরে জাহাজ কলকাতায় আসতে সক্ষম হয়।

আমাদের অবস্থা সঙ্গীন দেখে কিছুদিন আলিপুর জেলে মেডিক্যাল সুপারভিশানে রাখা হলো। একটু সুস্থ হতে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হলো।

রাজবন্দীদের জন্য দমদম জেলে নতুন করে সেল তৈরি করা হয়েছিল।। সেখানে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে রাখা হয়। প্রথমে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ও পরে আপীলে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত চট্টগ্রামের অম্বিকা চক্রবর্তীকেও এখানে এনে রাখা হয়। মুক্তির পর তিনি উদ্বাস্তু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং কলকাতার পথে মোটর চাপা পড়ে মারা যান। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। ফাঁসিতে যিনি শহীদ হতেন তিনি সাধারণ পথচারীর মতো দুর্ঘটনায় মারা গেলেন।

চট্টগ্রামের আর এক সংগ্রামী শান্তি চক্রবর্তী—পুলিসের রাইফেলের গুলিতে যাঁর বাহুমূল এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছিল—এই জেলে টাইফয়েডে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তারের নির্দেশ মতো তাঁকে সযত্নে শুশ্রূষা করার ভার নিলাম আমি ও কালীদা (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার, জালালাবাদ যুদ্ধ ও ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমনে অংশগ্রহনকারী কালিকিংকর দে)। শান্তি চক্রবর্তী একটু সুস্থ হতেই মুক্তির আদেশ পেলেন। কিন্তু তাঁকে দেশে নিয়ে যাবার জন্য আত্মীয় স্বজন কেউ এসে না পোঁছানোয় সেই দিনই মুক্তিপ্রাপ্ত সুশীল দে তাঁকে চট্টগ্রামে পোঁছে দেন। ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এইজন্য যে একত্রে বন্দী থাকার ফলে আমাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল এটা তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

দমদম জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি স্থির করলাম তিন-চার দিন কলকাতায় থেকে ডিব্রুগড়ে আমার মা ও দাদার সঙ্গে দেখা করে মানিকগঞ্জে গিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম ও প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবো।

কলকাতায় আমি কম্যুনিস্ট কর্মী গোপাল আচার্য ও সুবোধ রায়ের আস্তানায় উঠলাম। গোপালদা ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে আর সুবোধ রায় কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে কাজ করতেন। তখন তাঁরা থাকতেন হ্যারিসেন রোডের এক গলিতে ছোট একটি ঘরে। নিজেরাই রান্না করে খেতেন। কমঃ মুজফ্ফর আহমেদ তথা কাকাবাবু থাকতেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর এক বাড়ির তিন তলার একটি ঘরে। সুবোধ রায় আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—ছাড়া পেয়ে এখন কী করবেন ভাবছেন?

আমি বলি,—ঢাকা গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবো।

আমার কথা শুনে তিনি খুশি হয়ে বলেন,—যাঁরাই জেল থেকে বেরুচ্ছেন তাঁরা সবাই কলকাতাতেই কাজ করতে চান। আপনি অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিচিত এলাকার মানুষের মধ্যে কাজ করা সহজ।

ইংরাজের গোয়েন্দা বিভাগকে ধোঁকা দিয়ে আমি কলকাতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত করি। রাতে দার্জিলিং মেল ধরে আসাম রওনা হই।

শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে উঠার সময় টের পেলাম জেল থেকে বেরোবার পর যে গোয়েন্দাটি আমায় অনুসরণ করতে ছাড়েনি, সে যথারীতি পিছু নিয়েছে। পার্বতীপুর স্টেশনে ট্রেন বদলি করে যখন এক ইণ্টার ক্লাস কামরায় চাপলাম, তখন সেও সেই কামরায় উঠে আমার সঙ্গে ভাব জমায়। ভদ্রলোক গোয়েন্দা

বিভাগে চাকরি করলেও মনের ভেতর হয়তো একটু গোপন দেশপ্রেম ছিল। তাই স্বদেশী' আমার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গেই আলাপ করে। তার নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনায়। আসামের চায়ের কনসাইনমেণ্ট হতে নিয়মিত চায়ের পেটি সরানোর ষড়যন্ত্র তিনি ডিটেক্ট করেছিলেন। অনেকটা আমাদের রডা কোম্পানীর রিভলবার চুরির মতোই স্মাগলাররা নকল গাড়োয়ান ও গরুর গাড়ি নিয়ে স্টিমার ঘাট থেকে চা পাচার করতো। স্থানাভাব বশতঃ সে কাহিনীর বিশদ বর্ণনা হতে বিরত হলাম।

দিন পনেরো ডিব্রুগড়ে মা-দাদার কাছে কাটিয়ে আমি ঢাকায় এলাম। নারায়ন গঞ্জের চাষাড়ায় আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস। এক দোচালা টিনের ঘরে ছিল গরিমা সেন, নেপাল নাগ ও সতীশ পাকড়াশি নেতা ত্রয়ের আস্তানা। তাঁরা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড-ইউনিউয়ন গড়ে তুলছেন। আমি এসে সেই আস্তানায় জোটার প্রথম দিন রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত গরিমা সেন আমার 'অনারে' ডাল রান্না করলেন। নাহলে অন্য দিন তাঁরা 'ফিস ফাস' খেতেন। 'ফিসফাস' তাঁদের আবিষ্কৃত বিশেষ এক আহার্য বস্তু-- মোটা চালের সঙ্গে যা কিছু জুটতো, তা একসঙ্গে সেদ্ধ করে মাড় না গালিয়ে নুন লংকা সহযোগে আহার। 'ক্ষুধার শস' সহযোগে (ইংরাজিতে বলে 'হাঙ্গার ইজ দি বেষ্ট শস' তৃপ্তির সঙ্গে আমরা তাই খেতাম। তখন চায়ের কাপ ছিল দু পয়সা। নেপালদা 'মুখার্জী কাফের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলেন জেল খাটা আমরা যেন একটু কনসেশন পাই। তাই এক পেয়ালা চা খেতাম।

এইভাবে সে যুগে আমার ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টে কাজ করেছি।

নারায়নগঞ্জ থেকে ঢাকেশ্বরী মিলে গিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করে তুলি। নানা দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ঢাকেশ্বরী মিলে প্রথম ধর্মঘট করা হলো। মিলে তখন আর এস. পির ইউনিয়ন শক্তিশালী। তার কর্মকর্তা সাধন চ্যাটার্জী মালিক সূর্য বসুর প্রিয়পাত্র। মিল গেটে অবস্থানরত শ্রমিকদের আস্তানা নির্মানের জন্য তিনি মালিকপক্ষকে টেলিফোন করে ত্রিপলের ব্যবস্থা করেন। ধর্মঘটের সময় তিনি ও বারীন ঘোষ নামকা-ওয়াস্তে কিছু শর্ত নিয়ে মালিক পক্ষের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করেন। নেপালদার নেতৃত্বে আমরা মূল দাবী (পুজো বোনাস, মজুরী বৃদ্ধি, স্থায়ী চাকরি) নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার স্লোগান দিই। আমি, অনিল মুখার্জী (প্রাক্তন আন্দামান বন্দী), নেপালদা শ্রমিকদের মেসেই থাকি। শ্রমিকদের সঙ্গে থাকা—খাওয়া— দাওয়ারফলে তাদের মধ্যে আমাদের প্রভাব বাড়ে।

ওই মিলে দ্বিতীয় ধর্মঘটের সময় নেপালদা ও অনিল মুখার্জী আত্মগোপন করতে বাধ্য হন এবং আমার উপর exterment order তথা নারায়ন গঞ্জ থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়।

ঢাকায় পার্টি অফিসে কমঃ জ্ঞান চক্রবর্তীর কাছে যাই। সেখানে মানিক-গঞ্জের কমঃ প্রমথ নন্দীর সাক্ষাৎ পাই। আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় স্থির হলো সেই সময় মানিকগঞ্জই আমার কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত। পরদিন আমি মানিকগঞ্জ গেলাম।

আমি মানিকগঞ্জে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাদের মধ্যে সাম্যবাদের ভাবধারা প্রচার করি। বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কথা বলি। তখনও মানিকগঞ্জে কৃষক সংগঠন কিছু গড়ে ওঠেনি। ছাত্রদের মধ্যে স্টুডেন্ট ফেডারেশন সংগঠন গড়ার চেষ্টা চলছিল। ছোট একটি ঘর ভাড়া করে স্টুডেন্ট ফেডারেশন-এর অফিস চালায় ছাত্র বীরেন, কিরণ।

সংগঠন গড়ার কাজে লিপ্ত আমার নামে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। আমায় গা ঢাকা দিতে হয়। ছদ্ম নামে গোপনে ঘোরাফেরা করে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাই।

আত্মগোপন অবস্থায় একদিন বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করি। পুত্রের সঙ্গে বহুদিন অসাক্ষাতের ফলে পিতৃস্নেহ বশে তিনি বার বার আমায় বলেন রাতটুকু বাড়িতে কাটিয়ে যেতে, যাতে অন্ততঃ এক রাত্তিরের জন্য আমার বরাতে গৃহসুখ জোটে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারি।

বাবার একান্ত অনুরোধে আমি সেই রাতটা বাড়িতে কাটাতে রাজি হলাম। কিন্তু আমার এই ভুলের মাশুল দিতে হয়।

আমাদের পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে এক দফাদার আমাদের বাড়ির উপর নজর রাখতো। বাবা এটা জানতেন না। সেই দফাদার রাতারাতি থানায় খবর দেয়—আত্মগোপনকারী বাড়িতে এসেছে। ভোর রাতেই দারোগা নৌকা বোঝাই পুলিশ নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। বাবা নিজে জামিন দাঁড়িয়ে দারোগাকে অনুরোধ করেন আমাকে গৃহে বাস করার অনুমতি দিতে। আমার জন্য বাবার জামিন থাকায় আমি আপত্তি করে ব্যক্তিগত জামিনের কথা বলি। দারোগা ভাবেন ঢাকা জেলে ঘানি ঘুরিয়ে ও আন্দামানে কয়েক বছর কাটিয়ে আমার সব তোলানি ঘুচে গেছে। রস মরে যাওয়ায় আমি এখন বাড়িতে থেকেই

আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করতে চাই। তাই তিনি আমাদের মৌজার মধ্যেই আমার ঘোরাফেরা সীমাবদ্ধ রেখে এক অন্তরীন আদেশ জারি করে চলে যান।

দারোগা খেয়াল করেনি আমাদের মৌজা বলতে বেশ কয়েকটা গ্রাম বোঝায়। তাই আমার রাজনৈতিক কর্ম কিছুটা বাধা পেলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। সেই গ্রামগুলিতে সংগঠন গড়ে তুলে আমি আবার একদিন পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। দু' একবার পুলিশের খপ্পরে পড়লেও বুদ্ধি বলে সরে পড়ি। সেই সব মজার কাহিনী স্থানাভাবে উহ্য রাখলাম।

ইতিমধ্যে ভারতের ও পৃথিবীর রাজনৈতিক জগতে দ্রুত পট পরিবর্তন শুরু হয়। বিশ্ব যুদ্ধ বাধে। সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ত্যাগ করে জার্মানী গিয়ে প্রথমে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তারপর সেখান থেকে সাবমেরিনে জাপানে পেঁাছে, আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ন হন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত-ছাড়' শ্লোগান তোলে। দেশের বামপন্থী দলগুলি শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। মুসলিম লীগ দেশ ভাগ করে পাকিস্তান গঠনের দাবী তোলে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের স্লোগান তুলল, যার বাস্তব রূপ হচ্ছে বিপন্ন ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করা।

আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। এই পরিবর্তন শীল পটভূমিকায় এক বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীর কর্মধারা কী হবে? সংগ্রামের জন্য দেশপ্রেমিকের স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিস কী হবে? কম্যুনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধ তথা ইংরাজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের নীতি আমি নির্বিবাদে মেনে নিতে পারি না।

দেশত্যাগের আগে কংগ্রেস ত্যাগী সুভাষচন্দ্র মানিকগঞ্জে এসে বক্তৃতা দিয়ে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দলের পত্তন করে যান!

সে যুগের যুবকরা প্রধানত দু দলে বিভক্ত হয়। একদল নেতাজীর অনুগামী অন্যদল ফ্যাসিস্ট বিরোধী কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক। আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ—বিরোধ শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেটা খুনোখুনির পর্যায়ে পেঁাছায়। ঢাকায় এক মিছিলে উদীয়মান সোমেন চন্দ নিহত হলেন।

ঢাকা জেলে বন্দী আমার আন্দামানের বন্ধুরা—অনন্তদা-গনেশদা প্রভৃতিরা

জেল থেকেই ঘোষণা করলেন তাঁরা কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী হয়েছেন বলে 'জন-যুদ্ধের নীতিকে' সমর্থন করেন।

আমি মানিকগঞ্জে কম্যুনিস্ট পার্টির নামে এক বিবৃতি প্রচার করি। মূল বক্তব্য ছিল—"সব যুদ্ধের স্বরূপ একই রকম বলে জানা উচিত না। ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বাতিল করা উচিত নয়। স্বাধীনতার যুদ্ধকেই জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে অর্থাৎ বিদেশী শাসকদের হটিয়ে স্বাধীন ভারতের জনসাধারণই ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ করবে। উপরন্তু নেতাজীকে 'কুইসলিং' বলে মানতে পারি না। তাঁর দেশপ্রেম সকল সন্দেহের উর্ধে। তিনি কখনোই ফ্যাসিস্ট বা সাম্রাজ্যবাদী তথা জার্মান-জাপানের তাঁবেদার হতে পারে না।"

মানিকগঞ্জের কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনের সঙ্গে আমি প্রায় প্রথম থেকেই যুক্ত। ১৯৩৮ সালে প্রমথ নন্দী (ঢাকার শ্রীসংঘের ভবেশ নন্দীর খুড়তুতো ভাই) এখানে এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাম্যবাদে বিশ্বাসী এক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ঢাকার কমঃ জ্ঞান চক্রবর্তী ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা মানিকগঞ্জ থেকে দু' একজন সমর্থক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তখন কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস দলের ভেতরে থেকেই কাজ করতো, পৃথক দল হিসাবে বেরিয়ে আসেনি। মানিকগঞ্জের গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা ছিলেন নগেন ঘোষ, মনি ভট্টাচার্য ও প্রখ্যাত উকিল অরুন রায়। কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বিপ্লবী বন্ধু অপরেশ চৌধুরী। কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে সমর্থক সংগ্রহের চেষ্টা করেন জ্ঞান চক্রবর্তী ও প্রমথ নন্দী। এস. এফ সংগঠক ছাত্র বীরেন, কিরণ প্রমথদার পরামর্শে ছাত্রদের মধ্যে সমর্থক সংগ্রহ করে। নমতা গ্রামের গোপাল বোস, অমল দাসগুপ্ত, ইন্দু সান্যাল, নারায়ন ঘোষ, মাখন রায়, পেণ্টু (যোগেশ কুণ্ডুর পুত্র) প্রভৃতি আমাদের সমর্থক হয়। পরে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে ইন্দু ও নারায়ণ বাদে সবাই ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেয়, আর শৈলেন সেন (উকিল) তাদের আদর্শগত নেতৃত্ব দেন।

যাহোক, জনযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ওই বিবৃতি প্রচারের পর আমার ঢাকায় ডাক পড়ে। তার আগে ঢাকা পার্টির সেক্রেটারী জ্ঞান চক্রবর্তী মানিকগঞ্জে এসে আমার ও প্রমথ নন্দীর সঙ্গে আলোচনা করেন, কিন্তু তিনি আমাদের stand টা

বুঝতে সক্ষম হন না। ঢাকায় গিয়ে কমঃ গোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে আমি নেপালদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেশ কয়েকদিন আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। বিতর্কের বিষয় হয়—মানিকগঞ্জ কম্যুনিস্ট পার্টির নামে বিতরিত ইস্তাহারের অর্থ কী? মানিকগঞ্জের পার্টি কি আলাদা পার্টি? ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি কি এক মনোলিথিক পার্টি নয়? ফ্যাসিস্টরা যুদ্ধে জিতলে তারা কি ভারতকে স্বাধীনতা দেবে? জাপান কি ভারত অধিকারের সুযোগ ছেড়ে দেবে? নেতাজীকে ফ্যাসিস্টরা শিখণ্ডি রূপে সামনে খাড়া করে সংগ্রাম করছে? আমি কি কম্যুনিস্ট পার্টিতে থাকবো, না বেরিয়ে যাবো, না বিতাড়িত হবো?

নেপালদার আমি খুব আস্থাভাজন ছিলাম। ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মীদের আক্রমণের সময় আমি তাঁর বডিগার্ড ছিলাম। তিনি বৃদ্ধের ছদ্মবেশে ঘুরে সংগঠন করতেন—মুখে বড় দাড়ি, হাতে লাঠি, দুর্বল ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠস্বর নিয়ে পুরো বৃদ্ধ হয়েছিলেন। রমেশবাবুর বাসায় গিয়ে পরিমল চক্রবর্তী প্রভৃতির সাহায্যে যুবক কমরেডদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিতেন আর আমি একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে দেহরক্ষী রূপে একটু দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করতাম।

ঢাকায় আলাপ-আলোচনা সেরে আমি মানিকগঞ্জে ফিরে এলাম। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে আমায় বিতাড়িত না করে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়। আমায় জানানো হয়েছিল যে আমার আন্দামানের সঙ্গীরা জেল থেকে যে বিবৃতি দিয়েছেন জনযুদ্ধের সমর্থনে সে সম্পর্কে আমি তাঁদের কিছু বলতে চাইলে গোপন সংযোগ সূত্রের দ্বারা তাঁদের জানানো হবে। আমি তাদের এক চিঠিতে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে লিখি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের কাজ হচ্ছে স্বাধীনতার সংগ্রামকেই জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করে স্বাধীন ভারতে শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন। পরে টের পাই আমার সেই চিঠি আমার বিপ্লবী কমরেডদের হাতে পৌঁছায়নি।

আমাকে না জানিয়ে মানিকগঞ্জে অভয় চ্যাটার্জী নামে একজনকে পাঠানো হয় —'জাপানীদের বাধা দেওয়ার জন্য গ্রামে গঞ্জে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।' আমাকে বাদ দিয়ে তিনি এখানকার কমরেডদের সঙ্গে 'জনযুদ্ধের ব্যাপারে' আলাপ আলোচনা করেন। সম্ভবতঃ পার্টির জেলা নেতৃত্ব তাকে সেই নির্দেশ দিয়েছিল।

প্রমথ নন্দী ও আমার কাছে এই অঞ্চলের কমরেডরা সমর ঘোষকে বাদ দিয়ে এই হাস্যকর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অভিযোগ জানাতে থাকে।

প্রমথ নন্দী জেলা নেতৃত্বকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে সমরকে বাদ দিয়ে মানিকগঞ্জে কিছু করা সম্ভব নয়। মানিকগঞ্জের প্রায় সব জায়গার সংগঠন সে গড়ে তুলেছে। আজকের কমরেডরা সে যুগের এই পুরানো মানুষটাকেই স্থানীয় নেতা হিসাবে দেখে। তাকে ও তার অনুগামীদের বাদ দিয়ে এখানকার কারা গেরিলা যুদ্ধ করে জাপানকে রুখবে? কাজেই কোন হাস্যকর প্রচেষ্টা এখানে করবেন না।

আমি ওই মতভেদের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের ধারণা অনুযায়ী মধ্যবিত্ত, কৃষক ও তাঁত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাই। কিছুকাল পরে শুনি অভয় চ্যাটার্জী পার্টি বিরোধী চক্রান্তের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং পুলিশের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল।

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। এই সময় আমার পিতৃবিয়োগ হয় আসামে। আমি সেখানে গিয়ে শ্রাদ্ধাদি করে আবার মানিকগঞ্জে ফিরে আসি। বিভিন্ন গ্রামে গা ঢাকা দিয়ে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলি।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। ম্যালেরিয়াও মহামারীরূপে দেখা দেয়। ঘিয়র ও তেরশ্রী অঞ্চলের গ্রামের প্রতি ঘরের দরিদ্র লোকেরা ব্যাধি ও অনশনের কবলে পড়ে। আমরা সেবা ও ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করি। প্রমথ নন্দীর নির্দেশে কলকাতা থেকে চিকিৎসক দল আনি। একদল ছাত্র ও ডাক্তার নিয়ে আমি মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করি। এই সময়ের মানিকগঞ্জ সম্পর্কে শত্রুজিৎ দাশগুপ্তের 'সতু বদ্যির ডাইরী' গ্রন্থে কিছু বর্ণনা ও তথ্য আছে। আমার নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসক দল গ্রামে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতো বলে আমাকে সাধারণ মানুষ এক বড় চিকিৎসক বলে মনে করতো। ডাক্তাররা যেমন কুইনাইন ইনজেকশন দিতো, আমাকেও তেমনি ইনজেকশান দেবার অনুরোধ করতো। আমি ডাক্তারদের কাছ থেকে কুইনাইন ইনজেকশনের কৌশল শিখে নিয়ে 'সহস্রমারী চিকিৎসক, হবার চেষ্টা করি। কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের চিকিৎসার ফল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমে। জনসাধারণের মধ্যে আমাদের কাজ দেখে যে সব বৃদ্ধিষ্ণু ব্যক্তি আমাদের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা সমর্থক হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। যে সব জোতদারের গোলা জোর করে দখল

করে চাষীদের মধ্যে ধান বিলিয়েছি, তারা সেই ধান তাদের দান হিসাবেই ঘোষণা করল। আমাদের সংগঠনের শক্তির অনুপাতে প্রভাব খুব বেশী হয়ে উঠল।

তারপর আমি মানিকগঞ্জের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল তাঁতশিল্পীদের নিয়ে এক বিরাট সংগঠন গড়ে তুলি। কমরেড গোপাল বসাকের প্রচেষ্টায় ঢাকা আর্টিজান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ গঠিত হয়। তদানীন্তন সারা ভারত বস্ত্র সংকটের দিনে আমাদের এই কো-অপারেটিভ ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা সুতার হ্যাণ্ডলিং এজেন্সি থেকে বস্ত্র নির্মাণ ও তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতো। কায়েমী স্বার্থের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের প্রতিষ্ঠান কব্জা করতে না পেরে আমাদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

পাকিস্তান কায়েম হলে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে এক মিথ্যা হত্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করা হয়। ১৯৪৮ সালে এই মামলার বিচার সেসান-কোর্টে হয়। আমার মামলা পরিচালনা করেন প্রাক্তন মুসলীম লীগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট লতিফ সাহেব। কেসে প্রমাণিত হয় আমি নির্দোষ এবং সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পাছে আমি কেস করি সেজন্য পুলিশ 'পাকিস্তান সিকিউরিটি অ্যাক্টে' আমাকে মামলায় খালাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গ্রেপ্তারের মতলব আঁটে। লতিফ সাহেবের সাহায্যে আমি জজের খাস কামরার মধ্যে দিয়ে কোর্ট থেকে পালিয়ে যাই।

পুলিশ ও আনসার বাহিনীর কবল থেকে আমায় মুসলমান তাঁতি ও চাষিরাই রক্ষা করে। তাদের সাহায্যেই আমি আত্মগোপন করে সংগঠনের কাজ চালাতে সক্ষম হই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সারা দেশ জুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙগা হলেও মানিকগঞ্জে কখনো হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়নি।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন পাকিস্তান সরকারের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে রাজনীতি সচেতন হিন্দু বন্ধুরাও যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমার হিন্দু-মুসলিম সাহায্যকারী বন্ধুদের কিছু নাম আজও স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে। তাঁরা হচ্ছেন মনীন্দ্র ভৌমিক, জগদীশ সরকার, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অপরেশ চৌধুরী, আমার সহপাঠি কানাই, দানিজপুরের খালেক সাহেব, মাতব্বর রহমতুল্লা, গোবিন্দপুরের নজর আলি, সাফে আলি, ওসমান, মোহাম্মদ আলি, গোপাল-খালির মাদারী শেখ (যে আমাকে 'বাপজান' বলে সম্বোধন করতো)। আমাকে

গ্রেপ্তার করতে এলে মুসলমান সাহায্যকারীরা পুলিশের নৌকা তাদের অসংখ্য ডিঙি দিয়ে ঘিরে আমাকে পালাবার সময় দিত।

১৯৫০ সালে পরিস্থিতি খুব সংকটজনক হয়ে উঠায় তারা আমাকে দেশ-ত্যাগের উপদেশ দিল। তাদেরই সাহায্যে আমি পাকিস্তান ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসি। আমার স্ত্রী করুণাও পালিয়ে ঢাকা থেকে চলে আসে।

সেই সময় অনন্তদা দুই বাংলাকে এক করার জন্য 'ইউনাইটেড বেঙ্গল ফ্রন্ট নামে এক দল গড়েন। চট্টগ্রামে ত্রিশ দশকের অভ্যুত্থানের মতোই পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রধান শহরে জাতীয়তাবাদী হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তিনি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। নানা কারণে তাঁর পরিকল্পনা সফল হয় না। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান এই ধরণের পরিকল্পনা দ্বারাই পূর্ব পাকিস্তান বিলোপ করে স্বাধীন বাংলা দেশ গঠন করেন।

এই সময়েই হঠাৎ একদিন কলকাতার ট্রামে প্রাক্তন আন্দামানবন্দী জালালাবাদের যোদ্ধা সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বর্ধমান জেলার কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী এবং তখন আত্মগোপন করে আছেন। তাঁকে আমার বাড়ি নিয়ে মা-ভাই স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বছর দুয়েক সুবোধদার আত্মগোপনের আর কোন অসুবিধা হয় না। ভারতের শাসনতন্ত্র গঠিত হলে তিনি কাটোয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জিতে এম. এল. এ হন। তাঁর নির্বাচনে আমি ও আমার স্ত্রী কাটোয়ায় গিয়ে কাজ করেছিলাম।

সুবোধ চৌধুরী আমায় রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য বর্ধমান জেলায় নিয়ে যান। সেখানে আমার পরিচয় হয় হরেকৃষ্ণ কোঙার, শিবশঙ্কর চৌধুরী (কালোদা), ললিত হাজরা, বিজয় পাল, শশাঙ্ক চ্যাটার্জী, ডঃ হরমোহন সিংহ প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে। আমার আন্দামানের বন্ধু বিরাজ দেবও এই জেলাকে তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছেন।

ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি বিপ্লবীদের স্মৃতিরক্ষার্থ নানা কাজে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ঘুরতে বাকি রাখিনি।

ক্রমশঃ শরীর অক্ষম হয়ে আসছে। প্রাক্তন সাথীরা একে একে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমার জীবন সঙ্গিনী করুণাও চলে গেছে। তবু মনের দিক দিয়ে যতটা সজীব থাকা যায় তার চেষ্টা করি। আজও বিভিন্ন সভাসমিতিতে যাই। আপনাদের অনুরোধে আজও কলম ধরার চেষ্টা করি। যতটুকু বললাম তার থেকে না বলাই অনেক বেশি রয়ে গেল।

[অনুলিখন—মনোরঞ্জন ঘোষ]

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত জলধর পালের ডায়েরী থেকে

শ্রীমতী কণা পাল

ময়মনসিংহ জেলার (বাংলাদেশ) জামালপুর মহকুমার সেরপুর পরগণার অন্তর্গত নালিতাবাড়ী গ্রামে এক দরিদ্র কুম্ভকার পরিবারে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমার জন্ম। চার ভাই ও তিন বোন। বাবা সামান্য আবাদী জমি থেকে কিছু ধান পেতেন ও হাঁড়ি পাতিলের ব্যবসা-করে কোন রকমে কষ্ট করে সংসার চালাতেন। দাদারা বড় হয়ে ব্যবসা ও ধান-চালের কারবার করে সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আনেন।

আমাদের গ্রামটা আসাম সীমান্ত থেকে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামের পাশ দিয়ে খরস্রোতা ভোগাই নদী বয়ে গিয়েছে। বড় তিন দাদা লেখাপড়া করার কোন সুযোগ পাননি। সবাই সামান্য লেখাপড়া করেন। তাই ছোটকালে আমাকে ভোগাই নদীর ওপারে শিমুলতলা গ্রামে এক প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেয়। বর্ষাকালে সেই খরস্রোতা ভোগাই নদী আরও প্রবল হত। আমাকে নিজে নৌকা বেয়ে নদী পার হয়ে স্কুলে যেতে হত। স্কুল থেকে ফিরে এসে অনেক কাজ আমাকে করতে হত। আমি পাঠশালায় পড়তাম আর ঐ অল্প বয়সেই দাদাদের সাথে কাজ করতাম।

পাঠশালার পড়া শেষ করে এগার বৎসর বয়সে বাড়ী থেকে দেড় মাইল দূরে নালিতাবাড়ী বাজারে মাইনর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আমি ভর্তি হই। ঐ স্কুলে আসার পর থেকেই আমার অনেক নূতন অভিজ্ঞতা হতে শুরু করল। স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় খুব কড়া লোক ছিলেন। তিনি সর্বদা ছাত্রদের শাসনে রাখতেন। কিন্তু আমাদের নিচের ক্লাসে পড়াতেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ঘোষ মহাশয়, খুব অমায়িক লোক ছিলেন! তিনি খদ্দরের জামা কাপড় পরতেন। স্কুল ছুটির পর প্রায়ই দেড়মাইল পথ হেঁটে আমাদের সাথে আসতেন এবং নানারকম গল্প করতেন,—যেমন—ইংরেজরা কিভাবে এল, তাদের অত্যাচার এবং ইংরেজদের তাড়াবার জন্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য কি কি আন্দোলন হচ্ছে। আমরা বিশেষ কিছু বুঝতাম না।

ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালে নখলা, চন্দ্রকোনা থেকে একদল ছেলে এল মাথায় সাদা টুপি ও তেরঙ্গা পতাকা হাতে। ক্ষিতীশবাবু আমাদের ডেকে তাদের

সাহায্য করতে বললেন। আমরা তাদের নিয়ে নিজ পাড়া, ঘাকপাড়া ও তন্তর গ্রামে চাঁদা ও মুষ্টিভিক্ষা তোলার জন্য গেলাম। ক্ষিতীশবাবু ও অন্যান্যদের সাথে একদিন মদের দোকানে পিকেটিং করতে যেয়ে পুলিশের হাতে খুব মার খেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে একদিন স্কুলে গিয়ে শুনি বিনোদ পালের বাসায় অন্নদা পাল নামে এক ভদ্রলোক রিভলবার সহ ধরা পড়েছেন। বিনোদ পালকে ধরে নিয়ে গেছে। সেদিন বাজারে খুব হৈ চৈ। হেডমাস্টার মহাশয় আমাদের কোন কিছুতে যেতে নিষেধ করে দিলেন। কিছুদিন পর ক্ষিতিশবাবুকেও পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় —তার প্রতিবাদে আমরা সেদিন স্কুলে যাইনি। এইখানেই রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেমে আমার হাতে খড়ি এবং ক্ষিতীশ ঘোষ মহাশয় আমার শিক্ষাগুরু।

আমি ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করার পর আমাকে বাড়ী থেকে পনের মাইল দূরে সেরপুর টাউনে ভিক্টোরিয়া একাডেমীর সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। সেরপুর টাউন থেকে দেড় মাইল দূরে সেবী পাড়ায় পিসিমার বাড়ীতে থাকতাম। রোজ হেঁটে স্কুলে যেতাম। ভিক্টোরিয়ায় ভর্তির পর এক বিপদে পড়লাম। শহরের ছেলেদের সাথে কিছুতেই খাপ-খাওয়াতে পারতাম না। সেরপুর টাউন জমিদার প্রধান জায়গা। এখানে সব জমিদার ও তালুকদারদের টাকার উৎস ছিল আমাদের গ্রামাঞ্চল থেকে খাজনা ও বেআইনী টাকা পয়সা আদায়। ভিক্টোরিয়া একাডেমী ছিল 'নয়ানী' জমিদারদের। যারা ছিল সে সময় ব্রিটিশ সরকারের এক নম্বর দালাল। স্বদেশীর নাম উচ্চারণ করা ছিল ঘোরতর অপরাধ। ১৯৩২ সালে আমাদের পাশের বাড়ীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে জিতেন মৈত্র কাশী থেকে বাড়ী আসেন। আমি সেরপুর স্কুলে পড়ি জেনে তিনি আমার সাথে দেখা করে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা বলেন। তাঁর কাছে সীতানাথ দের ব্রহ্মচারীর) নাম শুনি ও সেবীপাড়ার মনমোহন চক্রবর্তীর কথা ও গোপনে তাঁর অনেক কাজের কথা শুনি। একদিন জিতেন মৈত্র ও মনমোহন চক্রবর্ত্তী আমার পিসিমার বাড়িতে আসেন। তখন ১৯৩৪ সাল, আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। তাঁরা দুজন আমাকে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে কাজ করতে বলেন। অনুশীলন সমিতির যাঁরা সেরপুরে আছেন তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার কথাও বলেন। উনারা কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, এই রকম চিহ্ন নিয়ে যদি কেউ আসে তবে যেন তাদের থাকার ব্যবস্থা করি। আমি তখন নূতন উৎসাহে রাজী হই, এবং

যখন যেখানে যেতে বলেন সেইভাবে যাই। এইভাবে তাঁরা আমাকে দলের বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও সহরের অনুশীলন সমিতির কোন লোকের সাথে পরিচয় হয়নি।

১৯৩৫ সালে অষ্টম শ্রেণী থেকে পাশ করে নবম শ্রেণীতে উঠে নূতন ক্লাসের পড়াশোনাও শুরু করি। একদিন সকালে উঠে দেখি লাল পাগড়ি ও সাদা পোশাকের পুলিশ পিসিমার বাড়ীটা ঘেরাও করে রেখেছে। কাউকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। পুলিশ দাদাদের কাছে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি স্নান খাওয়া সেরে স্কুলের জন্য তৈরী হয়েছি এমন সময় আমাকে পুলিশের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। অফিসার বলল—"খোকা তুমি তো স্কুলে যাবে, তবে আমাদের গাড়ীতেই চল। থানায় গিয়ে একটা সই দিয়ে স্কুলে যাবে।" আমি সরল বিশ্বাসে তাদের সাথে চললাম। আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে দাদাদের পুলিশ বিদায় করে দিল ও আমাকে হাজতে নিয়ে ভরল। তখন আমার বয়স সতের বছর।

বেলা এগারোটা নাগাদ আমার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দাঁড় বেঁধে সেরপুর কোর্টে নিয়ে গেল। রাস্তায় ও কোর্টে আমাকে দেখার জন্য প্রচুর ভিড় হল। তখন কিরণ চৌধুরী ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনিই নয়ানী বাড়ীর জমিদার, যাঁর স্কুলে আমি পড়ি। আমি ভিক্টোরিয়া একাডেমীর ছাত্র শুনে তিনি রেগে আগুন। আমি কিছুই করিনি বলাতে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করলেন। এভাবে সাতদিন রেখে আমাকে কলকাতায় চালান দিল। কলকাতার বরানগর থানায় এক ছোট্ট কোঠায় আমাকে বন্ধ করে রাখল। রাত্রে বের করে এনে নানারকম জিজ্ঞাসা করত, কে আমার কাছে আসত, কি নাম, অনুশীলন অর্থ কি ইত্যাদি। এভাবে সারা রাত্রি বিরক্ত করত। আমি কিছু জানিনা বলায় মারধোর ও অত্যাচারের ভয় দেখাত। ঐ ছোট্ট কোঠার মধ্যে আমাকে খাওয়া-দাওয়া ও প্রস্রাব সবই করতে হত। স্নান করতে দিতনা। ভীষণ মশার উপদ্রব ছিল। সারারাত বসে মশা তাড়াতে হত। মশার কামড়ে সারা শরীরে ঘাঁ হয়ে গিয়েছিল। পনের দিন এখানে রাখার পর আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠায়।

আলিপুরে এসে দেখলাম এখানে আমার মত আরও কয়েকজন রয়েছেন। আমার এই অবস্থা দেখে প্রফুল্ল দা (প্রফুল্ল সেন) সাবান দিয়ে ঘাঁ গুলি পরিস্কার করে তাঁদের নিজেদের জামাকাপড় পরিয়ে দিলেন। এই ঘটনায় আমার মানসিক

অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন হল। সবার ছোট বলে—অজিতদা, মাখনদা, দেবপ্রসাদ দা ও সৌরেন দা আরও অনেকে খুব যত্ন করে খাওয়াল ও নানারকম গল্প করে উৎসাহিত করল। আলিপুর জেলে যাওয়ার পর আমি প্রথম জানতে পারলাম আমাকে 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায়' গ্রেফতার করা হয়েছে। টিটাগড়ে প্রফুল্ল সেন ও পারুল মুখার্জী গ্রেপ্তার হওয়ার সময় সশস্ত্র সংগ্রামের অনেক কাগজ পত্র পায়, সেই সূত্র ধরে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী অনুশীলন সমিতির কর্মীদের গ্রেফতার করার জন্য সরকার বিরাট অভিযান চালায়। আমার নাম ও ঠিকানা সেখানেই পায়।

অজিতদা, দেবপ্রসাদ দা ও সৌরীন দা আমাকে পড়াশুনা করাতেন। এখানেই আমার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন এল। ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, কর্তব্য নিষ্ঠা, চরিত্র গঠন ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমি নতুন মানুষে পরিণত হলাম। এইভাবে আলিপুর জেলে দশমাস কাটাবার পর হঠাৎ জেল গেটে ডেকে নিয়ে আমাকে মুক্তির আদেশ দেয়। কিন্তু তখনই B C. L. A এ গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যায়। সেখানে জেলের ভিতর অন্য অবস্থা। কেউ ব্যাডমিন্টন খেলছে, কেউ গল্প করছে। সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য মশারি, তোষক, কাপড়, গামছা, বালিশ, চাদর সব এল। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। এখানে বিপ্লবীদের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে মানসিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। এখানে প্রত্যেক বিপ্লবী দলের আলাদা আলাদা ওয়ার্ড ছিল। এখানে রাজনৈতিক আলোচনা ও পড়াশুনা চলত, মার্কসবাদ নিয়েও আলোচনা হত। এখানে আমাকে বেশীদিন থকতে হয়নি। আমাকে পাবনা জেলার 'সারা' থানায় পাঠায়। এখানকার বন্ধুরা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে বলে দেয়।

'সারা' থানার পাশে আলাদা আলাদা তিনটি ঘর ছিল। সেখানে আমি, সুবোধ ঘোষ ও ব্রহ্মদাস তালুকদার ছিলাম। পরে সেখানে আরো দু'জনকে আনা হল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভূপেন দে। আমি ও ভূপেন এখান থেকেই ১৯৩৭ সালে Matriculation পরীক্ষা দেই। ভূপেন দে ও আমি ছিলাম কম্যুনিস্ট। আমরা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের বোঝাতাম ও তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতাম। আমাদের মাসিক ভাতা থেকে পার্টিকে সাহায্য করতাম। কর্তৃপক্ষ সব জেনে যায় ও দু জনকে দুই জায়গায় পাঠিয়ে দেয়।

আমাকে সাঁইথিয়া পাঠায়। তখন রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য বাইরে খুব

আন্দোলন হচ্ছিল। তার ফলে "গান্ধী আর-উইন চুক্তি" হয় এবং দফায় দফায় রাজবন্দীদের ছাড়তে থাকে। দ্বিতীয় দফায় ১৯৩৭ সালে আমার মুক্তির আদেশ হয়। পুলিশ পাহারায় আমাকে সেরপুরের সেবী পাড়ার পিসিমার বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। পরদিন থেকেই নালিতাবাড়ী থানায় রিপোর্ট করতে আদেশ দেয়।

পরদিন নালিতাবাড়ী থানায় পৌঁছবার পর সেখানকার তিনজন রাজবন্দী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দাশগুপ্ত, সুরেন দত্ত ও অন্য একজন থানায় আমার সাথে কথা বলেন। জেল খানায় পড়াশোনা. আলাপ আলোচনা—বিশেষ করে রাজবন্দী অবস্থায় মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান হওয়ায়—আমি গ্রামে একজন উন্নত মানের ছেলে বলে পরিচিত হলাম। কয়েকদিন পর সুরেনবাবু ও কুঞ্জবাবুর সাথে যোগাযোগ করে এবং তারাগঞ্জ বাজারের ননী সাহা, শচী রায়, রাজেন্দ্রনাথ এদের মাধ্যমে পার্টি গঠনের কাজে অগ্রসর হতে লাগলাম।

বাড়ী আসার পর কতগুলি নূতন সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের সমাজ খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ। আমি মুরগী খাই, লুঙ্গি পরি, জাত বিচার নাই ইত্যাদি বলে গ্রামের মাতব্বররা আমাকে সামাজিক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল। আমি এই সবের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দেখিয়ে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করি। তারা আমার সঙ্গে যুক্তিতে পেরে ওঠেন না। গ্রামের কিছু ছেলে আমার সংগে যোগ দেন। বয়কটও বাতিল হয়ে যায়। বাড়ীর কোন কাজে না থাকায় এবং আর্থিক সমস্যায়, দাদারা নানা কথা বলতে শুরু করে। আমি বাড়ী থেকে চলে গিয়ে পড়াশুনা করার সিদ্ধান্ত করি। 'সারা' থানায় থাকবার সময়ে বন্ধু ভূপেনের ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করি। ভূপেনের ওখানে কয়েকদিন থাকার পর ভূপেনের বাবাকে থানায় ডেকে নিয়ে খুব শাসায়। ভূপেন টাকা জোগাড় করে আমাকে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সাউথ সুবার্বন রোডে ভূপেনের কয়েকজন বন্ধু থাকত। চিঠি দিয়ে সেই ঠিকানায় পাঠায়। আমি, ভূপেন ও আরও একজন একসাথে থাকতে শুরু করি। একজন টিউশনি করে কিছু টাকা পেত, তাই দিয়েই কোনরকমে চলত। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাস্তায় সুবোধদার সঙ্গে দেখা হয়। সুবোধদা কালী টেম্পল রোডে একটা মুদি দোকান দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। আমাকে সেই দোকানে কাজ করবার জন্য বলেন। সারাদিন মাল দিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতাম। দোকানে কাজের জন্য সভা সমিতিতে বেশী যেতে পারতাম না। হঠাৎ একদিন রাস্তায় রাজবন্দী অজিত মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি

তখন পুরোপুরি কম্যুনিস্ট। ছেলেদের নিয়ে ক্লাস করেন। আমি সময় পেলেই অজিত মজুমদারের ক্লাসে যেত শুরু করলাম। সেখানেই প্রথম আমি লিয়নটিভের 'Political Economy' পড়ি। কিছুদিন ক্লাস করার পর রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিই। সেই অনুযায়ী কমরেড মুজাফফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করে আসামে চা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার মনোভাব প্রকাশ করি। দোকানে সুবোধদাকেও আমার সিদ্ধান্ত বলি। তাঁরা খুব আপত্তি করেন। কিন্তু দোকানদারি করে চোরা ব্যবসার দ্বারা মানুষকে ঠকাতে রাজি হইনা। আবার মুজাফফর সাহেবের কাছে যাই, তিনি ধীরেন ধরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আসাম যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে বলে দিলেন। দুই তিনদিন ঘোরার পর কিছুই না হওয়ার মাথায় এল সুভাষবাবু তো অনেককে সাহায্য করেন। এ কথা ভেবে এলগিন রোডের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু তাঁর সেক্রেটারী দেখা করতে দেন না। মুক্ত রাজবন্দীরা চাকরির জন্য যেত বলেই দেখা করতে দিতনা। দুদিন ঘোরার পর তৃতীয় দিন মরীয়া হয়েই দেখা করতে গেলাম এবং সেক্রেটারীকে একটা স্লিপে লিখে দিলাম আমি দেশের জন্য কাজ করতে চাই, চাকরির জন্য আসিনি। প্রায় একঘণ্টা বসার পর সেক্রেটারী আমাকে ডেকে নিয়ে একটা সুন্দর ঘরে বসালেন। কিছুক্ষণ বসার পর সুভাষবাবু এলেন। আমাকে সব জিজ্ঞাসা করলেন। খুশী হয়ে সবরকম সাহায্যের কথা বললেন। কাকে চিনি জিজ্ঞাসা করাতে মুজাফফর সাহেবের নাম বলি। তখন সুভাষবাবু তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি আনতে বলেন। সেদিন তাঁর এই সুন্দর চেহারা, সুন্দর ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

তখন কংগ্রেস অধিবেশনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি আসছে। ভূপেনও বরিশাল থেকে এসেছে ; তার সাথে আমার দেখা হয়। ভূপেনকে আমার সব কথা বললাম। তিনি খুব উৎসাহ দিলেন এবং টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করলেন। সেই টাকা পেয়ে বাড়ী যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। বাড়ী যাওয়ার পথে সেরপুরের পরিমল দত্তর সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে প্রেসিডেন্সী জেলে পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে পুলিন বকসীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। পুলিশ বকসী তখন সেরপুরের একজন নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্ট। তিনি আমাকে বুঝালেন রাজনীতি করতে হলে নিজের জন্মস্থান থেকেই শুরু করা ভাল। কাজেই আপনি নালিতাবাড়ী থেকেই কাজ শুরু করুন, আমরা সাহায্য করব।

নালিতাবাড়ি পৌঁছে তারাগঞ্জ বাজারের ননী সাহা, রাজেন নাথ, শিবাজী মুখার্জী, শচী রায় এদের সাথে দেখা করি। আমি যাওয়ার পূর্বেই ময়মনসিংহের খোকা রায়, আলতাব আলী, শেরপুরের রবি নিয়োগী ঘাকপাড়ায় সভা ও বৈঠক করছেন। আমি নালিতাবাড়ী থেকে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সবাই খুব উৎসাহিত হয়। তখন পার্টি বেআইনী। কংগ্রেসের নামে পার্টি কর্মীদের কাজ করতে হয়। সেই অনুযায়ী আমি কংগ্রেসের জগবন্ধু কর্মকার মহাশয়ের সঙ্গে সেখা করে উনার সাহায্যে ও বাজারের বন্ধুদের সহায়তায় তারাগঞ্জ বাজারে কংগ্রেস অফিস করি। বয়স কম, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা না থাকায় সাহায্যের জন্য পনের মাইল হেঁটে সেরপুর আসতে হত। তখন সেরপুরের জিতেন সেন, প্রমথ গুপ্ত, হেমন্ত ভট্টাচার্য, রবি নিয়োগী, বিমল ভট্টাচার্য এবং ধীরেন গুহ মজুমদার ও আরো অনেকের সাথে পরিচয় হয়। তাঁদের কাছে সব জেনে নূতন উৎসাহে কাজ শুরু করি। তখন থেকেই আমি সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমার স্বাস্থ্য ও বাল্যকালের কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা আমাকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করবার সহায় হয়। হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী থানার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ শুরু করি। এই সব অঞ্চলে তখন হিন্দু মহাসভা ও কোন কোন জায়গায় কংগ্রেস ও বিদেশী মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আমি কৃষক সমিতি ও কম্যুনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রামে হাজং, ডালু, কোচ, বানাই সম্প্রদায়ের যুবকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করি ও বিভিন্ন পুস্তিকা তাদের পড়তে দিই। পাড়ার ছেলেরা পার্টির সমর্থনে আসেন।

মানুষের প্রতিটি সমস্যায় আমরা এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। মানুষ ও কোনও সমস্যা দেখা দিলে আমাদের কাছে আসত কারণ তারা জানত আমরা তাদের পাশে দাঁড়াব। প্রথম যখন আদিবাসী গ্রামে যাই তখন তাদের ভাষাই বুঝি না। বিছানা চোলাইয়ের গন্ধে ভরা, রান্না করতে পারে না। হলুদ, লঙ্কা বেঁটে শুটকী মাছ, কাছিমের মাংস খায়। ক্ষার ছিল তাদের রান্নার মাধ্যম। এই অবস্থা থেকে তাদের শিক্ষিত করে কম্যুনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির কাজে টেনে আনতে হয়েছে। তখন রাত দিন ওদের সাথেই কাটাতাম। তাদের যে সমস্ত প্রধান সমস্যা—লেখাপড়া, দুঃস্থদের চাষের সময় সাহায্য করা, কাঁপড় বোনার সুতো সংগ্রহ করা, মার্কসবাদ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এই সমস্ত কাজে দিনরাত্রি লেগে থাকতাম। প্রায় সব গ্রামেই কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছে।

'ধর্মগোলা' প্রথায় চাষ প্রতি গ্রামেই শুরু হয়েছে। গ্রামের আদিবাসী সমাজের হাজং, কোচ, ডালু, বানাই, গারো সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ, বয়স্ক, যুব সমাজ এগিয়ে এসেছে। আমি পলাতক হিসাবে তাদের মধ্যে আসতাম। রাতের অন্ধকারে শহরে ঢুকে করণীয় সব কাজ করতাম। তখন আমরা ইচ্ছা করলেই হাজার হাজার ভলান্টিয়ার সমাবেশ করতে পারতাম। গ্রামের পর গ্রাম তখন সবাই আমাকে আপন করে নিয়েছিল। মহিলারা আমাকে আদর করে নাম দিয়েছিল 'হুলাং' অর্থাৎ 'ঝড়'। কারণ দ্রুত চলাফেলা করতাম আর কখন কোথায় থাকতাম তা কেউ জানতে পারত না। তারাগঞ্জ বাজারে আমরা একটা কংগ্রেস অফিস করি এবং কংগ্রেসের নামেই আমরা কাজ করি। মুষ্টিভিক্ষা ও সাহায্যের উপর আমাদের খরচ চলত। নানারকম মামলা মোকদ্দমার জন্য গ্রামের কৃষকদের সেরপুর যাওয়ার পথে এই অফিসে থাকতে হত। আমাদের বাড়ীর উত্তরাঞ্চলে হাজং, কোচ, ডালু, বানাই, মুসলমান ও ক্ষত্রিয়দের বাস। জমিদাররা সরলপ্রাণ আদিবাসী কৃষকদের বিভিন্নভাবে ঠকাত। আদিবাসীদের অধিকাংশ জমিই জমিদার মহাজনরা গ্রাস করে নিত নানা মিথ্যা চাতুরির দ্বারা যেমন—একটা কোদাল, এক সের লবণ নিয়েছে সেটা মহাজনের খাতায় লেখা থাকত। কিছুদিন পর ঐ একটা কোদাল ও এক সের লবণের দাম খাতায় বেড়ে কয়েকশত টাকায় পরিণত হত। তখন মহাজন সেই কৃষককে বলত "তোর সুদ মিলে এত টাকা হয়েছে"। তখন কৃষক টাকা দিতে পারত না পরিবর্তে জমি লিখিয়ে নিত। কিংবা বাবা একবার ঋণ করে মারা গেছে, ছেলেকে খাতা দেখিয়ে বলত তোর বাবা স্বর্গে যেতে পারবে না কাজেই অমুক জমিটা লিখে দিয়ে বাবাকে ঋণমুক্ত কর। এক মন ধান মহাজনের কাছ থেকে নিলে ধান ওঠার সময় পাঁচ মন ধান দিতে হত। এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক সমিতি গঠন করার চেষ্টা করতাম। কৃষকদের ভিতর তাদের আপনজনের মত তাদেব সুখে দুঃখে সাথী হওয়া ও তাদের প্রতি কোনও অবজ্ঞা প্রকাশ না করে তাদেরই একজন হতে পারলাম। আমি ছোটবেলা থেকেই কৃষকদের মত সর্বপ্রকার কাজে অভ্যস্ত ছিলাম তাই তাদের সাথে তাদের মত হয়ে মিশতে আমার কোনও অসুবিধা হয় নি।

১৯৩৯ সালে দাওধারা গ্রামে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ধীরেন গুহ মজুমদার ও আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমাদের নামে মামলা করে এবং সেই মামলায় আমাদের ৬ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তখন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। বৃটিশ সরকার সর্বত্রই নানা প্রকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে আমি ও ধীরেন মজুমদার ময়মনসিংহ জেল থেকে ছাড়া পাই। ছাড়া পেয়ে সেরপুর চলে যাই। সেখানে রাত্রেই সেরপুরের রবি নিয়োগী, পুলিন বক্‌সী, প্রমথ গুপ্ত, জিতেন সেন, হেমন্ত ভট্টাচার্য ও আমি এক সভায় মিলিত হই। সেই সভাতেই আমাকে কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য পদ দেওয়া হয়। পার্টির সভ্যপদ পাওয়ার পর আমার যে কি আনন্দ ও গর্ব হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখনকার দিনে পার্টির সভ্যপদ দেওয়া হত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ছয় মাস প্রার্থী সভ্য হিসাবে থাকার পর। এই সময় পার্টি ও তার রাজনীতির প্রতি আনুগত্য, শৃঙ্খলাজ্ঞান, একনিষ্ঠতা ও চারিত্রিক গুণাবলী বিচার করা হত। পার্টি সভ্যপদ পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। তখন আমরা নালিতাবাড়ী হালুয়াঘাট অঞ্চলে যুদ্ধ বিরোধী প্রচার শুরু করি। কৃষক সন্তানদের পার্টি কর্মী হিসাবে শিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করি। এইভাবে শত শত কৃষক সন্তান আমাদের পার্টিতে আসে। তখন আমি সকাল থেকে রাত ১২টা—১টা অবধি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আদিবাসীরা খুব দলবদ্ধ জাত, এক গ্রামে কোন কাজ শুরু করলে বিভিন্ন গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ত; তখন সেই সব গ্রামে গান্ধীর কিছুটা প্রভাব আছে, তাছাড়া হিন্দু মহাসভা ও মিশনারীরাও বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। আর আছে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জমিদার, মহাজন, পুলিশ ও দালালদের শোষণ ও অত্যাচারের স্বর্গরাজ্য। এদিকে তেভাগা ও টংকপ্রথা রদের জন্য বিরাট আন্দোলন শুরু হয়েছে। ভারতীয় বুর্জোয়া নেতারা চারিদিকে জনগণের বিপ্লবী মনোভাব দেখে ভীত হল। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণের পথ নিল। আমারাও জনতার মনোভাব বুঝলাম না। কংগ্রেস-লীগ এক হও প্রচারে নামলাম। ভারতীয় জনতাকে চির অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করে১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা এল।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতার পার্টি কংগ্রেস আহূত হল। আমি ও প্রতিনিধি হিসাবে গেলাম। ভারতীয় জনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, পার্টি নেতৃত্ব দিলেই জনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তেলেঙ্গানা, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের জায়গায় জায়গায় তখন বিপ্লবী আন্দোলন চলছে। নেতৃত্ব এগিয়ে গেলেই জনতা তার পিছনে আসবে—সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা ক্ষমতা দখলের পথে

এগিয়ে যাব। আপোষ এবং সংগ্রাম না করার পথ থেকে সংগ্রাম করার ডাক পেয়ে খুবই উৎসাহ নিয়ে পার্টি কংগ্রেস থেকে ফিরে এলাকায় গেলাম। প্রস্তাব গ্রহণ করা হল—"ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের জনগণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত"। প্রমথবাবু হালুয়াঘাট থানা ও আমি নালিতাবাড়ী থানায় গ্রামের পর গ্রামে সভা করলাম। সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু কমরেড ও জনসাধারণ এখনই প্রস্তুত নয়। তখন সব নেতারাই আড়ালে। কাজেই পাহাড় এলাকাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

এদিকে সরকার মিলিটারি ও আনসার বাহিনীকে সংগঠিত এলাকার উপরে লেলিয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রী কণা পালও তখন আমাদের সাথে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। এলাকার জমিদার কাছারী গুলিতে পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়েছে। আমাদের গ্রেপ্তার করার জন্য গুপ্তচর ও আনসার বাহিনী উঠে পড়ে লেগেছে। ছদ্মবেশে চলাফেরা করতে হচ্ছে, ইতিমধ্যে মধ্যমকুড়া গ্রামে পুলিশ গুলি চালায়। আমাদের একজন কমরেড মারা যায় ও আরও অনেক আহত হয়। আনসার বাহিনী ও মুসলিম জনতার একাংশ হাজং পাড়া আক্রমণ করে ও লুঠতরাজ করে। হাজার হাজার হাজং কমরেড বাড়িঘর ছেড়ে ভারত সীমান্তে চলে যায়। বিনা প্রস্তুতি ও খালি হাতে সংগ্রাম হয়না, তার জন্য মানসিক ও অন্যান্য সব প্রস্তুতি দরকার। সশস্ত্র সংগ্রাম করার মত পাহাড়ে বা অন্যত্র কোনও অবস্থা নেই। গেরিলা যুদ্ধেরও একটা প্রস্তুতি দরকার। এইভাবে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে বহু গ্রাম খালি হয়ে গেল। আমরা সেই এলাকা ছেড়ে ভোগাই নদী পার হয়ে বোনার পাড়া চলে এলাম। এদিকে জেলা কমিটির নির্দেশ সংগ্রাম শুরু করার জন্য। রাত্রে হলদিয়া গ্রামে এসে আশ্রয় নিলাম। ভোর হওয়ার আগে হঠাৎ এক মহিলা কমরেড এসে আমাদের ডেকে ওঠাল। চারিদিকে পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। পাশেই উত্তর দিকে ভারত সীমান্ত ও পাহাড়। আমরা তখনই বেরিয়ে পড়লাম, আমি, রবিদা উত্তরে পাহাড়ের দিকে দৌড়তে লাগলাম। হঠাৎ একজন দালাল আমাকে চিনে ফেলে ও আমার নাম করে। সব পুলিশ ও দালালরা আমাদের দিকে ছুটে এল। আমার ও রবিদার দিকে লক্ষ্য করে পাঞ্জাবী পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। আত্মরক্ষার জন্য আমরা যেই বসে পড়েছি অমনি পুলিশ ও দালালরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার মাথায় ও কোমরে একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে বাড়ি দিয়ে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে পুলিশ আমাকে ধরে ফেলে। তবুও আমি পাঁচ মিনিট খালি হাতে তার সঙ্গে লড়ে যাই। ভোরের দিকে আমরা দুইজন ধরা পড়লাম। পাশেই বহু জঙ্গী কমরেড ছিল, কিন্তু এই অবস্থায় কেউই

এগিয়ে এলনা। একশত লোক যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলেই আমরা মুক্ত হই, তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারি। আমরা যখন উত্তর দিকে দৌড়াচ্ছিলাম—তখন জিতেন মৈত্র কনাকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড়ে অন্য গ্রামে পৌঁছে যায়। কারণ তখন ওদিকটা একদম ফাঁকা ছিল। আমি ধরা পড়ার পর মুসলমান ও খয়ের খাঁদের কি উল্লাস। বৃটিশ সরকার আমাকে আট নয় বছর ধরতে পারেনি ; পাকিস্তান সরকার ধরেছে, কি গর্ব ! ওখান থেকে আমাদের গরুর গাড়ী করে নালিতাবাড়ী থানায় নিয়ে এল। আমি কোমরের আঘাতে উঠতে পারি না। রাস্তার দুধারে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান আমাদের দেখার জন্য জড় হয়েছে। পরে জেনেছি জিতেন ও কণা সারাদিন এক জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। হাজং মেয়েরা তাদের খাবার দিয়ে এসেছে। ওরা গুলির শব্দ শুনে ভেবেছে হয়তো আমরা বেঁচে নেই। সন্ধ্যায় আমাদের থানায় আনল। এদিকে ময়মনসিংহ থেকে বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসার এসে গেছে। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে আমাদের দুজনকে সারারাত থানার লকআপে পিটিয়েছে। সকালে মৃতপ্রায় অবস্থা, কথা বলার ক্ষমতা নেই, সেইদিনই গাড়ি করে সেরপুর আনে। সেরপুর থেকে জামালপুর জেলে নিয়ে যায়। সেখানে থেকে জানতে পারি জিতেন ও কনা ধরা পড়ে নি। জামালপুর জেল থেকে আমাদের ময়মনসিংহ জেলে নিয়ে যায়। জেলখানায় ছয়মাস আমি হাঁটতে পারিনি। জেলের ডাক্তার ও জেলাররা আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। আমাদের গ্রেপ্তারের সংগে সংগেই এই হঠকারী নীতির শিকার হন বহু হাজং কমরেড ও সাধারণ কৃষক। সুযোগ সন্ধানী মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ আনসার ও পুলিশের সাহায্যে আদিবাসী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। হাজং, ডালু, কোচ, বানাই অধিকাংশ গ্রামের কৃষক পাশেই ভারতভূমি অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। নেতৃস্থানীয় কমরেডরাও তাদের সঙ্গে সেখানে চলে যায়। আমাদের দশ মাইল চওড়া ও তিনশ মাইল লম্বা বিরাট সংগ্রামের অঞ্চল ফাঁকা হয়ে যায়। আমরা তখন জেলখানায় বসে এসব সংবাদ পাই। বাইরে থেকে নির্দেশ আসছে, বাইরে জনতা লড়াই করছে—জেলখানাতেও সর্বদা লড়াই করতে হবে। অনশন সংগ্রাম করতে হবে। কর্তৃপক্ষ আক্রমণ করলে থালা, ঘটি, বাটি যা থাকবে তাই দিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। আমরা পরপর তিন চার বার অনশন সত্যাগ্রহ করি। আমাকে আলাদা করে 'সলিটারী সেলে' পাঠিয়ে দেয়, আটাশ দিনের অনশন ভাঙার পর ঈদ উপলক্ষে আমাদের পোলাও মাংস খেতে দেয়। অনশনের পর খাওয়ায় আমি গ্যাসট্রিক আলসারে আক্রান্ত হই।

তিন বছর পর আমার চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই সময় আমাকে ঢাকা জেলে ট্রান্সফার করা হয়। কনাও এই সময় ষোল মাস জেল-খানায় থাকার পর ছাড়া পায় ও কলকাতায় চলে যায়। আমার আলসারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। ঢাকা জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকে কয়েদী অবস্থাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। সার্জিকেলের প্রধান ডাক্তার এস. কে. আলম্ আমাকে দেখে তার underএ ভর্তি করে নেন। হাসপাতালে আমার পাহারার জন্য দুইজন বন্দুকধারী পুলিশ ও একজন আই বি র লোক নিয়োজিত হয়। ডাক্তার আলম্ পরের দিন এসে আমার সব কথা শুনলেন। কিছু দিন রেখে অপারেশন করতে হবে বললেন। ডাক্তারবাবু গল্পছলে নিজের কথাও অনেক কিছু আমায় বললেন, বুঝতে পারলাম তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল।

কনা তখন কলকাতায় সামান্য বেতনে একটা চাকরি করে। যে জনতার ভিতর দীর্ঘদিন কাজ করেছি তারা বিতাড়িত, ছিন্নমূল হয়ে আসামের জঙ্গলে. কেউ বেঁচে আছে, কেউ মরেছে ; কেউ নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। সংগঠিত এলাকা আর নেই। তাই সাত বৎসর পর ছাড়া পেয়ে কোথায় থাকব কি করব ভাবতে লাগলাম। নূতন করেই যখন সংগঠন গড়তে হবে, জনতার মধ্যে যেতে হবে, তখন যেখানেই যাইনা কেন সেখানেই তো কম্যুনিস্ট হিসাবে কাজ করতে পারব। সব দিক ভেবে তখন migration করে ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত করি।

ডাক্তার আলমের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে আমার শরীর বেশ ভাল হল। কম্যুনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করতে পারলে মানুষ যে কত মহৎ হয় ডাক্তার আলম্ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমার সাজা শেষ হয়ে যায় কিন্তু জেল গেটেই সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে আবার গ্রেপ্তার করে। এদিকে কনা আমার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রচুর লেখালেখি করে। পূর্ব পাকিস্তানের এম. এল এ মনোরঞ্জন ধরের সাথে যোগাযোগ করে। কয়েকমাস থাকার পর ভারত ও পাকিস্তান সরকার কনার migration-এর আবেদন গ্রহণ করে। আমার কাছে চিঠি যায়। আমি কি করব এই তখন সমস্যা। কয়েকদিন, কয়েকরাত্র একটা বিরাট যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সমস্ত রকম বাধা নিষেধ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও রাজী আছি বলে চিঠি দিলাম। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার মুক্তির অর্ডার হয় এবং পাকিস্তানের ডি আই. বি র লোক আমাকে

এসকর্ট করে ভারত সীমান্ত পার করে ভারতের ডি আই. বির কাছে Hand-ovre করে দিয়ে যায়। দীর্ঘ সাত বছর পর দমদমের লালগড়ে পরিবারের সকলের সাথে মিলিত হই।

এখানে এসেই পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করি। পাকিস্তান থেকে পরিচয়পত্র এনে পার্টির সভ্যপদ অর্জন করি। এরপর দাদা ও হাজং বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য গারো পাহাড়ের ডালু বাজারে আমি ও প্রমথবাবু যাই। যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পিছনে আই বি লক্ষ্য রাখে। সেখানে গিয়ে দেখি হাজং বন্ধুরা নিঃস্ব, মেয়েদের খুব দুর্দশা। তবু তারা আমাকে ও প্রমথবাবুকে যে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিছুদিনের জন্য সেই পূর্বজীবনে ফিরে যাই; বহু বন্ধুর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে আবার কলকাতায় ফিরে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে নিজের জীবিকার অন্বেষণে এবং পার্টির নানান কাজে আত্মনিয়োগ করি ॥

পুরানো সেই দিনের কথা

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু

জীবন সায়াহ্নের দিনগুলো স্মৃতিরোমন্থনে কেটে যাচ্ছিল মন্থরগতিতে। কোনদিন ভাবিনি কেউ স্মৃতিকথা শুনতে চাইবেন। স্মৃতি সততঃ সুখের। এমনকি দুঃখের স্মৃতিও। স্বাধীনতা আন্দোলনের সামান্য একজন সৈনিক ছিলাম আমি। সেই সময়ের স্মৃতিচারণায় আমার আজকের শূন্য মুহূর্তগুলো ভরে ওঠে। শীতার্তরাতে অগ্নিযুগের সেই অভিজ্ঞতা আমায় দেয় উষ্ণতা। মনে পড়ে সেই সব বন্ধুদের মুখ যারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবনের মূল্যবান সময় ইংরেজদের কারাগারে কাটিয়েছেন। তাঁদের তুলনায় আমার কারাজীবন এবং অন্তরীনকাল উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে না। কাঠবেড়ালী সেও তো রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কুটো দিয়ে সাহায্য করার আন্তরিকতা দেখিয়েছিল। আমিও আমার সাধ্যানুযায়ী দেশমাতৃকার মুক্তি আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলাম। জীবনসূর্য পশ্চিম দিগন্তাভিমুখী। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। চেষ্টা করেও বিস্মৃতির গর্ভ থেকেও কোন কোন ঘটনা বা কোন প্রিয় নামকে তুলে আনতে পারিনা। বুঝতে পারি স্মৃতির জগতেও সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। এই অবস্থাতেও আমার স্নেহভাজন অনুরাগী বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হই নিত্যদিন। তাদেরই অনুরোধে স্মৃতি-প্রদীপের আলোয় দেখার চেষ্টা করছি অতীতের সংগ্রামী জীবনকে।

আমি যখন মানিকগঞ্জ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় হীরালাল মহিন্তার সংস্পর্শে আসি। তিনি ওই বিদ্যালয় থেকে সেকালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে আর পড়াশুনো করেননি। তিনি আমাদের গুটিকয় ছেলেকে স্বেচ্ছায় পড়াতেন এবং পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে দেশ বিদেশের দেশপ্রেমিক মনীষীদের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বলে আমাদের উদ্দীপ্ত করতেন। হীরালালদা ছিলেন যুগান্তর দলের আভ্যন্তরীণ সংগঠন কর্মী। শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্র ঘোষ যুগান্তর দলের যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এদের উদ্যোগে স্থাপিত হল 'ছাত্রসংঘ লাইব্রেরী'। এই সংস্থাকে কেন্দ্র করে আমি, অপরেশ চৌধুরী, স্বর্গীয় হেমেন বিশ্বাস, স্বর্গীয় যাদব চট্টোপাধ্যায়, অমর ঘোষ এবং আরও অনেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলাম।

নবম শ্রেণীতে ওঠার পর আমি হীরালালদার অজান্তে মানিকগঞ্জে লবণ আইন ভঙ্গের যে স্বেচ্ছাসেবী ক্যাম্প হয়েছিল তাতে নাম লেখাই। এ খবর আমার বাবার কানে যেতেই বাবা আমাকে মানিকগঞ্জ থেকে বাড়ী নিয়ে আসেন এবং পরে জলপাইগুড়িতে আমার দাদার (স্বর্গীয় প্রমথনাথ বোস) বাড়ীতে রেখে আসেন। জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না পুলিশ রিপোর্টের জন্য। শেষপর্যন্ত ভর্তি হলাম ফনীন্দ্রদেব হাইস্কুলে। ১৯৩২ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। সোনাউল্লা হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক স্বর্গীয় বীরেন চৌধুরীর সংস্পর্শে লক্ষণ মৌলিক, স্বর্গীয় স্বপ্রকাশ দত্ত—এদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর আলিপুরদুয়ার কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আমি, নরেশ চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে ধৃত হই। আমাদের ছ'মাস করে জেল হয়। জলপাইগুড়ি জেল থেকে আমাদের স্থানান্তরিত করা হয় হিজলী স্পেশাল জেলে। ওখান থেকে মুক্তি পাবার পর ময়মনসিং শহরের আনন্দমোহন কলেজে আই. এস. সি পড়তে যাই। কিন্তু থাকার জায়গা পাইনি পুলিশের দৌরাত্ম্যে। এই কারণেই আমার আই. এস. সি পড়ার বাসনা ত্যাগ করতে হল। রংপুর কারমাইকেল কলেজে আই. এ-তে ভর্তি হই। থাকার ব্যবস্থা হয় আমার মাসীমার বাড়ীতে। কিছুদিন পর পুলিশ আমাকে রংপুর জেলা থেকে বহিষ্কার করে। সরকারী নির্দেশ মেনে টাঙাইল টাউনে আমার ভগ্নীপতি স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার ঘোষের বাড়ীতে আসতেই পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করে ওই বাড়ীতেই অন্তরীণ করে রাখে। অন্তরীণের নিয়ম হল সপ্তাহে দু'বার থানায় হাজিরা দিতে হবে আর সন্ধ্যার পরে বেরোনো চলবে না।

১৯৩৪ সালের ঘটনা। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে যাত্রা হচ্ছিল বাড়ীর পাশেই। সরকারী নিয়মের কথা ভুলে যাত্রা দেখছিলাম। পুলিশ সেখান থেকে আমায় ধরে নিয়ে যায়। বিচারে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর আমার দেশের বাড়ী বাদেবেহালিতে আমাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। বাড়ী থেকে সাত মাইল দূরে নাগরপুর থানায় গিয়ে সপ্তাহে দুদিন হাজিরা দিতে হতো। ১৯৩৫ সালে সেপ্টেম্বরে আমার অন্তরীণ দশা ঘোচে। রিপন কলেজ থেকে নন কলেজিয়েট হিসাবে ১৯৩৬ সালে আই. এ পাশ করি। তখন থাকতাম ডায়মণ্ড হারবারের উপান্তে। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমার এসব দুষ্কর্মের (বাবার দৃষ্টিতে) জন্য বাবাকে বন্দুক হারাতে হল। আমার দাদা স্বর্গীয় স্বদেশকুমার বোস বাঁকুড়া জেলাবোর্ডের অধীনে Cheif Leprosy

Medical Officer ছিলেন। তাঁর বাসায় থেকে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে ভর্তি হই এবং বি. এ. পাশ করি। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম, এ, পাশ করে আমার শিক্ষাজীবনের ইতি হয়। এবার রুজি রোজগারের জন্য সচেষ্ট হই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলার আগেই মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে ইংরেজী পড়ানোর সুযোগ পেয়ে যাই। যে মানিকগঞ্জে আমার শিক্ষাজীবনের ছেদ হয়েছিল সেখানেই আমার কর্মজীবনের শুরু হল। ফিরে পেলাম পুরানো দিনের সাথীদের। পেলাম না শুধু হীরালালদাকে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কায়ায় তাকে না পেলেও আমার স্মৃতিতে তিনি আজও মধ্যাহ্ন সূর্যের মত উজ্জ্বল।

১৯৪৫ সালে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় আমি. সমর ঘোষ এবং অপরেশ চৌধুরী গ্রামে গ্রামে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের বুঝিয়ে যাতে দাঙ্গা না বাঁধে তার চেষ্টা করতাম। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের গ্রামের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের গ্রাম বাদেবেহালিতে হিন্দু-মজুরেরা মুসলমানদের বাড়ীতে কাজ করত না। মুসলমানদের মধ্যে সেসব বাছ-বিচার ছিল না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার হুজুগে মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিল তারা হিন্দুর বাড়ীতে কাজ করবে না এবং তাদের জমির ধানও কাটবে না, যদিনা হিন্দু মজুররা মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন অধিকাংশ হিন্দুই ছিল জোতদার। মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষে বিপদের সম্ভাবনা বুঝে আমি মুসলমানদের সঙ্গে তাদের জমিতে ধানকাটা এবং মুসলমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে যে ধান পৌঁছে দেবার কাজ শুরু করি (সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল টোকেন)। এতে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয় এবং হিন্দুর বাড়ীতে কাজ না-করার মানসিকতা দূর হয়। আমাদের গ্রামের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন 'পিতাপুত্রে'র লড়াইয়ের ঘটনাটা না বলে থাকতে পারছি না। বিশ্বযুদ্ধের সময় কুইনাইনের বড় অভাব ছিল। গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষ যেখানে ম্যালেরিয়ার শিকার সেখানে কুইনাইনের চাহিদা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মারফত কুইনাইন বিলি হত। আমাদের গ্রামের বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমার বাবার স্নেহভাজন বন্ধু স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ সিংহ। তার কাছে গরীব মুসলমান প্রজারা কুইনাইনের জন্য আবেদন করে পেত না। তখন আমরা গ্রামের যুবকরা মিলে স্থির করলাম ইউনিয়ন বোর্ড থেকে এদের হঠাতে হবে। যেকথা সেই কাজ, নির্বাচনে

আমার পিতা, যতীনকাকা এবং অন্যান্যদের নিয়ে যে দল তারা বহু ভোটে পরাজিত হলেন যুবকদলের কাছে যার নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আমি। বোর্ডের অধিকাংশ আসন আমাদের দখলে চলে এলো। আমার বাবাও সে নির্বাচনে হেরেছিলেন। আমি জিতেছিলাম এবং বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার স্বপ্নও দেখেছিলাম। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হবার পিছনে যে ঘটনা আছে সেটাই এখন বলি ঃ আমাদের কাছাকাছি গ্রাম উথলী। এই গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ডঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Applied Chemistry-র হেড ছিলেন। ওনার দেশসেবামূলক কাজ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। উনি বেশীর ভাগ সময় কলকাতায় থাকতেন বলেই বোর্ডের টাকা-পয়সা ভাইস প্রেসিডেণ্টের হাতে থাকতো। ডঃ গোস্বামীর অজ্ঞাতে ভাইস প্রেসিডেণ্ট বোর্ডের প্রচুর টাকা তছরুপ করেন। ডঃ গোস্বামী স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়েন। নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে ক্ষতি-পূরণ করে পদত্যাগ করেন। ডঃ গোস্বামীর পদত্যাগের ঘটনাই আমাকে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যপদে ইস্তফা দিতে উদ্যোগী করে। এখনেও আমার পিতা-পুত্রের লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে। সব ঘটনাই চাপা পড়ে গেছে। একই ঘরে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাই শুধু মনে আছে।

ইংরেজকে শেষ পর্যন্ত শোষণের মায়া কাটিয়ে ভারতকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যাবার সময় অখণ্ড ভারতকে তারা দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেল। তাই বোধনের দিনে রোদনের ধ্বনি উঠল। আমাদের স্বপ্ন নিষ্ফল হলেও চোখের জল মুছে সিদ্ধান্ত নিলাম পাকিস্তানের মানিকগঞ্জেই থাকব। ১৯৪৮ সালের বর্ষাকালের কোন একদিন আমি আর অপরেশ মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খাচ্ছিলাম। আই. বি-র কিছু লোক আমাদের তখন ওয়াচ করছিল এবং তারা একটা মনগড়া চার্জও আমাদের বিরুদ্ধে ফ্রেম করে যার বিষয়বস্তু হল আমরা মিষ্টি খেয়ে এবং বিতরণ করে Fall of Hyderabad celebrate করছি। অপরেশ আমাদের কলেজের লাইব্রেরীয়ান ছিল। তাকে পরদিন পুলিশ কলেজ থেকে অ্যারেস্ট করে। আমি মানিকগঞ্জের এস ডি. ও খুরশীদ আলম চৌধুরীর ছেলেকে পড়াতাম। তিনি আমাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে আমাকেও পুলিশ অ্যারেস্ট করবে। আমি যেন পালিয়ে যাই। তখন আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এস. ডি. ও. সাহেবকে আমি সেকথা জানাতে তিনি আমাদের বাসায় পুলিশ পোস্টিং-এর আশ্বাস দেন এবং আমায় নৌকাপথে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

মানিকগঞ্জ ছাড়ার আগে আমি অরুণদাকে (স্বর্গীয় অরুণ রায়) সব কথা জানিয়েছিলাম। তিনিও আমাকে এস ডি. ও র পরামর্শমত কাজ করতে বলেছিলেন। আমি গ্রামে এসে মাতাজ ভাইয়ের বাড়ীতে উঠি। গণিভাইও খবর পেয়ে সেখানে আসেন। বাবাকেও সব খবর জানানো হয়। মাতাজ ভাই ও গণিভাই আমাকে অভয় দিয়ে বলেছিল তারা আমাকে সিরাজগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। সেইমত কাজও তারা করেছিল। আমি চলে এলাম রংপুরের গোমস্তাপাড়ায় দাদার শ্বশুরবাড়ীতে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে বিকালের ট্রেনে চেপে দোমোহনীতে দাদার (স্বর্গীয় স্বদেশকুমার বোস ঃ রেলের ডাক্তার) বাসায় এলাম। এদিকে আনন্দবাজারে ফলাও করে বেরিয়েছে—চারু বোসকে (প্রবোধ বোস) গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাগজের সংবাদ যে মিথ্যা দাদা তা আমাকে দেখে বুঝতে পারলেন। পরদিন দাদার বাসা থেকে জলপাইগুড়িতে দিদির বাসায় চলে আসি। ১৯৪৯ সালে আমাদের পরিবারের সকলেই ভারতে চলে আসে দেশের বাড়ীর মায়া কাটিয়ে।

জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মাতাজ খাঁ আর গণি মণ্ডলের কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে। এদের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে হয়ত পাকিস্তানের কারাগারই আমার আশ্রয়স্থল হতো।

———

ধুসর স্মৃতি

শ্রী প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল

আজ জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কেউ যদি আমার রাজনৈতিক জীবনের কথা জানতে চায় তাকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে, কারণ আলো আঁধারে পাক খাওয়া স্মৃতির মেখলা খুলে দেখি যে কত স্মৃতি, কত কাহিনী মনের অন্তরালে চলে গেছে। ফলে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন, তবুও যা মনে আছে তাই দিলাম।

১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর আমি ফরিদপুর জেলার পালং থানার অন্তর্গত বিলাসবান গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। পিতা স্বর্গীয় করুণাকান্ত সান্যাল মহাশয় 'সুভাষ বসু'র একান্ত ভক্ত ছিলেন। পালং থানা তৎকালীন যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার অন্যতম ছিল। অনেক রাজনৈতিক নেতাদের নাম পালং থানার সঙ্গে যুক্ত। সেই সময়কার রাজনৈতিক বড় বড় বিপ্লবী ও সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। যার ফলে একটি বিপ্লবী চেতনা আমার মনে বাল্যকাল থেকে দানা বেঁধে উঠেছিল। আমার বড় দাদা হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তৎকালীন যুগের কংগ্রেসী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। তারা আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। এই পরিবেশে আমার মন বাল্যকাল থেকে একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গঠিত হয়।

তবে বাল্যকালে আমি 'দভোগ' রামকৃষ্ণমিশনে যাতায়াত করি ও তাদের আদর্শে নানাপ্রকার সেবামূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। সেই সময় জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা আমাকে পীড়িত করত। এই সময় অনুশীলন সমিতির উঁচু দরের নেতা ও আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাশী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসি। তিনি আমার সেবামূলক কাজ লক্ষ্য করেন ও এই কাজের মাধ্যমে শ্রীযুক্ত কালী মহাশয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি ১৯২৯ সালে 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান করি।

২৯. ১০ ৩৩. সালে আমি বিখ্যাত Hilli Ryl Station Raid কেসে ধরা পড়ি ও স্পেশাল ট্রাইবুনালে আমার ১০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। পরে High Court-এ appeal করে দশ বৎসর কুখ্যাত আন্দামানের সেলুলার

জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সেই আদেশ অনুসারে আমাকে ঐ জেলে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ১৯৩৭ সালে ৩৭ দিন 'অনশনে' অংশগ্রহণ করি। আন্দামান জেলে বসেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে লড়াই আমরা করেছিলাম তা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে তার মূল্যায়ন করতে থাকি। ওখানেই 'মার্ক্সীয়' দর্শন বিষয়ে পড়াশুনা করে বুঝতে পারি যে ভারতের স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের পথে আপামর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারবে। ১ ০২ সালে অনুশীলন সমিতি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। তার পূর্ণ রূপ একমাত্র সমাজতন্ত্রের মধ্যেই সম্ভব।

১৯৩৮ সালে আন্দামান সেলুলার জেল থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে আসি। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে পুনরায় ৩৬ দিন অনশনে অংশগ্রহণ করি। ১৯৩৫ সালে আমি জেলের বন্দীজীবন থেকে মুক্তিলাভ করি।

জেল থেকে বাইরে এসে আমি 'কমিউনিস্ট' পার্টিতে যোগদান করি। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফরিদপুরে শ্রমিক ও কৃষক অন্দোলনেয় সঙ্গে যুক্ত হই। এর ফলে আমি দুই বৎসর পাকিস্তানের জেলে কারাবন্দী ছিলাম। বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক মতানৈক্য হওয়াতে আমি ১৯৫৫ সালে সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে আসি।

এখন যখন সকলে প্রশ্ন করে আপনারা কি এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী? এর জন্য কি আপনারা জীবন-যৌবন উপেক্ষা করে লড়াই করেছিলেন? তখন খোলা চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি, যাদের সাহচর্যে এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল, সততা ও সংগ্রামী চেতনা আজ কোথায়?

সংগ্রাম করেছিলাম এই উদ্দেশে যে স্বাধীনতা পেলে ভারতের সকল শ্রেণীর লোক অর্থাৎ ধনী, দরিদ্র, কিষাণ, মজদুর, সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণী সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা ও দুবেলা দুটো অন্ন পাবে, কিন্তু সে আশা কি পূরণ হয়েছে?

রাজনীতি থেকে সরে এলেও আমি 'কমিউনিজম' মতাদর্শে বিশ্বাসী। তবে এই আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি প্রাধান্যকে আমি মেনে নিতে পারি না। এই ব্যক্তি প্রাধান্যই সমস্ত আদর্শকে ছিন্নভিন্ন করে। বিপ্লবী চেতনাই সমস্ত জনসাধারণের সুখ ও দুঃখকে নিবারণ করতে পারবে। জনসাধারণের তৃণমূল পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের চেতনাকে ছড়িয়ে না দিয়ে ব্যক্তিপ্রাধান্যই আজকের রাজনৈতিক মতাদর্শের মূল। এই পরিকাঠামো অবশ্য পরিত্যক্ত হওয়া দরকার। এ ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

———

ক্ষুদিরামের আদর্শে দীক্ষিত দু'টি সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নিযুগের 'ত্রয়ী' বা 'তিন নেতা'র গুপ্তচক্রের (রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, চারু দত্ত) আদালতে সুশীল সেন নামক বালককে বেত্রাঘাতের দণ্ডাদেশের অপরাধে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। বিপ্লবীরা তার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে জেনে কিংসফোর্ডকে ১৯০৮ খ্রীঃ-এর প্রথম দিকে মুজফফরপুরে বদলি করা হয়।

২৪শে এপ্রিল ১৯০৮—দুই তরুণ বিপ্লবী, পরস্পর অপরিচিত তখনো পর্যন্ত, মুজফফরপুর রওনা দেন—প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু (ছদ্মনাম—দীনেশচন্দ্র রায় ও দুর্গামোহন সেন)। মুজফফরপুরে এক ধর্মশালায় দু'জনে আশ্রয় নেয়। দু'জনেই কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন—তার যাতায়াতের গাড়ী, অফিস, ক্লাব ইত্যাদিতে। কিন্তু, এঁরা স্থানীয় বাঙালী যুবকদের সঙ্গে মিশতেন না।

৩০শে এপ্রিল ১৯০৮—রাত ৯টার কাছাকাছি। মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে বেরবার পর তাকে লক্ষ্য করে—কিংসফোর্ড আছেন এই বিশ্বাসে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সেই গাড়ীতে দুই ইংরেজ মহিলা আরোহী মারা যান। প্রফুল্লচাকী ও ক্ষুদিরাম পলায়ন করেন।

পরদিন ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ও উপরোক্ত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় তাঁর বিচার চলে চার মাস ধরে। এই বিচারে ক্ষুদিরামের পক্ষে সওয়াল করেন রংপুর নিবাসী এক বাঙ্গালী উকিল। এই ভদ্রলোককে নানানভাবে সহায়তা করেন স্থানীয় শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের একাংশ। বিচারান্তে, ১১ই আগস্ট ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ মুজফফরপুর জেলে কার্যকরী করা হয়।

প্রফুল্ল চাকী ৩০শে এপ্রিল রাতেই ট্রেনে সিমরিয়া ঘাট রওনা দেন কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সেই গাড়ীতে পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী ছুটি

কাটিয়ে ফিরছিলেন কলকাতায়। এই গাড়ীতে নানাজনের আলোচনার মধ্যে প্রফুল্ল চাকী প্রথম জানতে পারেন যে, তাঁদের নিক্ষিপ্ত বোমায় কিংসফোর্ডের পরিবর্তে মিসেস কেনেডি ও তাঁর এক সহচরী নিহত হয়েছেন। এই খবরে আশাহত প্রফুল্ল চাকী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন, "তা'হলে কিংসফোর্ড মরেনি ?" এই উক্তিতেই অভিজ্ঞ গোয়েন্দা নন্দলালের সন্দেহভাজন হন তিনি এবং পরবর্তী স্টেশনেই নন্দলাল নেমে খবর পাঠান সিমিরিয়া ঘাট ও মোকামাঘাটে পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করতে। সিমিরিয়া ঘাটে পেঁছে প্রফুল্ল চাকীও বুঝতে পারেন তিনি ধরা পড়তে যাচ্ছেন এবং এ ঘটনার জন্য দায়ী নন্দলাল ব্যানার্জী, তিনি নিজের রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেন ও তার আগে নন্দলালকে অনেক লোকের সামনে বলে গেলেন "তুমি বাঙ্গালী, বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তবুও তোমায় ছেড়ে দিলাম।" প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিন ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮।

উপরোক্ত পুরো বৃত্তান্তটি আমরা (ডাঃ অনাদিনাথ ব্যানার্জী এ৩/২, কালিন্দি হাউসিং এস্টেট, কলকাতা ৮৯, তদীয় ভ্রাতা গৌরীশংকর ব্যানার্জী ৭৯, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলকাতা-৩৭) আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা ডাঃ হরিচরণ ব্যানার্জীর কাছে শুনি। যিনি উপরোক্ত সময়ে মুজফফরপুরের কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় যোগদানের সুবাদে যিনি ক্ষুদিরামের বিচার চলাকালীন রংপুরের উকিলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব ও পরিশেষে ক্ষুদিরামের মরদেহ বহন করে যথাযোগ্য সম্মানে দাহ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

১৯০৮ সালের এই ঘটনা ২০/২১ বছরের যুবক হরিচরণের জীবনে স্বাদেশিকতার প্রথম দীক্ষা বা পরবর্তীকালে আবেগের পরিবর্তে আদর্শে পরিণত হয়েছে এবং তার সমগ্র জীবনের দিশা নির্দেশ করেছে। ১৯১৬ সালে Surgery তে স্বর্ণপদক সহ L. M.F. পাশ করেন। ১৯১৮ সালে স্বগ্রামে (গ্রাম—বড়খুদুড়া, থানা— বাঘেরপাড়া, পোঃ—বন্দবিল সদর মহকুমা জেলা—যশোহর) ফিরে আসেন এবং চিকিৎসা ব্যবসার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিকভাবে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর নিরন্তর প্রয়াস চালাতে থাকেন। চিকিৎসক হিসাবে বিশেষতঃ জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধার দায়িত্ব নিয়ে পরিবেশ ও পানীয় জলের সুরক্ষার মধ্যে দিয়ে কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মহামারী প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন।

১৯২২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন ও

স্থানীয়ভাবে কংগ্রেস কমিটি গড়ে তোলেন অন্য অনেকের সঙ্গে একত্রে। ১৯২৮ সাল নাগাদ ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন গড়ে তোলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে। তৎকালীন নেতৃত্বের মধ্যে প্রয়াত বিজয়চন্দ্র রায় যশোর জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতা হিসেবে এবং স্থানীয় বন্দাবিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলন কমিটির সভাপতি হিসেবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্মভাবে বহু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই সময় বন্দাবিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে গ্রামের বহু সাধারণ মানুষও কারাবরণ করেন যেমন—বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার রায়, জ্ঞানেন্দ্র কর্মকার, কালীপদ মণ্ডল, ভোলানাথ কর্মকার, সতীশচন্দ্র তন্তুবায়, গোলকহরি নন্দী, পুলিনবিহারী তন্তুবায়, হেমন্ত ঘোষ, কেতাবুদ্দি মিঞা এবং আরো প্রচুর কৃষক ও সাধারণ মানুষ। এব্যাপারে তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বর মধ্যে বীনা ভৌমিক, সুভাষচন্দ্র বসু, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু এই সময় বন্দাবিলায় ও খুদুড়ায় ছোট ছোট সভা সমিতি করে এই আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছেন। এই সময় গ্রামের বহু মানুষের সাথে ডাঃ হরিচরণও অকথ্য পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেন ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন, ১৯৩০ সালে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়।

পুলিশ তাঁর বাড়ীর চিকিৎসাখানা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এবং বাড়ীর শিশু ও মহিলাদেরও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে। এই জীবন পরিক্রমার পথে তাঁর জীবনাদর্শ কালিক বিচারে সঠিক থাকার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যান্য নানান কাজে যেমন, গ্রামে মহিলা শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রায় একক প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন একটি মেয়েদের স্কুল। ডাঃ হরিচরণের এই ঋজু জীবনাদর্শ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল এবং তা পরিস্ফুট ছিল তাঁর চাল-চলন ও পোষাক-আশাকের সরলতায়। তাঁর চারপাশের বহু মানুষ তাঁর জীবনাদর্শে প্রভাবিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে তাঁরই প্রত্যক্ষ প্রেরণায় তাঁর পুত্রেরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

সংগ্রামী, আদর্শনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পিতা ডাঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর প্রথম পুত্র প্রয়াত নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। আসলে বলা ভালো যে শিশুর ক্রমবিকাশের পথে আর-পাঁচটা সাধারণ বোধোদয়ের মতোই ইংরাজ বিরোধিতার ইচ্ছাও তাঁর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবে গড়ে ওঠে যা কিনা, তৎকালীন সামাজিক এবং বিশেষতঃ তাঁর পারিবারিক

পরিবেশ সঞ্জাত। মাত্র ৭ বৎসর বয়সেই ইংরাজ শাসকের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার সাথে পরিচিত হন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতাকে ধরতে আসা বিশাল পুলিশবাহিনী সমগ্র বাড়ী জুড়ে যে তাণ্ডব চালায় তার থেকে রেহাই পাননি নিত্যগোপাল, পুলিশ সেই ঘুমন্ত বালককে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বহুদূরে, যার ফলে মাথায় এক গভীর ক্ষতচিহ্ন তাঁকে বহন করতে হয়েছে আজীবন।

যশোর জেলা স্কুলে ছাত্রাবস্থায় স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অংশুমালী মজুমদার, ব্রজধর প্রমুখের মারফৎ নিত্যগোপাল কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শ লাভ করেন এবং এই সময়েই কমঃ কৃষ্ণবিনোদ রায়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪০ সালের পারিবারিক কারণে যশোর ছেড়ে কৃষ্ণনগরে CMS School-এ ভর্তি হন ১০ম শ্রেণীতে। ঐ বছরের শেষে ঐ স্কুলের পাদ্রী কর্তৃপক্ষ ইংরাজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তার জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। নিত্যগোপাল এই সাহায্য প্রচেষ্টার বিরোধিতায় ছাত্রদের সংগঠিত করে স্কুলে প্রায় ৪ দিনব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট সংঘটিত করান ও কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রকল্প বানচাল করেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন সুনীল মৈত্র, মনোরঞ্জন সেন প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এটাই ভারতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিরোধী প্রথম ছাত্র-ধর্মঘট।

পরবর্তীকালে, ১৯৪৪ সালে রেলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন ও পরে কমঃ মহম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে কলকাতা বাস ও মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর মুক্তির দাবীতে যে উত্তাল আন্দোলন হয় নিত্যগোপাল তাতে সক্রিয় যোগদান করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইংরাজ সৈন্যের গুলি লাগে নিত্যগোপালের ডান পায়ে। ফলতঃ তাঁর ডান পা হাসপাতালে কেটে বাদ দিতে হয়। এসময় বহু মানুষ তাঁদের সহযোদ্ধার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে গেছেন হাসপাতালে। অনেকের সাথে এসেছেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত। এর পরেও তিনি পূর্ববৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন এবং স্বাধীনতা পত্রিকায় কাজ করতে শুরু করেন।

দীর্ঘদেহী নিত্যগোপাল বাংলা, ইংরাজী ছাড়াও ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দী ও গুরমুখি ভাষা যথেষ্ট ভালো জানতেন।

যাবার আগে যাই বলে
কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

শ্রীজিতেন সেনগুপ্ত

আমি এক অখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। আবার গত ৫৩ বছর যাবত আমি এক নিষ্ঠাবান কম্যুনিস্ট কর্মীও। জীবনের দীর্ঘ পথ পার হয়ে আজ আমি মরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার বিদায় নেবার সময় এখন আসন্ন। অস্তাচলের ধারে দাঁড়িয়ে তাই আজ আমি পূর্বাচলের পানে তাকাচ্ছি। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে অতীত দিনের ঘটনাবলী। স্মৃতির ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করে সেগুলোকেই আজ আমি লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী, আমার এ লেখা আত্মজীবনী নয়, একে বরং বলা চলে স্মৃতিচারণ।

রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি হয়েছিল বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে। পরে সেই যুগান্তর দল থেকেই আমি যোগ দিই কংগ্রেসের আইন অমান্য ও অন্যান্য আন্দোলনে। অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও কর্মী অতীতে কোন না কোন বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন পরে ঐ বিপ্লবী দলগুলি থেকেই তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করেন। এ প্রসঙ্গে যুগান্তর দলের অন্যতম বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও চট্টগ্রামের সূর্যসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ও মাষ্টারদা ছিলেন জেলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা। আর মধুদা ওরফে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তো পরবর্তীকালে হয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

১৯১০ সালের ১লা জুলাই ময়মনসিং জেলার সেরপুরে এক তালুকদার পরিবারে আমার জন্ম। আমার পৈতৃক নিবাস কিন্তু ছিল উত্তরবঙ্গের বগুড়ায়। কিন্তু সেখানে আমি খুব কমই থেকেছি। আমার লেখাপড়া রাজনৈতিক কাজকর্ম সবই শুরু হয় সেরপুরে। সেদিক থেকে সেরপুরকে বলা যায় আমার মাতৃভূমি ও কর্মভূমি আর বগুড়াকে বলা চলে পিতৃভূমি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হই। পাঠরত থাকা কালেই আমি যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসি এবং শেরপুরে যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হই। সেখানে তখন অনুশীলন ও যুগান্তর দুই দলেরই শক্তিশালী

গোপন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। অনুশীলন ও যুগান্তর উভয় দলেরই প্রকাশ্য কাজকর্ম চলতো পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার প্রভৃতির মাধ্যমে। আমাদের যুগান্তর গোষ্ঠীর প্রকাশ্য সংগঠন ছিল বিবেকানন্দ সমিতি। অনুশীলন দলের প্রকাশ্য কাজকর্ম চলত ছাত্রসংঘ নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে। রবি নিয়োগী, প্রমথ গুপ্ত, সুরেন্দ্র কাহালি প্রভৃতি বন্ধুরা তখন ছিলেন সেরপুরে যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী। আমাদের থেকে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ শৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরীও ছিলেন যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত। তবে তিনি একান্তভাবে কংগ্রেস আন্দোলনের কাজকর্মই করতেন। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বড় একটা অংশগ্রহণ করতেন না। স্থানীয় অনুশীলন দলের কর্মীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন পুলিন বক্সী, ধরণী বিশ্বাস, অমর নাগ, বিজয় দাস প্রভৃতি।

২৮-২৯ সালে যুগান্তর, অনুশীলন দুই দলের কর্মীরাই কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ করেন তবে এ ব্যাপারে যুগান্তর দলের কর্মীরাই বেশী এগিয়ে যান। কংগ্রেসের স্থানীয় কমিটি নির্বাচনে প্রায় সব আসনে তারাই জয়ী হন। মহকুমা ও জেলা কমিটিতেও যুগান্তর দলেরই তখন প্রাধান্য ছিল। তবে অনুশীলন দলের অনেক নেতাও তখন জেলা কংগ্রেসে নেতৃত্ব পদে ছিলেন।

আমার রাজনৈতিক জীবনে আসার পিছনে ছিল খুব ছোট্ট দু'টি ঘটনা। আর তা ঘটেছিল বগুড়াতে। তখন আমার বয়স খুবই কম, স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি। আমাদের বাড়ীর দেউড়িতে এক ভিখারী এসে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে একটা অদ্ভুত গান গেয়েছিল "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" এ ধরনের গান আমি আগে কখনও শুনিনি। ক্ষুদিরামের ফাঁসির এই গান শুনে আমার শরীরে রোমাঞ্চ জাগল। দেশের জন্য প্রাণ দানের এই গান শুধু আমার মনে প্রথম দেশপ্রেমের সঞ্চার হল। ঐ গানের দুটি ছত্র আমার মনে ঝংকার তোলে—"হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী"। দ্বিতীয় ঘটনাটিও ঘটেছিল বগুড়াতেই। সেখানের এক জনসভাতে গিয়েই আমি প্রথম গান্ধীজিকে দেখি ও তাঁর বক্তৃতা শুনি। বক্তৃতার সব কথা আমি বুঝতে পারিনি কারণ তিনি বলেছিলেন হিন্দীতে—যে ভাষা আমি তখন খুব সামান্যই বুঝতাম। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চরকা কাটতে কাটতে তিনি কথা বলার মত করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এমন ধরনের বক্তৃতা আমি আগে আর কখনও শুনিনি। সে বক্তৃতার মূল কথাটা বুঝেছিলাম ঃ স্বরাজ আমাদের চাই। বিদেশী সব জিনিস আমাদের বর্জন করতে হবে। নিজেদের হাতে তৈরী কাপড় পরতে

হবে আর সেই জন্যই প্রয়োজন চরকা কাটা। সভাশেষে বাড়ীতে ফিরে জেঠিমাদের সাথে মাসখানেক আমি সুতাও কেটেছিলাম। তারপর সেরপুর এসে সুতো কাটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সেখানে আমার দাদুর বাড়ীর পরিবেশটা ছিল ভিন্ন রকম। স্বাদেশিকতার কোন ছাপই সে বাড়ীতে ছিল না। কিছুদিন পর সেই বাড়ীতে থাকাকালীন আমি যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হই। আমাকে যুগান্তর দলে নিয়ে আসার ব্যাপারে সহপাঠী বন্ধু রবি নিয়োগীর ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। দলে যোগদানের বছরখানেকের মধ্যেই আমি যুগান্তরের মহকুমা ও জেলা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হই। এই নেতারা হলেন—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্যামানন্দ সেন, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, কুশা রায়, জগদীশ মজুমদার প্রভৃতি।

আই.এ.পাশ করার পর আমি পড়তে যাই কলকাতায়। সেখানে সিটি কলেজে ভর্তি হই, থাকতাম রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে। কলকাতায় এসে যুগান্তর দলের আরো অনেক নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল—এঁরা হলেন কিরণদা, ভূপেনদা, সতীশদা এবং আরো অনেকে। কলকাতায় তখন ছাত্র সংগঠন ছিল দুটি, আমাদের যুগান্তরের প্রভাবাধীন ছাত্র দলের নাম ছিল Bengal Provincial Students Association সংক্ষেপে B.P.S.A আর অন্যটির নাম ছিল All Bengal Students Association বা ABSA। আমি B.P.S.A-তে যোগ দিয়ে কাজ সুরু করলাম, তাছাড়া যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ তো রাখতামই এবং তাদের মুখপত্র সাপ্তাহিক স্বাধীনতা পত্রিকার দপ্তরেও যেতাম। এই সময়েই জামালপুরে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে নেতারা প্রায় সবাই সেই সম্মেলন উপলক্ষে জামালপুরে যান। ময়মনসিংহ জেলার যুগান্তর নেতারা প্রায় সকলেই সেই সম্মেলনে গিয়েছিলেন। আমরা যারা কলকাতায় পড়তাম তারাও সেই সম্মেলনে যোগ দিই। আমার আসল কর্মস্থল সেরপুর থেকে জামালপুরের দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল আমাদের প্রভাবাধীন বহু ছাত্রই সেই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুও তখন জামালপুর ও পরে সেরপুরে পদার্পণ করেছিলেন। সম্মেলনের পরদিন তিনি সেরপুর যান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু'জন কংগ্রেস নেত্রী—জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি ও লতিকা বসু। সেখানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে সেদিনই তিনি কলকাতা যাত্রা করেন।

লাহোর জেলে ৬৫ দিন অনশনের পর যতীন দাস শহীদ হলেন। তাঁর এই মৃত্যুতে কলকাতার রাজনৈতিক মহলে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সুভাষচন্দ্র

নিজে গেলেন লাহোর থেকে শহীদ যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে আসতে। নির্দিষ্ট দিনে ভোর না হতেই আমরা ছাত্র যুবকরা ফুলমালা, পতাকা প্রভৃতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে গিয়ে সমবেত হলাম। বেলা বাড়ার সংগে সংগে সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। গোটা দশেকের সময় নেতারা শবদেহ নিয়ে মিছিল করে সিনেট ভবনের সামনে এসে থামলেন। সেখানে তখন বিভিন্ন ছাত্র যুব সংগঠনের তরফ থেকে শবদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হল তারপর বিশাল সেই শোক মিছিল রওনা হল কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে। এত বড় ও এত সুশৃংখল মিছিল এর আগে আর কখনও দেখিনি। ভাদ্রের কাঠফাটা রৌদ্রে মাথা পুড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পীচ গরম হয়ে যাওয়ায় পায়ে ফোস্কা পড়ার মত অবস্থা, রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ, ছাদের উপর থেকে মহিলারা জল ঢেলে দিচ্ছেন। অপরাহ্নে শোক মিছিল গিয়ে পেঁছিল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। শেষকৃত্য সম্পন্ন করে আমরা যখন হোস্টেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। এই মিছিল চলার সময় যুগান্তর বিপ্লবী দলের তরফ থেকে লাল কালিতে ছাপা একটি ইস্তাহার বিলি হয় যার শিরোনামে ছিল নজরুলের একটি কবিতার প্রথম লাইন—"রক্তে আমার লেগেছে আজিক সর্বনাশের নেশা"। তাছাড়া হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির তরফ থেকে একটি ইস্তাহার সেদিন বিলি হয়েছিল। এর পরেও এইচ, এস, আর, এ,-র অনুরূপ ইস্তাহার আমরা হোস্টেলের ঘরে পেয়েছি। এই ইস্তাহারগুলিতেই আমি সোশিয়া লিজমের কথা প্রথম জানতে পারি।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর শেরপুরে আমরা ২৬শে জানুয়ারীতে সাড়ম্বরে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আয়োজন করি। ছবি পোস্টার প্রভৃতি দিয়ে আমরা সভাস্থল সাজিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শপথ বাক্য পাঠ এবং নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করে আইন অমান্যের মহড়া দিই, গান্ধীজির ডাণ্ডী অভিযানের মধ্য দিয়েই সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন কার্যতঃ সুরু হয়ে যায়। এই সময়েই '৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ঘটে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীরা সেদিন সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে দখল করেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার। এই ঘটনার সংবাদ আমাদের উল্লাস ও উত্তেজনা এমন জায়গায় নিয়ে যায় যে কংগ্রেসের জনসভাতেও আমরা এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানাই।

কিছুদিন পর শেরপুরে আমরাও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করি

আবগারী দোকানে গণ পিকেটিংএর মাধ্যমে। অপরাহ্নে পুলিশ এসে সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। আমি কিন্তু সেদিনকার আন্দোলনে যোগ দিতে পারিনি। সম্ভাব্য গোলযোগের আশংকায় আমার দাদামশায় কয়েকদিন আগেই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বগুড়ার বাড়ীতে।

কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তাতে সফল হয়নি। বগুড়া যাবার সাথে সাথেই আমি ঘটনাচক্রে সেখানকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। সেখানে যাবার পরদিন বগুড়ার কংগ্রেস নেতা সুরেশ দাশগুপ্ত আমাকে তাঁদের সভায় গান গাইতে ও বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। আমার বক্তৃতা শুনে তাঁরা খুশী হন এবং জেলার বিভিন্নস্থানে আমাকে বক্তৃতা দিতে নিয়ে যান। আমার অভিভাবকেরা ভয় পেয়ে আমাকে রংপুরে কাকার বাড়ীতে পাঠান। সেখানে গিয়ে আমি সংবাদপত্রে শেরপুরের আন্দোলন ও বন্ধুদের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানতে পারি। দু'তিন দিন সেখানে থাকার পর কাকীমার কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে আমি শেরপুর ফিরে আসি। এসে জানতে পারি গ্রেপ্তার হওয়া স্বেচ্ছা সেবকদের তিন মাস করে কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে এবং শৈলেনদা, আমি ও বিজয় দাস প্রমুখ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সামাজিক বয়কটের আন্দোলন চালানো। কংগ্রেসের নির্দেশানুযায়ী আমরা মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করি না এবং বিচারে শৈলেনদার আট মাস এবং আমাদের দু'জনের ছ'মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সরিষাবাড়ীর তরুণ কর্মী শান্তিময় রায়ও সেইদিনই ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। শেরপুরে আমরা কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুললেও মুসলিম জনগণকে সামিল করতে পারিনি। এর বিপরীত চিত্র কিন্তু দেখা যায় মাত্র দশ মাইল দূরবর্তী আমাদের মহকুমা শহর জামালপুরে—সেখানকার মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। তাঁদের বেশ কয়েকজন কারাবরণও করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ, তাঁর কন্যা রাজিয়া খাতুন, আব্দুল হামিদ, তৈয়ব আলি প্রমুখ। পরবর্তীকালে নাসির সাহেবকে লীগপন্থী দুর্বৃত্তরা একবার প্রচণ্ড প্রহার করে অজ্ঞান অবস্থায় পথের ধারে ফেলে রেখে যায়। তবু কিন্তু তিনি আন্দোলন পরিত্যাগ করেননি। তার কন্যা রাজিয়া আজীবন কুমারী থেকে কংগ্রেসের কাজ করে

যান। পাকিস্থান আমলে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক হিসাবে মহিলা আন্দোলনে যোগ দেন।

'৭১ সালে পাক বাহিনী জামালপুর শহর ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন হামিদ সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর পুত্র শাহ নাওয়াজ এখন বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত।

কারাদণ্ডাদেশের পরদিন আমাদের ময়মনসিং জেলে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে দেখি জেলার অন্যান্য স্থান থেকেও অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা সবাই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী, প্রথম শ্রেণীভুক্ত কেউই হননি। কাজেই গোলমাল বাঁধলো তাদের জেলের পোষাক পরানো নিয়ে। পরে অবশ্য কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের পোষাক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। দিন সাতেক বাদেই আমাদের তিনজনকে বদলী করা হল দমদম স্পেশ্যাল জেলে। সেখানে এসে অনেক নেতা ও কর্মীদের সাথে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল। কলকাতা ও বিভিন্ন জেল থেকে গ্রেপ্তার করে অনেককেই তখন সেখানে রাখা হয়েছিল। এ জেলের চারদিকে কোন দেওয়াল ছিল না, ছিল কাঁটা তারের বেড়া। এখানে এসে একদিকে যেমন বহু গান্ধীবাদী নেতা, কর্মী অন্যদিকে তেমনি অনুশীলন ও যুগান্তর দলের অনেক নেতার সঙ্গে পরিচয় হল। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা প্রমুখ বড় বাজারের কংগ্রেস নেতারা যে দোতলার ঘরটিতে থাকতেন আমরা তার নামকরণ করেছিলাম 'হাউস অব লর্ডস'। এ জেলে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না। শুধু রাতে বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলি তালা বন্ধ করা হত। ধোবী থানা সংলগ্ন ওয়ার্ডে থাকতেন গারোয়ান ধর্মঘট মামলার আসামী বঙ্কিম মুখার্জী, আবদুল হালিম প্রমুখ কম্যুনিস্ট নেতারা। রোজ বিকেলে ওয়ার্ডের সামনের বারান্দায় তাঁরা মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে ক্লাস করতেন, বক্তৃতা দিতেন বঙ্কিম মুখার্জী। আমাদের সে ক্লাসে যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। আমরা পথ চলতে চলতে দূরে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা মাঝে মাঝে শুনতাম।

দমদম জেলে যুগান্তর ও অনুশীলনের যে নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা হলেন বগুড়ার যতীন রায়, ২৪ পরগণার হরিকুমার চক্রবর্তী, অজয় চট্টোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের জ্ঞান মজুমদার, সূর্য্য সোম ও আরও অনেকে। আর একজন কর্মীর সংগে পরিচয় ঘটেছিল যার নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ্য তিনি হলেন দেবজ্যোতি বর্মণ। House of Lords-এর দোতলা সিঁড়ির কাছে তিনি থাকতেন। তাঁর চৌকিতে থাকত বই পত্রিকা প্রভৃতির স্তূপ। সারাদিনই

দেখতাম তিনি পড়াশুনা করছেন, পরে বহরমপুর রাজবন্দী শিবিরেও তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। জেলের বাইরে তাঁকে দেখেছিলাম নিষিদ্ধ বইয়ের যোগানদার হিসাবে।

দমদম জেল থেকে মুক্তি পাই সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের শেষ দিকে। তার কয়েক দিন আগেই জানতে পারি বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধের খবর। এই চমকপ্রদ সংবাদে আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সেদিন যে কোন স্তরে পেঁৗছেছিল তা সহজেই অনুমেয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গোয়াবাগানে কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকদের জন্য যে অস্থায়ী আস্তানা ছিল সেখানে গিয়ে উঠলাম। সন্ধ্যায় ফ্রি প্রেসের সম্পাদকের সংগে দেখা করতে গেলাম জেল থেকে আনা বিশিষ্ট এক নেতার চিঠি নিয়ে। তিনি আমাকে বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত করে কাগজপত্র এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে দিলেন। শেরপুরে ফিরে গিয়ে আমি সেখানকার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আন্দোলন সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পাঠাতে লাগলাম। সেখানে ফিরে দেখি পরিস্থিতি বেশ থমথমে ও উত্তেজনাপূর্ণ। এর কারণ ছিল দুটি বন্দুক অপহরণ ও সালদার স্বদেশী ডাকাতি। এই ঘটনা সম্পর্কে প্রবোধ রায়, নগেন্দ্র মোদক, সুধেন্দু দাস প্রমুখ কয়েকজন যুগান্তর কর্মী ধরা পড়েন এবং রবি নিয়োগী, প্রমথ গুপ্তরা আত্মগোপন করেন। অপহৃত বন্দুক দুটির একটি ছিল আমার দাদামশায়ের নামে লাইসেন্স করা আর অন্যটির মালিক ছিলেন সুরেশচন্দ্র নাগ। এই অপহরণ কার্যে সাহায্য করেছিল আমার বোন রাণী এবং সুরেশ বাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বীরেশ নাগ। যুগান্তর দলে মেয়েরাও তখন যোগ দিতে সুরু করেছিল। কিছুদিন আগে রাণীও দলে যোগ দেয়। পুলিশ সন্দেহ করলেও প্রমাণাভাবে তাদের ধরতে পারেনি।

তিরিশ দশকে ময়মনসিং জেলার 'সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম ঘটনাটি জামাল-পুর শুটি কেস' নামে পরিচিত। এটি ঘটে ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ পার হওয়ার খেয়া ঘাটে। আমি তখনও দমদম জেল থেকে মুক্তি পাইনি। ময়মনসিং থেকে যুগান্তর দলের কয়েকজন সশস্ত্র কর্মী শেরপুর যাচ্ছিলেন বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। পুলিশ খবর পেয়ে জামালপুর গোদারা ঘাটে তাদের ধরতে যায়। বিপ্লবীরা পুলিশ দেখে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টর ও তার সহকারীও গুলি ছুঁড়তে থাকে। দুপক্ষ থেকে গুলি চললেও কেউ হতা-হত হয়নি। পুলিশ ভয় পেয়ে স্থান ত্যাগ করলে বিপ্লবীরাও নিরাপদে সরে আসে। পরবর্তীকালে এই মামলায় বিধু সেন, খোকা রায় প্রমুখ কয়েজনকে পাঁচ

বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। সালাদা ডাকাতির ঘটনাটি হয় এর কিছু দিন পর।

আইন অমান্য আন্দোলন তখন ঝিমিয়ে পড়েছে। সরকারের সঙ্গে গান্ধীজির আন্দোলন প্রত্যাহারের কথাবার্তা চলছে। শৈলেনদা তখনও জেল থেকে ছাড়া পাননি। বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর রবি ও প্রমথ শেরপুর ফেরার পথে মাঝরাতে শহরের উপকণ্ঠে প্রহরারত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে পুলিশ কিন্তু তাদের না চিনেই গ্রেপ্তার করেছিল। ধরা পড়ার আগে তাদের রিভলবারটি তারা পাশের ক্ষেতে লুকিয়ে রাখে পরদিন তারা সেটি সংগ্রহ করার জন্য আমাদের খবর পাঠায়। কিন্তু আমরা সংগ্রহ করার আগেই অনুশীলনের এক কর্মী ধীরেন গুহ মজুমদার সেটি নিয়ে এসে আমাকে দেয়। এ ধরনের ব্যাপার আজকের দিনে অবশ্য অভাবনীয়। কিছু দিন বাদে এই ডাকাতি মামলা বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। এবং বিচারে ছয় জনের সাত বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই ডাকাতির ঘটনাটি যদিও কোন দিক থেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তবুও বৃটিশ সরকার এই ঘটনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কিছুদিন পর এই মামলায় দণ্ডিত আসামীদের সকলকেই আন্দামানে পাঠানো হয়।

৩০ সালে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে সে বছর আমার কলেজে পড়া ও বি, এ পরীক্ষা দেওয়া দুটোই বাদ যায়। মামলার ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর আমি তাই পুনরায় কলেজে পড়া ও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতা গেলাম।

গোলটেবিল বৈঠক থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গান্ধীজি আবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু সে আন্দোলনে তেমন সাড়া মিলল না। কলকাতা ফিরে গিয়ে আমি দলের ও ছাত্র আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু এবারও আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না। পরীক্ষার মাত্র কয়েক দিন আগে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় দু'জন বন্ধু আমাকে হোস্টেল থেকে বগুড়ায় বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর আমি সুস্থ হই এবং শেরপুর ফেরার উদ্যোগ গ্রহণ করি, কিন্তু যেদিন রওনা হব সেদিন ভোর রাতেই পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে B. C. L. আমাকে গ্রেপ্তার করল। শেরপুর ফেরা আর হল না, মাসখানেক বড়দা জেলে রেখে Comfirmation order হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পাঠানো হল বহরমপুর বন্দী শিবিরে। সেই বন্দী শিবিরে আটক থাকি প্রায় সাড়ে তিন বছর তারপর আমাকে গ্রামে অন্তরীণাবদ্ধ রাখা হয় আরও তিন বছর।

ক্যাম্পে গিয়ে দেখি বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অনেক রাজবন্দীই সেখানে আছেন। আমি প্রথম গিয়ে স্থান পেলাম ইষ্টার্ন ব্যারাকের একটি ঘরে, সে ঘরের অন্য বাসিন্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার অমল রায় আর একজন চট্টগ্রামের জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী। মাসখানেক পর আমি পয়েন্টার্ণ ব্যারাকের একটি ঘরে চলে যাই, সে ঘরে তিনজন থাকতেন তারা হলেন ঢাকার শশাঙ্ক (কমেট) দাসগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং চট্টগ্রামের সুবোধ চৌধুরী। কিছুদিন পর ভুপেশ গুপ্তও সেই ঘরে এসে থাকেন। পরে বিলেত যাওয়ার আগে তাকে বদলী করা হয় প্রেসিডেন্সী জেলে। শেরপুরেব মাত্র একজন রাজবন্দী। পুলিশ বকসীই সেই ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি থাকতেন টালি ব্যারাকে। ক্যাম্পে খেলাধুলা, গান বাজনা, লেখাপড়া সব কিছুরই মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল। সেখান থেকে পরীক্ষা দিয়েই ৩৩ সালে আমি বি, এ পাশ করি। স্কুল কলেজের লেখা-পড়া ছাড়া অন্য ধরনের পড়াশুনারও কিছুটা ব্যবস্থা ছিল। Imperial Library থেকে মাসে একবার করে বই আসত তাছাড়া আমরা ভাতা বাবদ পাওয়া টাকা থেকে নিজেদের পছন্দমতো বইও কিনতাম। তবে আন্দামানে বন্দীরা যেমন নিয়মিত পড়াশুনার জন্য ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখানে পড়াশুনা চলতো ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং যার যা রুচিমতো। সশস্ত্র বিপ্লবসংক্রান্ত বইপত্র 'সেন্সর'-এ আটকে দিত কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক মার্ক্সবাদ সংক্রান্ত বই সম্পর্কে তেমন কঠোরতা ছিল না। একবার এঙ্গেলস-এর একটি বই "origin of family & private property" censored and passed হয়ে নির্বিঘ্নে আমার হাতে এসে গেলেও বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' censor-এ আটকে যায়। রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদ সম্পর্কে যে দু'টি বই পড়ে আমি প্রথমে আকৃষ্ট হই তা হল গোর্কির 'মাদার' এবং জন রীড এর—Ten days that shook the world। এর পরে অবশ্য মার্ক্সবাদ বিষয়ক আরও দুই একখানা বই আমি পড়েছিলাম ; এবং তারপর আমাদের রাজনৈতিক মত ও পথ সম্বন্ধে নূতনভাবে চিন্তা করেছিলাম। মার্ক্সবাদের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হলেও তখনও সে মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করিনি।

মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসির খবর পেয়ে আমরা যে দিন শোকসভা করি সেদিনই সকালে চট্টগ্রাম জেল থেকে কয়েকজন রাজবন্দী এসে বহরমপুর ক্যাম্পে পৌঁছান ; তাদের কাছেই আমরা শুনি মাষ্টারদার ফাঁসির নির্মম ও অমানুষিক কাহিনী—মধ্যরাতে অসুস্থ সেই বন্দীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে অজ্ঞান

অবস্থায় তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গান, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে আমার অনুরাগ জন্মসূত্রে পাওয়া। ছোট-বেলা থেকেই আমি মোটামুটি গান গাইতে পারতাম। বড় হয়ে সভা মিছিলে স্বদেশী গান গাইতাম। আরও কিছু দিন পর গাইতাম নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু", "কারার ঐ লৌহ কপাট", "শিকল পরাই ছল রে মোদের" প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ গানগুলি বোধ হয় মোটামুটি ভাল গাইতাম, কারণ তা শুনে শ্রোতারা উদ্বুদ্ধ হতেন নেতারাও বিভিন্ন সভায় আমাকে গাইতে নিয়ে যেতেন। আরও পরে কলেজে পড়ার সময় কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুলের গজলও গাইতাম, তখন পর্যন্ত কিন্তু কারো কাছে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে গান শিখতাম না। বহরমপুর ক্যাম্পে যেদিন পৌঁছি সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় একটি গানের আসরে যোগ দিই। সেখানে তবলায় সংগত করছিল আমারই এক পুরানো বন্ধু দীনেশ দাস। তার সাথে পরিচয় হয়েছিল দমদম জেলে। সে জামালপুরের ছেলে, থাকত বরিশালে, গান বাজনায় তার ছিল সহজাত অনুরাগ ও নৈপুণ্য, ক্যাম্পে অনন্ত অবসর, বাদ্য যন্ত্রেরও অভাব নেই তাই তার সঙ্গে মিলে আমি নিষ্ঠা সহকারে গান বাজনার চর্চা শুরু করে দিলাম। আমার কিছুটা দুর্বলতা ছিল তাল বোধে, তার সাহায্যে সেটা দূর হয় এবং আমি মোটামুটিভাবে গায়ক হয়ে উঠি। পরবর্তীকালে আমি যখন ময়মনসিং জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সম্পাদক ও প্রধান পরিচালক হই তখন এই সংগীত শিক্ষা খুব কাজে লেগেছিল।

প্রায় বছরতিনেক ক্যাম্পে থাকার পর অন্তরীণ আদেশ দিয়ে একদিন আমাকে পাঠানো হ'ল হুগলী জেলার পোলবা থানায়। যাবার সময় খুবই ভয় হয়েছিল কারণ গ্রামে কোনদিন থাকিনি এবং সাংসারিক ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অনভিজ্ঞ এবং অপটু। সেখানে পৌঁছে দেখলাম থানার ঠিক বিপরীত দিকেই আমাদের জন্য তৈরী দু'টি টালির ঘর। একখানিতে আমার ঠাঁই হোল। একটি তক্তপোষ ও টেবিল চেয়ার দেওয়া হ'ল, তাছাড়া দেওয়া হল রান্না খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র। নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রাইমাস ষ্টোভ আমি চুঁচুড়া থেকেই কিনে নিয়ে এসেছিলাম। দুয়েক দিনের মধ্যে আর একজন বন্দী অন্তরীণ আদেশ নিয়ে এসে পৌঁছলেন, তার নাম ছিল গৌর দাসগুপ্ত—অনুশীলনের সঙ্গে কিছুটা সংযোগ ছিল। গ্রেপ্তার করেই তাকে পাঠানো হয় অন্তরীণে। প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়ি খাওয়া দাওয়া নিয়ে। রান্নাবান্না কিছুই করতে পারি না।

গৌরবাবুও তথৈবচ, তবে হাতের কাজে তার কিছুটা পটুতা ছিল। প্রথমদিকে বেশ কিছু দিন আমরা কেবল নানা রকম সেদ্ধ দিয়েই ভাত খেয়েছি, মাসখানেক পর রান্নার লোক পাই এবং আস্তে আস্তে আমরাও কিছুটা রান্না করতে শিখি। গ্রামের একটা নির্দিষ্ট সীমানার ভিতরেই আমাদের চলাফেরা করতে হ'ত তার বাইরে খাওয়া ছিল দণ্ডযোগ্য অপরাধ। তাছাড়া কোন ছাত্র বা শিক্ষকের সংগে মেলামেশা করাও ছিল বারণ। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত থাকতে হোত বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যেই। আমরা অবশ্য কিছুদিন পর থেকে এসব নিয়ম কানুন প্রায় কোনটাই মানতাম না। গ্রামে অন্তরীণ অবস্থা থেকে পালিয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন ছিল না তবে কেউই পালাত না কারণ সেটা তখন আমাদের কোন দলেরই কর্মসূচীতে ছিল না।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই পরিচয় হল। সর্বাগ্রে পরিচয় হল গ্রামের একমাত্র মুদী দোকানের মালিক তথা পোষ্টমাষ্টারবাবুর সঙ্গে। একই সঙ্গে তিনি উভয় দায়িত্ব পালন করতেন। তাছাড়া সৌহার্দ্য হল আধা সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে—তাঁর ছিল গান শেখার সখ, তাই আমার কাছে গান শিখতে শুরু করলেন। থানার লোকেরা এতে কোন আপত্তি করত না। আমরা রোজই ডাক্তারখানায় যেতাম, এর বিশেষ কারণ ছিল ডাক্তার-বাবু যে অমৃত বাজার পত্রিকা রাখতেন সেটি পড়া; ষ্টেটসম্যান এবং সঞ্জীবনী ছাড়া অন্য কোন পত্রিকা পড়া আমাদের নিষিদ্ধ ছিল। কম্পাউণ্ডার অনুপস্থিত থাকলে অনেক সময় আমরা মিকশ্চার বানিয়েও রোগীদের দিতাম। কিছুদিন পর আমি চোখ দেখানোর জন্য প্রেসিডেন্সী জেলে যাই, সেখানে অনেক রাজবন্দীর সংগে দেখা ও আলোচনার সুযোগ ঘটে—এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন গোপাল হালদার ও ক্ষিতীশ রায় চৌধুরী। সেখানে দেখি অনেকেই সাম্যবাদী আদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন এবং বাইরে গিয়ে সমাজবাদী সংগঠনে কাজ করার কথা ভাবছেন। তাঁদের কাছেই জানতে পারি যে সাম্যবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য প্রথমেই যে বইটি পড়া অত্যাবশ্যক তা হল কার্লমার্ক্সের 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো,' পোলবা ফিরে এসে আমার প্রথম চেষ্টা হয় ঐ বইটি সংগ্রহ করে পড়া। মুদিখানার মালিক তথা পোষ্ট মাষ্টার মশায়ের ছেলে ছিল কলকাতার কোন এক কলেজের ছাত্র। তার সাথে আমার আগেই কিছুটা পরিচয় হয়েছিল এবার তার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হলাম এবং তার সাহায্যেই বইটি সংগ্রহ করলাম সেটি পুলিশ কর্তৃ-পক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত না হওয়ায় ঘরে বসে রাত জেগে পড়ে ফেললাম।

আমার মনে নানা নতুন চিন্তা ঢেউ তুলল। বৃটিশকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করব এতদিন এটাই ছিল একমাত্র ভাবনা, তারপর সে স্বাধীন সরকারের চেহারা কি হবে এবং তার কর্মসূচিই বা কি থাকবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাই আমাদের ছিলনা। এ বই পড়ে আমার মনের অনেক অন্ধকার কেটে গেল। শোষণহীন নতুন সমাজের একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল, স্পষ্ট বুঝলাম যে স্বাধীনতা পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না, থেকে যায় আরও বহু সমস্যা—মানুষের শোষণ মুক্তির প্রশ্ন। এ বইটি পড়ে জানলাম শ্রেণী শোষণ ও সংঘাতের অবিরাম কাহিনী, বুঝলাম সেই শোষণ অবসানের প্রয়োজনীয়তা। মনে হল আবার নতুন করে সুরু করতে হবে আমার রাজনৈতিক জীবন।

এরপর প্রেসিডেন্সী জেলে যাই আরও দু'বার আইনের প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার অজুহাতে। সেখানকার বন্ধুদের পরামর্শে এ কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। ঐ দু'টি পরীক্ষাতেই পাশ করলেও শেষ পরীক্ষাটি আর দেওয়া হয়নি কারণ তার আগেই ছাড়া পেয়ে যাই।

পোলবায় আটক থাকার শেষের দিকে দু'বার আমি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমবারে হুগলী ইমামবাড়া ও দ্বিতীয়বার শ্রীরামপুর ওয়াল্‌শ্‌ হাসপাতালে থাকি। সুস্থ হয়ে ফেরার কয়েকদিন পরেই আমাকে বদলী করা হল আসানসোলের বারাবণীতে। কিছুদিন সেখানে থাকার পর আবার আমি সেই একই Bacilary dysentry রোগে আক্রান্ত হই তখন আমাকে ভর্তি করাহয় বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালে, প্রায় মাসাধিককাল চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলে আমাকে সগৃহে অন্তরীণ আদেশ দিয়ে পাঠানো হয় বগুড়ায়। মাসকয়েক বাড়ীতেই থাকি। তারপর মুক্তি লাভ করি ১৯৩৭ সালের শেষ দিনটিতে। আমার জীবন বৃত্তান্তের প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় কয়েকদিন বাদে শেরপুরে পৌঁছাবার পর, সেখানে এসে দেখি বন্ধুরা প্রায় সবাই মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন, এবং ভাবছেন পুরানো পথ ছেড়ে নূতন আদর্শ ও পথ গ্রহণ করে নূতন করে রাজনৈতিক জীবন শুরু করার কথা। রবি নিয়োগী ছাড়া পেলেও তখনও শেরপুরে ফেরেনি, শুনলাম সে কলকাতায় কম্যুনিষ্ট নেতাদের সংগে আলাপ আলোচনা করছে শিগগীর-ই ফিরবে।

কিছুদিনের মধ্যেই কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ, ধরণী গোস্বামী প্রভৃতি

নেতাদের উপস্থিতিতে মণি সিং, খোকা রায়, রবি নিয়োগী, পুলিন বক্সী, আলতাব আলি, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ও পবিত্রশংকর রায়—এই সাতজনকে নিয়ে ময়মন সিং কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হল, এর অল্প কয়েকদিন পরে আমি প্রমথ গুপ্ত, হেমন্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি পার্টির সদস্য পদলাভের গৌরব অর্জন করি, তখন পার্টি কর্মসূচীর প্রধান কথা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাপ্তাহিক মুখপত্রের নামও ছিল "ন্যাশনাল ফ্রন্ট"। কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য গড়া এবং শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন ও সংগঠন তৈরী করা —এই দু'টিই ছিল তখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পূর্বেও আমাদের হাতেই ছিল, কাজেই সেখানে আবার নেতৃত্বে ফিরে আসতে বিশেষ কোন অসুবিধা হল না। মধুদার সাহায্যে সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে আমরা শেরপুর সফরে আনার ব্যবস্থা করলাম। জমিদার প্রধান ছোট্ট শহর, সেখানে কংগ্রেসের বামপন্থী ও সংগ্রামীরূপে পরিচিত সর্ব ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্রের আগমনে বিরাট উৎসাহ, উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। পুলিনদা ও আমি হলাম অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আর শৈলেন চৌধুরী হলেন সভাপতি। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হল, বহুসংখ্যক যুবক এসে নাম লেখালো স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। অভূতপূর্ব জনসমাগম হল তাঁর আগমন উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায়। এতে আমাদের কাজের সুযোগ খুবই বেড়ে গেল এবং আমরা সে সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহারও করলাম।

কৃষক আন্দোলন গড়ার সুযোগ কিন্তু এলো সম্পূর্ণ অন্যভাবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক পুরানো স্থানীয় নেতা ছিলেন শ্রীকামিনীমোহন দাস। তিনি আগেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের দাবী দাওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে আন্দোলন করতেন। শহরের পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে তিনি এই সময় অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং আমাদেরও সেই সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। উদ্যোক্তাদের বক্তৃতার পরে আমি ও রবি সভায় দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বলি। সে বক্তব্যের মূল কথা ছিলঃ এই যে অনুন্নত নামে পরিচিত মানুষেরা সকলেই মূলতঃ কৃষক। কাজেই তাদের মূল সমস্যা হল জমির অধিকার ও চাষবাস সংক্রান্ত। তারা যে অচ্ছুত, তাদের যে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই—এ সবেরই মূল কারণ হল তাদের চরম দারিদ্র্য, দরিদ্র বলেই তারা অশিক্ষিত এবং মানুষের প্রাপ্য যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত তাই

সামাজিক অধিকার পেতে হ'লেও 'নানকার' প্রথা লোপ ও কৃষি ব্যবস্থা বদলের জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে। আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না। জমিদার বাড়ীতে 'বেগার' দেওয়া বন্ধ করতে হবে। যে দেবী পূজার মণ্ডপে তাদের প্রবেশ অধিকার নেই অস্বীকার করতে হবে সেই প্রতিমা বহন ও বিসর্জনের কাজ।

এই বক্তৃতার পর সভার চেহারা পাল্টে গেল। 'নানকার' প্রথা লোপ মন্দিরে প্রবেশ, অঞ্জলি দান প্রভৃতি বিভিন্ন অধিকার দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হল, স্থির হল যে পরদিনই দু'টি প্রধান দেবালয় ও বিভিন্ন জমিদার বাড়ীতে তাদের দাবীগুলো জানিয়ে অবিলম্বে দাবীপত্র পেশ করা হবে। সেই পত্রে একথাও লেখা থাকবে যে, উক্ত দাবীগুলি গৃহীত না হলে আসন্ন দুর্গাপূজার সময় 'বেগার' দেওয়াও প্রতিমা বহনের কাজ বন্ধ করা হবে।

একজন বাদে কোন জমিদারই এই দাবী মেনে নিল না। ফলে সুরু হয়ে গেল গ্রামে গ্রামে নানকারীদের 'বেগার' দেওয়া বন্ধের আন্দোলন। জমিদার পক্ষে তখন পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এন্ সি চ্যাটার্জী, মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী প্রমুখকে এনে এক জনসভার আয়োজন করল। আমরা সে সভায় কিছু বলতে চাইলে সভাপতি অনুমতি দিলেন না। আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে গ্রামোফোনের চোঙের সাহায্যে আমাদের কথা বলতে সুরু করি। এর ফলে বহিরাগত নেতাদের কথা আর শোনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে গোলমালের মধ্যে সভা আর জমল না; নেতারাও স্থান ত্যাগ করেন। এরপর গ্রামে গ্রামে আমরা যেমন 'নানকার' প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার জোরদার করি জমিদাররাও তেমনি প্রতিমা বহনের জন্য বাইরে থেকে হিন্দুস্থানী মজুর সংগ্রহেরও জেলা থেকে সশস্ত্র পুলিশ আনার চেষ্টা চালায়। এই কাজের জন্য যে সংখ্যক হিন্দুস্থানী মজুর জমিদাররা সংগ্রহ করতে পেরেছিল আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে তাদের অনেকেই জমিদারবাড়ী থেকে পালায়, তবে বিসর্জনের দিন আন্দোলন মোকাবিলার জন্য ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশের একটি দল যথাসময়ে এসে পেঁছায়। জমিদারদের বিরাটাকার প্রতিমাগুলি অবশ্য নিজ নিজ গৃহ সংলগ্ন আঙ্গিনা ও পুকুরেই বিসর্জন দিতে হল তবে মধ্যবিত্তদের ছোট প্রতিমাগুলি পাড়ার উচ্চবর্ণের কিছু সংখ্যক যুবকই বহন করে নদীর ঘাটে নিয়ে যায়। পথে সেদিন বেলা ১০টা থেকেই অসংখ্য কৌতুহলী মানুষের ভিড় দুধারে দাড়ানো সশস্ত্র পুলিশ। সেই পথ দিয়ে সে দিন মিছিল করে দশ

সহস্রাধিক লাঠিবল্লমধারী নানাকারী কৃষক জনতা আওয়াজ তোলে ; নানকার প্রথা রদ কর, জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক।

নানকার বিরোধী এই আন্দোলন ৩।৪টি থানার অন্তর্গত বহুসংখ্যক গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল জোরদার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন। জমিদারেরা অবশ্য এর পরেও জুলুম অত্যাচার চালিয়েছে। মামলা মোকদ্দমা করেছে কিন্তু নানকার প্রথাকে আর চালু করতে পারেনি। পরবর্তী সেটেলমেন্টের সময় নানকার প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আন্দোলনের ফলে উঠে গেল 'ভাওবাওলী' নামক আর একটি শোষণ ভিত্তিক প্রথাও—যাতে চাষীকে খাজনা হিসাবে নগদ টাকা এবং ফসল দুইই দিতে হত। কান্দুলি, ভটপুর প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি গ্রামে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। রামু নাগের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে এই প্রথা উঠে যায় এবং পরে ঐ গ্রামগুলিতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। এই কাল পর্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালেই কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সভার প্রথম জেলা সম্মেলন। সম্মেলনে প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করতে আমি কয়েকদিন আগেই সেখানে যাই। নগেন সরকার, ওখালি নাওয়াজ, প্রবীর গোস্বামী, শিশির রায় প্রমুখ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে এখানেই পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এই সম্মেলনেই প্রথম শুনি বঙ্কিম মুখার্জীর দৃপ্ত ভাষণ। উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে আমি গেয়েছিলাম নজরুলের অনুদিত ইন্টারন্যাশনাল সংগীত—"জাগো অনশন বন্দী ক্রীতদাস।" বিলাত থেকে ফেরার পর জ্যোতি বসুও এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সম্মেলনে বহু সংখ্যক মুসলমান কৃষক যোগ দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে নালিতাবাড়ীর জলধর পাল অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলে হাজং ডালু প্রভৃতি উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যে শক্তিশালী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলেন। নালিতাবাড়ীর বহুগ্রাম আমাদের অঞ্চলের সংলগ্ন। সেখানে যাতায়াতের পথও শেরপুরের উপর দিয়েই তাই সেখানকার আন্দোলন গড়ার কাজে আমরাও কিছুটা সাহায্য করেছি। তবে সেখানে আন্দোলন সংগঠনকে জোরদার করে তোলার সর্বাধিক কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে জলধর ও তার স্থানীয় সহকর্মীদেরই।

৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কম্যুনিস্ট পার্টি তখন তীব্র বিরোধিতা করল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের; আওয়াজ তুলল : 'না এক ভাই, না এক পাই।' আমরা পোস্টার, ইস্তাহার ও বক্তৃতা দিয়ে সুরু করলাম যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার। সাথে সাথে নেমে এলো সরকারী দমননীতির খড়্গ। D.I.R. অনুযায়ী গতিবিধি নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী হল কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতা ও কর্মীদের উপর, অনেককে দেওয়া হল বহিষ্কার আদেশ, বহু লোককে আটক করা হল জেলে। আমার উপরও নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলন থামলো না বরং এগিয়েই চলল। রাতের অন্ধকারে শহরের বিভিন্ন স্থানে গেরিলা কায়দায় হর্নের সাহায্যে একযোগে বক্তৃতা দেওয়া, বিভিন্ন কায়দায় সাইক্লোস্টাইল করা ইস্তাহার বিলি—এই ভাবে সর্বত্র আমাদের কাজ চলত। পুলিশ আমাদের ধরতে পারতো না।

কিছুদিন পর জামালপুরে অনুষ্ঠিত এক রবীন্দ্র জয়ন্তীতে প্রবন্ধ পাঠের জন্য পুলিশ আমাকে নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। জামালপুরের কম্যুনিষ্ট নেতা আশু দত্ত ও আর এস পি. নেতা অধীরবাবুকেও পুলিশ ঐ একই মামলায় গ্রেপ্তার করে। মহকুমা কোর্টে বিচারে আমাদের আট মাস সশ্রম কারা দণ্ডাদেশ হয়। জেলা জজ কোর্টে আপীল করলে আমাদের কারাদণ্ড বাতিল করে নামমাত্র অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। জরিমানার সেই টাকা (জন প্রতি ১ টাকা হিসাবে) আমাদের আইনজীবীই কোর্টে জমা দিয়েছিলেন। কারামুক্তির সংবাদটি তারযোগে যেদিন পাই সেদিনই অর্থাৎ ১৫ই আষাঢ় ছিল আমার বিয়ের তারিখ। বিবাহের আয়োজন হয়েছিল আমার নিজ বাড়ীতেই, কারণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী রাতে আমার বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আমাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অল্প দিন পরেই আমরা যে বড় কাজটি হাতে নিই তা হল নালিতাবাড়ীতে ফ্যাসীবাদ বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মামসুল হুদা। জলধর তখনও আত্মগোপন করেই ছিল, প্রকাশ্যে কাজ শুরু করেনি তাই আমরা কয়েকজন কর্মী শেরপুর থেকে নালিতাবাড়ী যাই ঐ সম্মেলনের কাজে সাহায্য করতে। সম্মেলন পুরোপুরি সফল হয়েছিল।

'৪২ এর জুনে হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী

পরিবর্তন করে। যুদ্ধকে তখন অভিহিত করা হয় 'জনযুদ্ধ' নামে এবং বিশ্বের জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হয় মিত্রশক্তিকে জয়ী করার জন্য। বৃটিশ সরকার কিন্তু ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী না মেনে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠালো। তার পরেই শুরু হয় ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলন। স্থানীয় ভাবে এই আন্দোলনে আমরা প্রথম দুইদিন যোগ দিই এবং জনতাকে ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগই আমরা দিইনি। পরে জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা আন্দোলন থেকে বিরত হই। আমাদের অঞ্চলে অবশ্য এই আন্দোলন কোনখানেই ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়ায়নি, এমনকি খুব উত্তাল হয়েও ওঠেনি। আমি কিন্তু আজও মনে করি যে পার্টির আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার এই নীতি অভ্রান্ত ছিল না। আন্দোলনে যোগ দিলেই যে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হতে হবে এমন কি কোন বাধ্যবাধকতা ছিল? এই আন্দোলনে যোগদানকারী সব কংগ্রেস কর্মী-ই কি নাশকতামূলক কাজের সামিল হয়েছিল? তা কিন্তু হয়নি। তবে আমাদের যোগদানে ক্ষতি কি হত? সেদিনের এই ভুলের মাশুল অনেক দিতে হয়েছিল; আজও তা দেওয়া শেষ হয়নি। আরও একটা ভুল আমরা করেছিলাম সমস্ত মুসলিমদের পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে। পরবর্তীকালে রজনী পাম দত্ত আমাদের সেই ভুল ধরিয়ে দেন। কোলকাতায় এসে তিনি পার্টি সভ্যদের সভাতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ক্ষতি যা হবার তা পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে ৪২ সালেই জেলা পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুসং—দুর্গাপুরে। সেই সম্মেলনে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। তদনুযায়ী একটি গণসংগীত ও নাটকের দল এবং আর একটি নিবারণ পণ্ডিতের সারী গানের দল গঠন করা হয়। তাছাড়া জেলা শহরে গড়ে তোলা হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। উক্ত গানের দল দুটি যে শুধু সভা মিছিলেই গান গাইত তা নয়, বিভিন্ন গণসংগীত ও নাট্যাভিনয় মিলিয়ে পৃথক অনুষ্ঠান করত—যেমন একবার ময়মনসিং শহরে অমরাবতী হলে করা হয়েছিল। শুধু প্রচার নয়, এই স্কোয়াড আবার পার্টির অর্থ-সংগ্রহের দায়িত্বও পালন করত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত সেই—"হাজার কণ্ঠে তোলো আওয়াজ রুখব দস্যু দলকে আজ/দেবে না জাপানী উড়ো জাহাজ ভারতে জুড়ে স্বরাজ।"

এবং বিনয় রায়ের "হৈ হৈ হৈ জাপান ঐ / আইল বুঝি হামার টারিত / বাইরও গাঁয়ের গেরিলা জোয়ান।" প্রভৃতি গণসংগীতগুলি যে তখন জনমনে ফ্যাসি-বিরোধী চেতনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইকবালের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান—"সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামরা" গানটিকেও জনপ্রিয় করে তোলে কম্যুনিস্ট পার্টির কালচারাল স্কোয়াডের গায়করাই। এর আগে এই গানটি সভা-সমিতিতে বড় একটা গাওয়া হত না। আমাদের দেশের জনমনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা থাকলেও ফ্যাসীবাদ বিরোধী কোন চেতনাই তখন ছিল না : মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বরং কিছুটা হিটলার ভক্তিই ছিল। সেই পরিস্থিতিতে জনমনে ফ্যাসীবাদ বিরোধী চেতনা জাগাতে সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টির কালচারাল স্কোয়াডের কর্মীরাই। সেই স্কোয়াডের একজন কর্মী ছিলাম বলে আমি আজও গর্ববোধ করি।

'৪৩ সালে দেখা দিল ইতিহাসের বৃহত্তম ও সর্বাধিক কলংকজনক মন্বন্তর ; আর পরের বছর তাকে অনুসরণ করে মহামারী। পথে পথে তখন শত শত নিরন্ন মানুষের ভিড়। মহানগরীর জানলা খুললেই তখন শোনা যায় বুভুক্ষু নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার—"একটু ফ্যান দাও মা"। পার্টি তখন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও রিলিফ আন্দোলন গড়ার ডাক দেয়। অন্য কোন দল তখন এ কাজে এগোয় না। আমরা উদ্যোগী হয়ে দুচারজন কংগ্রেস ও লীগ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে 'রিলিফ কমিটি' গঠন করি এবং লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু নরনারী ও শিশুদের খিচুড়ি খাওয়ানোর দায়িত্ব নিই। তাছাড়া কিছুটা মজুত উদ্ধারের কাজও শুরু হয়, তবে মজুত মাল পাওয়া যায় সামান্য। আমাদের অঞ্চলে অবশ্য দুর্ভিক্ষ তেমন ভয়াবহ রূপ নেয়নি। দুর্ভিক্ষ ও অনাহার মৃত্যুর সর্বাধিক করাল রূপ দেখা দিয়েছিল কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল ও পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন চট্টগ্রাম নোয়াখালি ও কুমিল্লাতে। এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন করতে গিয়েও আমরা একটা গুরুতর ভুল করি। বৃটিশ সরকারই যে এই দুর্ভিক্ষের আসল স্রষ্টা তা আমরা মনে হয় বুঝিনি এবং সেইজন্য আমরা তখন সংগ্রাম করেছি কেবল মজুতদার, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে—যারা ছিল বৃটিশের দোসর বা সহকারী মাত্র। সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের ভয়ে বৃটিশ সরকার যে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণের কৌশল নিয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল তারই ফলশ্রুতি। পরিকল্পনাহীন ভাবে দেশবাসীদের কিছু

না জানিয়ে এই নীতি অনুসরণের ফলেই সেদিন ঘটেছিল পরাধীন দেশের পঞ্চাশ লক্ষাধিক হতভাগ্য মানুষের প্রাণনাশ আর আমরা তখন আসল দুশমনকে না চিনে লড়তে গেলাম বৃটিশের ক্ষুদে সাকরেদ মজুতদার-চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে।

পরের বছর দুর্ভিক্ষের অনুসরণ করে দেখা দেয় মহামারী। এই মহামারী প্রতিরোধেও কম্যুনিস্ট কর্মীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন, চিকিৎসকদল এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেরপুরেও আমরা তাই করি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন ছিলেন বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির (B. M, R, L. C.) সভাপতি। আমি সেরপুর থেকে গিয়ে তার সাথে দেখা করি এবং এককালীন দান হিসাবে কিছু টাকা জমা দিয়ে সেরপুরের জন্য একটি মেডিক্যাল ইউনিট ও ঔষধপত্র পাঠানোর আবেদন জানাই। সে অনুরোধ গৃহীত হয় এবং সাত-দিনের মধ্যেই একটি চিকিৎসক দল সেরপুরে গিয়ে কাজ শুরু করেন। আমাদের চেষ্টায় একটি অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ও তখন সেখানে স্থাপিত হয়। কয়েক মাস পর মহামারীর প্রকোপ কমে আসে।

এই '৪৩ সালেই নালিতাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় জেলা কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলন। মুজাফ্ফর আহ্মেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, ভবানী সেন, আবদুল্লা রসুল, গোপাল হালদার প্রমুখ বহু কৃষক তথা কম্যুনিস্ট নেতাই সেই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সব নেতাকেই সেরপুর থেকে নালিতাবাড়ী পর্যন্ত দীর্ঘ আঠার মাইল পথ যাতায়াত করতে হয়েছিল পায়ে হেঁটে। মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন, যুঁইফুল বসু এবং সেরপুরের অনেক মহিলা কর্মীও সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাদেরও যেতে হয়েছিল পায়ে হেঁটে। প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দেয় দশ সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান ও হাজং ডালু প্রভৃতি উপজাতীয় কৃষক। চার সহস্রাধিক লালটুপি পরা স্বেচ্ছাসেবক এই সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ছিল। কম্যুনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের লালটুপি পরার রেওয়াজ সম্ভবত এখান থেকেই শুরু হয়। এই সম্মেলনে বিনয় রায় গেয়েছিলেন তাঁর নিজের লেখা সেই আশ্চর্য গানটি—"ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে"। গানটি তিনি রচনা করেছিলেন সেরপুর থেকে নালিতাবাড়ী যাওয়ার সময় পথ চলতে চলতে। নালিতাবাড়ী যাতায়াত কালে নেতাদের প্রায় দু'দিন সেরপুরে থাকতে হয়। এই সময় আমরা তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার

সুযোগ পাই। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ আবার আমাদের কয়েকজনের বাড়ীতে গিয়ে পরিবার পরিজনের সঙ্গেও মিলিত হয়েছিলেন। সেরপুরে তারা এক বিশাল জনসভায় ভাষণও দিয়েছিলেন।

সেই বছরই দুর্ভিক্ষ মহামারীর ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমরা বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ি। ভুপেন নাগ প্রমুখ কয়েকজনকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে Red Aid Cure Home-এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং আমাকে ও পুলিনদাকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য পাঠানো হয় অন্ধের কোকনদে (কাঁকিনাড়ান)। আমাদের স্বাস্থ্যকামী সেই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল তিরিশ বা বত্রিশ। এই সময়েই বেজওয়াদাতে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলন। বহু চেষ্টার পর আমরা প্রায় সবাই সেই সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলাম। স্থানীয় কৃষক জনতার উপর সেদিন পার্টির নেতাদের অদ্ভূত প্রভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ সেখানকার দুরবস্থা দেখে দুঃখ পাই।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে আসল খল নায়ককে চিনতে না পারায় আমরা সেদিন তার বিরুদ্ধে সুফল সংগ্রাম করতে না পারলেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের ত্রাণ-কার্যে যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম তাতে কোন ভুল নেই। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ ও ধান চাল ভিক্ষা করে, লঙ্গরখানা খুলে একমাত্র আমরাই সেদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও শত শত নরনারীর মুখে খাদ্য তুলে দিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। সেজন্য আমরা গর্বিত। আর কোন দল সেদিন এই ত্রাণকার্যে এগিয়ে আসেনি। আমরাই কিছু কংগ্রেস ও লীগ নেতাকে ডেকে এনে ত্রাণের কাজে সামিল করেছি।

১৯৪৩ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষকসভার সম্মেলন উপলক্ষে আমি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করি। মাসাধিককাল পূর্বে সেখানে গিয়ে প্রচার, অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কাজে তো অংশগ্রহণ করিই ; তাছাড়া থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিবিধ কাজ। সম্মেলনের কিছুদিন আগে এসে যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্ব সিলেটের সাংস্কৃতিক দল, সেই গায়ক দলে ছিল নির্মল চৌধুরী, নুনা দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা। প্রকাশ্য সমাবেশে তাদের গাওয়া 'বাইদ্যা' গান, নিবারণ পণ্ডিতের 'জারী' গান এবং অখিল চক্রবর্তীর গণ সংগীতই সর্বাধিক প্রশংস্য লাভ করেছিল। তখন আমি প্রায় দু' সপ্তাহ ছিলাম মুজাফ্ফর আহ্মেদ ও মনিদার সঙ্গে একই

ঘরে, সেই সময় কাকাবাবুর সবল ও স্বাবলম্বী জীবনযাত্রা দেখে মুগ্ধ হই, ব্যক্তিগত প্রতিটি কাজ তিনি যেমন নিপুণভাবে করতেন, ছোটখাট প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ আর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই অমায়িক।

নেত্র কোণার সম্মেলনে যেমন বড় বড় কৃষক নেতা তেমনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারাও এসেছিলেন যেমন পি সি যোশী, পি সুন্দরায়া, ই. এম এস. নাম্বুদিরিপাদ, মোহন সিং যোশ, হরকিষণ সিং সুরজিৎ ও গাড়োয়াল নেতা চন্দ্রিকা সিং ও মণিপুরী নেতা ইরাবত সিং প্রমুখ। সম্মেলনে যোগদান-কারী প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, আব্দুল্লা রসুল আব্দুল রেজ্জাক খাঁ প্রভৃতি। প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিয়েছিল লক্ষাধিক কৃষক। তাদের মধ্যে মুসলমান ও উপজাতীয় কৃষকদের সংখ্যাই ছিল বেশী। এই সম্মেলনে বেশ কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিকও যোগ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ৪৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ, তার অল্পদিন পরেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। আই. এন. এ বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি চালালে কলকাতায় রামেশ্বর ও গোলাম রশুল শহীদ হন। এরপর কলকাতার রাজপথে শুরু হয় পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবকদের অবিরাম মৃত্যু ভয়হীন সংগ্রাম। হতাহত হয় অনেকে, জনরোষে ভস্মীভূত হয় বহু সামরিক যানবাহন। কিছুদিন পর রসিদ আলি দিবসেও ঘটে অনুরূপ ঘটনা। কম্যুনিস্ট পার্টি তখন 'জনযুদ্ধের' নীতি ত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করেছিল ; তারাও এসে দলে দলে এইসব রক্তাক্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

'৪৬ সালের শুরুতেই ঘটে ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা বিদ্রোহী নৌসেনাদের আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেও কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের জোরালো সমর্থন জানিয়ে বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেই ধর্মঘটের দিন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে শ্রমিকের রক্তে লাল হয়েছিল বন্দর নগরীর রাজপথ। এর অল্প কিছুদিন পরেই ভিয়েতনাম দিবসে কলকাতায় ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। সেই নির্বিচার গুলিবর্ষণের ফলে বহু ছাত্র সেদিন আহত হয়েছিল। এর অব্যবহিত

পরেই ঘটে ডাক্তার কর্মীদের প্রথম সর্বাত্মক ও সফল ধর্মঘট। তাদের সমর্থনে এ. আই টি ইউ সি-র ডাকে বিশাল জনসভা হয় কলকাতা ময়দানে। এর পরেই প্রত্যাঘাত করে শঙ্কিত বৃটিশ সরকার। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ কলকাতায় শুরু হয় কুখ্যাত ও রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ক্রমে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় নোয়াখালি বিহার ও পাঞ্জাবে। কম্যুনিস্ট কর্মীরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বত্র দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে। নোয়াখালিতে দাঙ্গা থামাতে গিয়ে প্রাণ হারান সদ্য মুক্ত কমরেড লালমোহন সেন। পরে গান্ধীজিকে পর্যন্ত ছুটে যেতে হয় সেখানে।

আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই আন্দোলনগুলির প্রত্যেকটিই যে আমরা সমানভাবে করতে পেরেছি তা নয়, তবে ভিয়েতনাম দিবসে সেরপুরে আমরা জোরদার আন্দোলন করেছিলাম। ধর্মঘটি ছাত্রদের নিয়ে আমরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় কোর্টই অবরোধ করে বন্ধ করে দিই। হাকিম, আইনজীবী এবং বাদী বিবাদী কাউকেই কোর্টে ঢুকতে দিইনি। পুলিশবাহিনী আসে কিন্তু কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না।

সেদিনের অন্দোলনে আমি শুধু যোগদানই করিনি, নেতৃত্বের দায়িত্বও পালন করেছিলাম। ময়মনসিং শহরেও এই আন্দোলনগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল।

তাছাড়া স্থানীয়ভাবে এইকাল পর্বে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজেও সর্বদা নিযুক্ত থাকি। এ ব্যাপারে রবি নিয়োগী ও আমাকেই নিতে হয়েছিল প্রধান ভূমিকা। এইভাবেই কাটে ১৯৪৬ সাল।

'৪৬ এর শেষ দিকেই আরম্ভ হয় তেভাগা আন্দোলন। আমাদের জেলায় আধিবর্গা প্রথা খুব কম জায়গাতেই চালু ছিল, অধিকাংশ স্থানেই প্রচলিত ছিল 'টংক' 'অথবা ধান্য কড়া' প্রথা। কাজেই কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার কয়েকটি গ্রাম বাদে অন্য সব জায়গায় আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি 'টংক' প্রথা লোপের দাবীতে। সেরপুরের কিছু সংখ্যক গ্রামে ও ললিতাবাড়ীর বিস্তৃত অঞ্চলে টংক প্রথার লোপের দাবীতে কৃষক আন্দোলন তীব্ররূপ ধারন করলে বেন্টিন সাহেবের পুলিশ আমাদের ধরার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। গ্রেপ্তার এড়াতে তখন আমরা অনেকেই আত্মগোপন করি। '৪৭এর মার্চে আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করার জন্য পার্টির নির্দেশে আমি কলকাতা যাই। কিছুদিন পর জলধর পালও ললিতা বাড়ী অঞ্চলে

আত্মগোপন করে থাকতে না পেরে কলকাতায় যান। এর কিছুদিন পর পুলিশি হামলা কমে আসে এবং আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়। অবশ্য টংক ধান আদায়ের জন্য জমিদারী জুলুমও তখন কিছু হ্রাস পেয়েছিল। ইতিমধ্যে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটা বাস্তব হয়ে ওঠে।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভোরেও আমি কলকাতাতেই ছিলাম। আগের দিন সন্ধ্যায় ও পরের দিন সকালে আমি যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা অকল্পনীয়। ১৪ই সন্ধ্যায় নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে দেখি হিন্দু-মুসলমান জনগণের কোলাকুলি ও আতর মাখানো, আর ১৫ তারিখে 'নতুন দিনের ভোরে, দেখি সারা কলতাতার মানুষই যেন পথে বেরিয়েছে, মুমূর্ষু রোগী ছাড়া আর বোধহয় সেদিন ঘরে ছিল না কেউ। 'স্বাধীনতা' পেয়েও, কিছুটা আপত্তি থাকলেও এই 'স্বাধীনতা' কথাটার যাদু মন্ত্রেই বুঝি সেদিন ঘটেছিল এই দৃশ্য। সাধারণ মানুষ সেদিন খুশি হয়েছিল খণ্ডিতস্বাধীনতার' বিরোধীতা করেনি বরং সমর্থনই জানিয়েছিল, কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল কয়েকমাস যেতে না যেতেই। অথাৎ কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে। কিন্তু এখন সেকথা থাক। পরেই তা বলব।

যতদূর মনে পড়ে আমি সেবার সেরপুর ফিরে ছিলাম '৪৭ এর অক্টোবর মাসে। সেরপুর তখন পাকিস্থানের অন্তর্গত। তবে পাশপোর্ট ভিসা প্রভৃতি তখনও চালু হয়নি। ট্রেনে ওঠার সময় দেখা হল জামালপুরের যুগান্তর দলের এককর্মী বিধু সেনের সঙ্গে। তিনিও ঐ ট্রেনে বাড়ী ফিরছিলেন।

জগন্নাথগঞ্জে স্টীমার থেকে নেমে আবার রেল গাড়ীতে ওঠামাত্র পুলিশ এসে আমাদের সব মালপত্র তল্লাসী করতে লাগল। অবশ্য পেলনা কিছুই। মনে ভাবলাম এ ভাবেই বুঝি এবার দেশের মাটিতে অভ্যর্থনার সূচনা হল।

সেরপুরে ফেরার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ '৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী খবর এলো গান্ধীজির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের। সকলের মিলিত উদ্যোগে তখন আয়োজিত হল শোকসভা ও শোক মিছিল। এর আগে সেরপুরে কোন সভা ও মিছিলে এতবেশী সংখ্যক মুসলমান জনতাকে যোগ দিতে দেখি নাই। পৌর ভবন থেকে যে শোক মিছিল বের হয় শতশত মুসলমান তাতে নগ্নপদে ও ও অশ্রুপূর্ণ চোখে যোগ দিয়েছিলেন। শোকসভায় পার্টির তরফে সেদিন প্রধান বক্তা ছিলাম আমি। লীগ, কংগ্রেস প্রভৃতি সব দলের নেতারাই সেদিন

মঞ্চে এসেছিলেন ও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুটি বিপরীত ধর্মী ঘটনা গান্ধীজির শোকসভা ও জলধর পালের বিবাহ ঘটেছিল সেই একই দিনে।

৪৮ সালের শুরুতেই আমাদের পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলের আমূল পরিবর্তন ঘটে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পি সি যোশীর অনুসৃত রণনীতি ও রণ কৌশলকে দক্ষিণপন্থী, সংস্কারবাদী আখ্যা দিয়ে খারিজ করা হয় এবং বি টি রণদিভের নতুন জঙ্গী লাইন গৃহীত হয়। কয়েক-মাস আগে যে স্বাধীনতাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম আজ তাকে আমরা বললাম মেকী, শ্লোগান দিলাম, 'লাখো জনতা ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। নবগঠিত পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টিও অনুরূপ জঙ্গীনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করল এবং যেখানেই সম্ভব জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল। পাকিস্তান পার্টির সম্পাদক হয়েছেন তখন সাজ্জাদ জাহির আর প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক হলেন সুধীন রায়। আমাদের জেলায় প্রথমে আন্দোলন করার চেষ্টা হয় কিশোরগঞ্জে। কিন্তু সেখানে তা সম্ভব না হওয়ায় নালিতা বাড়ীর হাজং অঞ্চলে টংক লোপের আন্দোলন শুরু করে তাকে জঙ্গী রূপ দেবার চেষ্টা হল। অবশ্য জেলা কমিটির সভায় তখনই জঙ্গী আন্দোলনই করা সমীচীন হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ ছিল। যা হোক অধিকাংশের মতানুযায়ী হলদি গ্রামে আন্দোলন শুরু করা হল। অতঃপর সশস্ত্র পুলিশদলের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধের পর ধরা পড়ল রবি নিয়োগী ও জলধর পাল। গ্রেপ্তারের পর তাদের দু'জনের উপর যে অমানুষিক উৎপীড়ন চালানো হয় তা ভাষায় বর্ণনার অতীত। যতদূর মনে পড়ে এই সংঘর্ষ ও গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা ঘটেছিল '৪৮ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এর সপ্তাহ দু'য়েক পরেই আমরা ধরা পড়ি। আমরা বলতে— আমি, হেমন্ত ভট্টাচার্য এবং আরও বেশকয়েকজন। আমি ও হেমন্তদা ধরা পড়ি, নিজেদের সামান্য ভুলের জন্য। সেই রাতে যে 'কুরিয়র' এর আমাদের নতুন আশ্রয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে না আসায় আমরাই তার খোঁজ নিতে যাই; কিন্তু তার বাড়ীও যে তখন পুলিশ ঘেরাও করেছিল ঘন কুয়াশা থাকায় তা আমরা বুঝতে পারিনি। তাই আমরা পুলিশ দলের সামনে পড়ি এবং ডি আই. বি ইন্সপেক্টর আমাকে চিনে ফেলে। থানায় আনার পর তল্লাসী চালিয়ে যে জিনিসটি পেয়ে পুলিশ প্রথমে একটু উল্লসিত হয় তা হল একটি বই,— জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে', তাদের প্রাথমিক উল্লাসের কারণ বোধহয় ছিল প্রচ্ছদপটের ছবিটি। পরে বইটির বিষয়বস্তু জেনে তারা হতাশ হয় কারণ

ওটি তাদের কোন কাজে লাগবে না। সেরপুর কোর্টে আমরা জামিন পাই না, আর জামালপুর কোর্টে আমাদের হাজিরই করানো হয় না। কয়েকদিন বাদেই আমাদের পাঠানো হয় ময়মন সিং ডিষ্ট্রিক্ট জেলে! সেখানে দুই বৎসরাধিক কাল হাজত বাসের পর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আমাদের মামলা চলে। বিচারে রবি নিয়োগী, জলধর পাল ও একজন হাজং কর্মীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়ে আমাদের আর সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু হাকিম মুক্তি দিলেও আমি ও হেমন্তদা মুক্তি পেলাম না। কোর্টের বাইরে আসা মাত্রই আমাদের দু'জনকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তবে এবার আর ২ নং ওয়ার্ডে অর্থাৎ হাজতে নয়,—আমাদের স্থান হল ১৩ নম্বরে অর্থাৎ সিকিউরিটি ওয়ার্ডে। চট্টগ্রামের কালী চক্রবর্তী, বীরেন সরকার, ঢাকার গোকুল চক্রবর্তী, নাসিরুদ্দিন, বরিশালের প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ফরিদপুরের আব্দুল হাই, সিলেটের গোপেশ মালাকার, প্রভৃতি ময়মনসিংহের মহাদেব সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজন বিনাবিচারে আটক বন্দী আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। আমরা দু'জন যাওয়াতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হল।

বিচারাধীন বন্দী হিসাবে থাকার সময় কতগুলি জরুরী দাবী আদায়ের জন্য দু'বার আমাদের অনশন ধর্মঘট করতে হয়,—প্রথমবার ২৩ দিন ও দ্বিতীয়বার ২৪ দিন। কিছু সংখ্যক দাবী—যেমন মশারি ব্যবহারের অধিকার, পড়াশুনার সুযোগ প্রভৃতি মেনে নেওয়া হলে আমরা অনশন ভঙ্গ করি। পাকিস্তানী আমলে তখনকার পরিস্থিতিতে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আদায় করা সম্ভবপর তা আমরা করেছিলাম। তাছাড়া বাইরে পার্টি কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিয়মিত। পার্টির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলই আমরা পেয়ে যেতাম। ৫০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ কমিনফর্মের মুখপত্রে আমাদের পার্টির নীতি ও রনকৌশল সম্বন্ধে যে সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তাও আমরা যথা সময়েই পেয়ে যাই।

'৫২ সালে ভাষা' আন্দোলনের দ্রুত বিস্তার ও তীব্র হয়ে ওঠার ব্যাপারটা আমরা বুঝি যখন দলেদলে ছাত্র-যুব কর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে আনা হয়। বেশ মনে আছে ভাষা আন্দোলনে ধরা পড়া প্রথম দলটি এসেছিল বিকেলবেলা। তাদের আনা হয় আমাদের তেরনম্বর ওয়ার্ডেই। জেলের ব্যাপার ট্যাপার, নিয়ম কানুন কিছুই তারা জানতো না, জানার কথাও নয়। আমরা এতগুলো লোক যে এতদিন ধরে এখানে বন্দী হয়ে রয়েছি, কেন রয়েছি, আমরা কারা এসব

কিছুই তারা জানতো না বুঝতোও না। এর কারণ হল রাজনীতিতে তাদের সবেমাত্র হাতে খড়ি হয়েছে। এদের প্রায় সবাই ছাত্র অথবা যুব কর্মী। শুধু একজন ছিলেন অধ্যাপক এবং আর একজন উকিল।

জেলে আমরা তখন উর্দু শিখতাম প্রাক্তন আন্দামান বন্দী কালীদার কাছে। অনেকটা শিখেও ছিলাম। ভাষা আন্দোলনের এই কর্মীরা এসেই আমাদের উর্দু পড়া বন্ধ করে দেয় এমনকি কিছু বই পুড়িয়ে ফেলে। উর্দু শেখার পক্ষে আমাদের কোন যুক্তিই তারা মানে না। তাদের বক্তব্য হল সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে উর্দু শিখতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আগে "ওরা" (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানীরা) বাংলা শিখুক তার পর আমরা উর্দু শিখব। যুক্তিহীন এই ভাবাবেগের কাছে হার না মেনে উপায় কি ?

ভাষা আন্দোলনে ধরা-পড়া এই কর্মীরা কিন্তু বেশীদিন জেলে ছিল না; কিছুদিনের মধ্যেই তারা মুক্তি পায়।

ওরা ছাড়া পাওয়ার কয়েকমাস পরেই আমাকে বদলী করা হয় ফরিদপুর জেলে। হঠাৎ কেন বদলীর আদেশ এলো তা বোঝা গেল না, কিন্তু মনে খুব দুঃখ হল, আশ্চর্য মানুষের মন! এক জেল থেকে আর এক জেলে যাওয়া তাতেও দুঃখবোধ? কিন্তু দুঃখ কেবল আমরই নয়, দেখলাম যে বন্ধুদের ছেড়ে যাচ্ছি তারাও বিষণ্ণ। আরও আশ্চর্য যে ফালতু নামে পরিচিত কয়েদীরা যারা আমাদের বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া, জল তোলা প্রভৃতি কষ্ট সাধ্য কাজগুলো করত, বিদায় নিয়ে বাইরে এসে দেখি—তাদেরও চোখে জল। কিন্তু আর একজন সহবন্দীর কথা কিছু না বললে অসম্পূর্ণ থাকবে আমার ময়মনসিংহ জেলের স্মৃতি চারণ, তিনি হলেন বরিশালের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন। ময়মনসিংহ জেলে যখন এলেন তখন তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে পুরোপুরি গান্ধীবাদী হয়ে গেছেন। সর্বদা গান্ধীজির নিজের লেখা ও তাঁর সম্বন্ধে অপরের রচিত পুস্তক ও পত্র পত্রিকাদি তিনি পড়তেন। আমাদের সঙ্গে তিনি সাধারণভাবে আলাপ করতেন কিন্তু কোন আলোচনা বা বিতর্কে যেতেন না। আমরা যে গোপনে চিঠি পত্র আদান প্রদান করতাম, বেআইনী ভাবে বহু বই কাগজপত্র এনে পড়তাম—এসব তাঁর অবিদিত ছিল না। এই ব্যাপারগুলি তিনি পছন্দ করতেন না ঠিকই তবে বাধাও দিতেন না; শুধু বলতেন—"আমার চোখের সামনে এসব কোর না"। কথা প্রসঙ্গে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "আচ্ছা আপনিতো সশস্ত্র

বিপ্লবের নায়ক ছিলেন, শুনেছি স্টেট্ প্রিজনার হয়ে পাঞ্জাবে কোন একটা জেলে আটক থাকার সময় আপনি নাকি সেই জেলে আগুনে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন,—তবে আজ আপনার জেলখানা থেকে গোপনে চিঠিপত্র আদান প্রদানে আপত্তি কেন?" একটু হেসে তিনি জবাব দিয়েছিলেন: "আমি যে আজ হিংসার পথ ত্যাগ করে অহিংসা ও সত্যের পথ গ্রহণ করেছি তাই। হঠাৎ যদি কখনও এই চিঠি আদান প্রদান ধরা পড়ে এবং কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তখন পড়ব উভয় সংকটে সত্য বললে তোমাদের ক্ষতিসাধন ও শত্রুপক্ষকে সাহায্য করা হবে আর মিথ্যা বললে আমি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হব।" কিছুদিন পর এই বৃদ্ধ ও নানারোগে আক্রান্ত নেতাকে বদলী করা হয় রংপুর জেলে। পরে আমি যখন ঢাকা জেলে,—তখন একদিন খবর পাই সতীশদাকে চিকিৎসার জন্য সেখানে আনা হয়েছে। তারপর আর একদিন পাই তার মৃত্যু সংবাদ। আমাদের ডেটিনিউ ওয়ার্ডে না এনে তাঁকে অন্যত্র রাখা হয়েছিল তাই জানতে পারিনা—বাইরের কোন হাসপাতালে—নাকি জেলে তার মৃত্যু হয়। আজও আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এই সত্যাগ্রয়ী, আদর্শনিষ্ঠ ও আজীবন সংগ্রামি বিপ্লবী নেতাকে। ফরিদপুর জেলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছে না তবে সেখানে গিয়ে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল অনেক বিশিষ্ট কর্মী ও নেতার সঙ্গে—যেমন বিষ্ণু চ্যাটার্জী, আব্দুল হক, শহীদুল্লা কায়সার, সত্য মৈত্র প্রফুল্ল সান্যাল ও আরও অনেকে যাদের নাম আজ মনে করতে পারছি না। বিষ্ণু বাবু ছিলেন খুলনার বিশিষ্ট ও সংগ্রামী কৃষকনেতা। বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া সমর্থক মৌলবাদী ঘাতকদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। আব্দুল হকও ছিলেন সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা। খড়কীর পীর সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও তিনি জঙ্গী কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মার্কসবাদ সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন ও চিন্তা ভাবনা করতেন। আর শহীদুল্লা কায়সার আমাদের চেয়ে বয়স ছিলেন বেশছোট। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন ছাত্রনেতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলা ও পরিচালনায় তার ভূমিকা ও অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুলেখক হিসাবেও খ্যাতি ছিল এই তরুণ কমিউনিস্ট নেতার। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকালে জেনারেল নিয়াজীর বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঠিক আগের দিন আলবদর ঘাতকদের হাতে তিনি নিহত হন। মুক্তি লাভের পর আমি যখন ঢাকা যাই তখন এই শহীদুল্লাই আমাকে শহীদ

মিনারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেদিন সেখানেই আমি শহীদ গায়ক আলতাফ মামুদের কণ্ঠে শুনেছিলাম সেই অবিস্মরণীয় গান, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি।" আমিও কি তাই আজ ভুলতে পারি শহীদুল্লা কবেসার বা আলতাফ মামুদের কথা? আলতাফ মামুদকে অবশ্য আগেও চিনতাম না পরেও আর কোনদিন দেখিনি। তিনিও নিহত হয়েছিলেন আল বদর ঘাতকদের হাতেই।

ফরিদপুর থেকে আমি বদলী হই ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে সঠিক তারিখটা মনে নেই। তবে সেটা ছিল ৯২ক ধারা অনুযায়ী ফজলুল হক মন্ত্রী সভা বাতিল করার দু'একদিন পরেই।

ঢাকা জেলে গিয়ে পুরানো নতুন অনেকের সঙ্গেই মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটল। ঢাকার অনিল মুখার্জী, জ্ঞান চক্রবর্তী, সরদার ফজলুল করিম, আলি আকসাদ, বরিশালের মুকুল সেন, নলিনী দাস প্রমুখ ছাড়া সেখানে তখন ছিলেন অন্যান্য জেলার বহু নেতা ও কর্মী; সকলের নাম মনেও নেই আর তা লেখাও সম্ভব নয়। তবে যার নাম উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হলেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল। জেলে বসেও নিত্য নূতন গান লিখে ও গেয়ে তিনি সকলকে উৎসাহ ও আনন্দ দিতেন। কয়েক বছর আগে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে, শেখ গুমানীর সঙ্গে কবির লড়াইয়ে সারা রাত জেগে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। আর এখন তাঁর পাশে বসে তাঁর দোহার গিরি করছি। কবিয়ালরা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন এটা জানা কথা, কিন্তু রাজনীতিতে এত গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান আর কোন কবিয়ালের দেখিনি।

যতদূর মনে পড়ে আমাদের জেলার মাত্র তিনজন তখন ঢাকা জেলে ছিলাম— আমি, ধীরেন সরকার ও আবদুল্লা হেল বাকী।

পার্টির অতি বামপন্থী হটকারী বিচ্যুতি নিয়ে ঢাকা জেলে কিন্তু বিশেষ কোন আলোচনা হতে দেখিনি। ময়মনসিং জেলে বরং এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট আলোচনা ও পড়াশুনা করতাম।

কিছুদিন পর ঢাকা থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় সিলেট জেলে, এই বদলীর পেছনে মনে হয় একটা কারণ ছিল—সেটি হ'ল, আই জি প্রিজন জেল পরিদর্শনে এলে তার সঙ্গে জেলখানার বিভিন্ন অব্যবস্থা নিয়ে আমার ও রতন সেনের কিছুটা তিক্ত বাদানুবাদ। আমীর হোসেন সাহেবকে আমরা 'মেডিক্যাল ডায়েট' হিসাবে দেওয়া—কয়েকটি পচা কলা ও শুকনো পাউরুটি নমুনা হিসাবে

দেখিয়েছিলাম। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই আসে দুজনেরই বদলীর হুকুম।

সিলেট জেলে তখন বুলিলালা প্রমুখ যে কয়েকজন রাজবন্দী ছিলেন তারা সেই জেলারই অধিবাসী ও কর্মী। ঐ জেলের জেলার সাহেব ছিলেন ইকবাল ভক্ত, তিনি আমাকে ইকবালের কবিতার বই পড়তে দিতেন, মাঝে মাঝে তাঁর লেখা সম্বন্ধে আলোচনাও করতেন। আমি অনেক বছর জেল খেটেছি, বহু জেলে থেকেছি, কিন্তু কোন কারা কর্মচারীর এ ধরনের বিদ্যানুরাগ ও কাব্যপ্রীতি আর দেখিনি।

বেশ কয়েক মাস সিলেট জেলে থাকার পর সেখান থেকেই আমি মুক্তি পাই। সময়টা বোধহয় ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি। বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। এমনি এক বৃষ্টি ঝরা সকালে আমার সামনে জেলের দরজা খুলে গেল,—সাড়ে ছ'বছর পর আমি বেরিয়ে এলাম মুক্ত আকাশের নীচে। কিন্তু যাবো কোথায়? শহরের কাউকেই তো আমি চিনি না, জানি না কারো ঠিকানা। একটা রিক্সায় উঠে বসে বললাম—"চল ভাই আওয়ামী লীগের অফিস।" সেখানেও কাউকে চিনি না তবে নাম জানি দুয়েকজন কর্মীর। সেই অফিসে পৌঁছে শুধু উষ্ণ অভ্যর্থনাই নয় সব রকম সাহায্যের আশ্বাসও পাওয়া গেল। একটু পরে সেখান থেকে এক মিছিল বের হ'ল বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য। আমিও যোগ দিলাম সে মিছিলে। স্নানাহারের পর অনেক আলাপ আলোচনা হ'ল তাদের সঙ্গে। সন্ধ্যায় তারা কয়েকজন ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো আমাকে। সাম্প্রতিক বন্যার ফলে রেল লাইন অনেক জায়গায়ই ছিল জলমগ্ন। তাই ট্রেন চলছিল খুব ধীরে ধীরে। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে সন্ধ্যার একটু আগে ট্রেন গিয়ে পৌঁছল ময়মনসিং স্টেশনে। আগামী কালের আগে সেরপুর যাওয়া যাবে না কাজেই রাতটা কাটাতে হবে এখানেই। পূর্বে যে সব আস্তানায় থাকতাম সেগুলো কোনটার কি অবস্থা কিছুই জানি না। তাই অনেক ভাবনা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত রওনা হলাম 'ধনদা' অর্থাৎ শৈলেন রায়ের বাসার দিকে। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন, আশ্রয় মিলবে তাও জানাই ছিল। চামেলি বৌদি তখন ছিলেন দুগ্ধ দোহনরতা, একটু পরে চা নিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। নেত্রকোনার এই একটি আশ্চর্য পার্টি দরদী পরিবার! পার্টির ডাকে বিষয় সম্পত্তি সবকিছু দান করে এখন

জেলা শহরে ভাঙা বাসায় থাকেন এবং হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করেন। নিজেরা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই পার্টি সভ্য, ভাইয়েরাও তাই।

জেলা নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ শেষ করে পর দিন বিকেলে সেরপুর রওনা হলাম। বাড়ী পৌঁছলাম সন্ধ্যার একটু পর। গিয়ে দেখি যেমন বাড়ীঘর তেমনি পার্টি সংগঠন সবই ভাঙাচোরা, অগোছালো। রবি আবার ধরা পড়ে জেলে। হারু অনুরা চলে গেছে কলকাতায়। পুলিনদাদের বাড়ী খালি। প্রমথ অনেক আগে থেকেই হালুয়া ঘাট চলে গিয়েছিল পার্টির কাজে। ঠাকুরদা অর্থাৎ হেমন্ত ভট্টাচার্য আছেন তবে একা, তিনি কোন উদ্যোগ গ্রহণে অক্ষম। আমি জোড়াতালি দিয়ে কোনমতে পার্টি সংগঠনটাকে শুধু ধরে রাখতে নয় চাঙ্গা করতে চেষ্টা করলাম। সেই সময় একজন মুসলিম তরুণকে আমরা কর্মী হিসাবে পাই—তার নাম হবিবর রহমান। সে যেমন উৎসাহী ও উদ্যমশীল তেমনি বিশ্বস্ত এবং সৎ। আমাদের পুরানো মুসলমান কর্মী সফি. নাসির, মুজিবরেরা তখন একটু হতাশাগ্রস্ত ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার এই সময় জামালপুর এলে আমি তার কাছে বন্দীমুক্তির দাবীতে ডেপুটেশন দিই। তিনি জানান আমাদের দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

কিছুদিন পর ক্যমুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে প্রকাশ্য কাজকর্ম শুরু করেন। তাঁদের সম্বর্ধনা জানাতে ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রকাশ্য জনসমাবেশ আয়োজিত হয়। সেই সমাবেশে যোগ দিতে আমিও সস্ত্রীক ঢাকা যাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আমার স্ত্রী অনিমা ১৯৪৩ সাল থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। বস্তুতঃ তার সাহায্য এবং সহযোগীতা না পেলে আমার পক্ষে পাকিস্তানী আমলে কাজ-করা এবং দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকা দুঃসাধ্য হত। যা হোক আমি পার্টির প্রকাশ্য সমাবেশে যোগদান করি এবং সেখানে গানও গাই। মণিদা, বারীন দত্ত প্রমুখ সব গোপনে থাকা নেতাই সেই সমাবেশে উপস্থিত হন ও বক্তৃতা করেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই অবস্থা আবার সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ঢাকায় পুলিশ ব্যারাকে ধর্মঘট হওয়ায়, যদিও এ ব্যাপারে কম্যুনিস্টদের কোন সংশ্রবই ছিল না। তবে এবারে অধিকাংশ নেতাই গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন এবং তারা আবার আত্মগোপন করেন। ঢাকায় কয়েকটি এলাকায় কার্ফু জারীর খবর পেয়ে আমিও সন্ধ্যা হওয়া মাত্র সরে পড়লাম এবং চন্দ্রকোণার পথে

সেরপুরের দিকে রওনা হলাম। পরদিন সন্ধ্যায় শহরের উপকণ্ঠে বয়ড়াতে পৌঁছে জানতে পারি রবি আবার ধরা পড়েছে। সে পুলিশ ধর্মঘটের খবর পায়নি, তাই বাড়ীতেই ছিল। কাজেই তাকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের কোন অসুবিধাই হয় নি। আমি গোপনে ঘোরা পথেই সেরপুর আসি। কাজেই আত্ম-গোপন করতে আমার কোন অসুবিধাই হল না। প্রায় মাস দুয়েকের গোপন জীবনের বেশীর ভাগটাই আমি থাকি চন্দ্রকোণা, নরুন্দি ও সেরপুরে। জামাল-পুরের প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা নাসিরুদ্দিন আহমেদের গ্রামের বাড়ীতেও আমি তখন সপ্তাহ দুয়েক থেকেছিলাম। আমার সঙ্গে তখন ছিল তরুণ এক অধ্যাপক আবদুস সাত্তার (মোহন)। সেরপুরের স্কুলে পড়ার সময়ই সাত্তার ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টিতে আসে। নাসির সাহেবের সঙ্গে তখন আমরা দীর্ঘ আলোচনা করি, তিনি কম্যুনিস্ট সমর্থক ছিলেন না, তবে প্রচণ্ড মুসলীম লীগ বিরোধী।

একদিন সেরপুর থেকে নরুন্দি যাওয়ার পথে হঠাৎ আমি সাইটিকা রোগে আক্রান্ত হই। আমার সঙ্গী ও পথ প্রদর্শক ছিল হবিবর রহমান। দু'জনে যাচ্ছিলাম দু'টি সাইকেলে হঠাৎ আমার উরুতে এমন তীব্র ব্যথা হয় যে আমি আর সাইকেল চালাতেই পারি না, হবিবর আমাকে তার সাইকেলে বসিয়ে দুহাতে দুটি সাইকেল চালিয়ে ৮/১০ মাইল দূরে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যায়। আমার তখন এমন অবস্থা যে সাইকেল থেকে নামতে এবং সিঁড়ি দিয়ে ঘরে উঠতেও পারি না। নরুন্দিতে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিল না। আমাদের এক সমর্থকের দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা একটু কমে। জেলা পার্টির অনুমতি নিয়ে তখন আমি নারায়ণগঞ্জে যাই ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে। সেখানে গিয়ে খবর পাই আমার মেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং নিজের চিকিৎসার চিন্তা বাদ দিয়ে তখন আমার কাছে মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারটাই বড় হয়ে ওঠে। সেরপুর থেকে মেয়েকে আনিয়ে, ডাক্তার দেখানো ও চিকিৎসার কাজ শুরু করলাম। কিন্তু বাধা অনেক, প্রথমতঃ অর্থাভাব দ্বিতীয়তঃ আমি তখন রয়েছি আধা গোপন আধা প্রকাশ্য অবস্থায়। ঢাকার তরুণ ডাক্তার নবাব আলি ছিল আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার সাহায্যেই দোলাকে দেখানো হল প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহম্মদ হোসেনকে। তিনি খুবই যত্ন সহকারে রোগীকে দেখেনও। চিকিৎসা সুরু করেন, এমনকি ফিঃ হিসাবে প্রদত্ত অর্থও ফিরিয়ে দেন। তাঁর চিকিৎসায় রোগী কিছুটা সুস্থ হলেও

তিনি ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেন। আমাদের পাশপোর্ট পাওয়ার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। অবশেষে ৫৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ অসুস্থ কন্যাকে নিয়ে কলকাতা চলে আসি। এখানে কয়েকজন ডাক্তারকে দেখানোর পর এস. এস. কে. এম হাসপাতালে দীর্ঘদিন তার চিকিৎসা চলে, তার অবস্থার অনেকটা উন্নতিও হয়। কিন্তু ডাক্তাররা বলেন, আরও দীর্ঘকাল তার চিকিৎসা চালাতে হবে। রোগীর এখনি ঢাকায় ফিরে যাওয়া চলবে না। ইতিমধ্যে দু'বার আমাদের ভিসা বাড়ানো হয়েছে; এবারে পাসপোর্টের মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে এলো। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা পাসপোর্ট প্রত্যার্পণ করে এখানেই থেকে যেতে বললেন। পার্টি নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি তখন প্রায় বাধ্য হয়েই এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং পার্টির সভ্যপদও এখানে বদলী করিয়ে আনলাম। এইভাবে দেশ ছেড়ে আমাকে আসতে হ'ল এপার বাংলায়। ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাসা বাঁধলাম দম দম অঞ্চলে। জমি, বাড়ী অর্থ, সম্পদ সেদিন আমার কিছুই ছিল না, আজও নেই। বন্ধুদের সাহায্য ও সহৃদয় মানুষের দানের উপর নির্ভর করে সেদিন আমি ঘর বাঁধি। তারপর যোগ দিই পার্টির কাজে। তবে আগে ছিলাম সর্বক্ষণের কর্মী এবারে হলাম আংশিক সময়ের কর্মী—কারণ জীবিকার তাগিদে কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে গ্রহণ করতে হল শিক্ষকতার বৃত্তি।

আমার জীবনের তৃতীয় পর্ব শুরু হল পশ্চিমবঙ্গের দমদম অঞ্চলে। আমাদের জেলার অনেক নেতা ও কর্মীই এখানে নূতন ভাবে কর্মজীবন পুনরারম্ভ করেছিলেন, যেমন পুলিনদা, ক্ষিতীশদা, শশীন চক্রবর্তী, জলধর পাল, হারু চক্রবর্তী প্রমুখ। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম পার্টির কাজে। ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে যোগ দিলাম পার্টি পরিচালিত ছোটবড় সব অন্দোলনে। শিক্ষক হিসাবে অংশ নিলাম এবি-টি-এ পরিচালিত আন্দোলনেও। রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত প্রশ্নে পার্টিতে মতবিরোধ চলছিল দীর্ঘকাল যাবত। সেই মত বিরোধ তীব্রতর হয় সীমান্ত প্রশ্ন নিয়ে চীন-ভারত যুদ্ধের সময়। তারপর '৬৪ সালে ঘটে পার্টির বিভাজন। এই ঘটনা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি দুঃখজনক। কিন্তু ভাঙনের প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে আর থামে না। তাই '৬৭ সালে হল আবার বিভাজন। কম্যুনিস্টদের মধ্যে দেখা দিল পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষ, এর পাশাপাশি আবার নেমে এলো হিংস্র পুলিশি সন্ত্রাস। কত তরুণ কর্মী যে

বলি হল এই ধ্বংস লীলায় তার হিসাব দেওয়া দুষ্কর। আমি শুধু দেখলাম আর বোধ করলাম অসহায়ত্বের বেদনা। '৭২ সালের পর ধীরে ধীরে স্তিমিত ও শান্ত হয়ে এলো উত্তপ্ত সেই পরিবেশ। ততদিনে ইয়াহিয়ার গণহত্যালীলার স্রোত পার হয়ে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সে যুদ্ধে আমরা—কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীরা, এপার থেকে যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করা সম্ভব তা করেছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমিও সামিল হয়েছি এই কাজে, সেজন্য আমি গর্বিত।

এর পরবর্তীকাল পর্বে আমি পার্টির নিয়মিত কাজ করা ছাড়াও যোগ দিয়েছি, ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী সমিতি, ইসকাল, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘ প্রভৃতির নানাবিধ কাজে। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পার্টির যাবতীয় কাজে আমি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করি। সেই বছরই ২৫শে জুলাই গুরুতর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরই আমি কর্মশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। তাহলে আজও আমি পার্টির পতাকা ছাড়িনি। সভ্যপদ বজায় রেখেছি।

এবার স্মৃতিকথন শেষ করার পালা।

জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে দেখছি আজ আমাদের সামনে সংকটের গভীর আবর্ত। সে সংকট যেমন ব্যাপক তেমনি তীব্র। আমাদের ব্যক্তি জীবন ও সংগঠনের ক্ষেত্রেও সে সংকটের আজ সংক্রমণ ও অনুপ্রবেশ ঘটছে। তার একটি রূপ হল মূল্যবোধের অভাব অন্যটি আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতা। সংগঠন ও ব্যক্তিজীবন থেকে এ দুটিকেই নির্মূল করতে হবে। 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'—কথাটি যদিও একজন সর্বদা ধর্মী নেতার তবুও সেটি আজ আমাদের স্মরণীয় ও অবশ্য পালনীয়।

আমাদের মতাদর্শ হল মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ। তার প্রতি আমাদের আস্থা অটুট রাখতে হবে প্রয়োগ গত ভুলের দরুণ কোথাও ব্যর্থ হওয়ার অর্থই সেই বৈজ্ঞানিক মতবাদটির মিথ্যা হয়ে যাওয়া নয়। ভুল সংশোধন করে সেই মতাদর্শ অনুসরণ করলে জয় আমাদের হবেই। অপরের অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ না করে আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে নিজেদেরকেই। সেই পথে চলেই আমরা গড়ব শোষণ মুক্ত নতুন সমাজ।

জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনে আমি অবশ্যই ব্যথিত ও মর্মাহত, কিন্তু তাহলেও আমি হতাশায় ভেঙে পড়িনি। আশা করছি বিদায় নেবার আগেই আমি দেখে যাবো

পুরাণে বর্ণিত সেই ফিনিক্সের মত সমাজতন্ত্রবাদও সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উত্থিত হয়ে নবজীবন লাভ করবে।

পরিশেষে একটি কথা। শহীদ ক্ষুদিরাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মীদের অপরিসীম ধৈর্য ও নিয়মিত তাগিদ ছাড়া আমার এই স্মৃতিচারণ কোনদিনই সম্ভব হত না। তাই তাঁদের সকলকে এবং বিশেষভাবে অনুলেখককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মকথা

শ্রীহরিপদ চৌধুরী

অবশেষে নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হচ্ছে। বিদেশী শাসকদের সেবায়েতদের হাতে পড়েছিলাম। তাই দেশী সেবকরা বলছেন—আমি স্বাধীনতা-সংগ্রামী। তারা আমাকে সার্টিফিকেট (তাম্রপত্র) দিয়েছেন, খোরপোষের জন্য কিছু টাকাও দিয়েছেন।

এইসব সেবক-সেবায়েতদের রূপ আগেও দেখেছি। এখনও দেখছি—ভাবি কি হ'ল ? একসময় নিজেকে বিপ্লবী (ইংরেজ শাসকরা বলত 'সন্ত্রাসবাদী', আজও কিছু কিছু লোক ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে ; এখনও নিজেকে বিপ্লবী বলেই মনে করি, তবে জাহির করি না।) বলে ভাবতাম—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক—জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন চাই ; মানুষ যাতে মর্যাদা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সর্বক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণই ছিল লক্ষ্য। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই। আর আজ ? সে আদর্শ, সে চিন্তা কোথায় ? নিজের জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত, শৈশব কৈশোরের সুখদুঃখের কথা আজ কেবল স্মৃতিকথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমার সন্তান-সন্ততিরা তার ভাগ পেল না ; তারা ছিন্নমূল হয়ে শেওলার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবাংলাকে মিলিয়ে দিয়ে তাদের একেবারে বাংলাভাষা ভুলিয়ে অবাঙ্গালী করার চক্রান্তও হয়েছিল। অবশ্য সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। আমরা এখনও বাংলাতেই কথা বলি, সুখ ও দুঃখের কথা ভাবি—এখনও বাঙ্গালীই আছি।

(আবার্ডিন) যাই এবং সেখানে সেলুলার জেলের প্রাক্তন বন্দী হিসাবে আমরা প্রচুর সম্মান ও সম্বর্ধনা পাই। আবার্ডিন সহর থেকে একটু দূরে টিলার উপর অবস্থিত একটি স্কুলে আমাদের যখন প্রশস্তি গাওয়া হচ্ছিল, আমি তখন টিলার নীচে রাস্তায় নেমে আসি, চোখে পড়ে একজন বয়স্ক লোককে। পূর্ব-বাংলার কায়দায় গামছা কাঁধে কয়েকটি মূলা নিয়ে তিনি বসে আছেন। কৌতূহল

হল, জিজ্ঞেস করলাম জন্মস্থান কোথায়? কথায় কথায় প্রকাশ পেল, আমার গ্রামেরই মাইল তিনেক দূরে তাঁর বাড়ী ছিল, এখন বাস্তুহারা হয়ে পোর্টব্লেয়ারে এসেছেন। আমি কে জিজ্ঞেস করলেন। মোটামুটিভাবে পরিচয় দিলাম এবং কেন এসেছি তাও বললাম। জবাব তার মুখ থেকে শুনলাম। "ওঃ আপনারা স্বদেশীবাবু স্বাধীনতা আনছেন! তা এমন স্বাধীনতাই আনছেন যার গুতোয় ভিটেবাড়ী ছাড়্যা আজ আমাগো কালাপানিতে আস্যা ঘর বাঁধতে হৈছে!" সর্বত্র প্রশস্তি আর সম্বর্ধনার মধ্যে একটা বিরাট ধাক্কা, ছন্দপতন—তাই কথাগুলো আজও মনে গেঁথে আছে। সত্যিই এমনটি হ'ল কেন? কামনা ও প্রাপ্তির মধ্যে দুস্ত পার্থক্য কেন?

মনে পড়ে, গ্রামের স্কুলজীবনে 'আনন্দমঠ' পড়েই প্রথম 'বন্দেমাতরম্'-এ দীক্ষা পাই, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল, প্রাণের গহন অন্ধকারে রবির কিরণ পড়ল। ক্রমশঃ 'দুর্দিনের যাত্রীদে'র সঙ্গে দেখা হ'ল, তাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। 'পথের দাবীর সন্ধান পেলাম। মনে পড়ে Dan Bnen এর my fight for Irish Freedom এর কথা। ডিভ্যালেরা—মাইকেল কলিন্স তথা 'সিনফিন' আন্দোলন সম্পর্কে দিনভর আলোচনা, রুশ বিপ্লব তথা লেনিনের জীবনকাহিনী পাঠ, চীনের ছাত্র যুব আন্দোলন সম্পর্কে বই সংগ্রহ ও অধ্যয়ন। ফলে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' হয়ে পড়ল। বন্ধন নিয়মকানুন শৃঙ্খল—সব কিছু দলে যেতে চাই। 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করার ডাক এল—বেরিয়ে পড়লাম 'চিত্ত ভাবনাহীন'।

ফরিদপুরের (বর্তমান বাংলাদেশে) কোটালীপাড়ার এক অখ্যাত ক্ষুদ্রতম গ্রাম মদনপাড়—সেখানেই আমার জন্ম। অল্প বয়সেই পিতৃহীন হলেও কোনদিন বাবার অভাব বোধ করিনি স্নেহময় কাকা তারকনাথের আদরে ও পরিমিত শাসনে। বিধবা মায়ের তর্জনগর্জনে অনেক সময় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্'কে আশ্রয় করার পর থেকে মায়ের 'তর্জনগর্জন'কে প্রীতি ও সহানুভূতির চোখেই দেখেছি—তাদের যে আমাকে হারাবার ভয়; আমার মনে আর বিতৃষ্ণা বা বিরক্তির ভাব জাগত না, বরং করুণা আর সহানুভূতির মধুময় রসে আমার মন ভরে উঠত। আমার জন্য তাদের যে দুশ্চিন্তা, তার জন্য ত আর দোষ দেওয়া যায় না—পরপর কয়েকটি সন্তান হারিয়ে আমার মা তথা অন্যান্যদের মনে যে দাহের জ্বালা জ্বলছিল, আমার জন্মের পরই নাকি সেই আগুনে শান্তির জল পড়ে এবং সব মনস্তাপ নাকি জুড়িয়ে যায়; আমার নাম 'জুড়ান'।

আমাদের পরিবার ঠিক ধনী ছিল না, তবে একেবারে নিস্বঃও নয়। মোটা-মুটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, 'মাত্রা'র মধ্যে থাকতেই অভ্যস্ত। চারদিকে নিষেধের বেড়া—এটা কর্তে নেই, ওখানে যেতে নেই। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার ছিল যথেষ্ট। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কারে আমাদের গ্রামের মতি ও গতি ছিল প্রায় অবরুদ্ধ। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, দত্তা, দেবদাস, জাতীয় বই পড়তে হত অতি সংগোপনে। রাজনৈতিক আলোচনার কোন বালাই ছিল না। ইংরেজের অধীনে থাকাই যে বিধাতাপুরুষের অভিপ্রেত—একথা আমাদের অভিভাবকদের মুখে প্রায়ই শুনতাম। গ্রামের তরুণ যারা বিদেশে (কলিকাতা বা অন্যত্র) থাকতেন। তাদের মারফত মাঝে মাঝে আলো আসত, গ্রামের আঁধার দূর করতে। কিন্তু তাও স্থায়ী হত না, তবে তাদের উৎসাহে 'পাঠ্য' বই স্থলে "অপাঠ্য" বই অনেক পড়েছি এবং তার ফলেই গড়ে ওঠে আমার বই পড়ার বাতিক। সেলুলার জেলে থাকাকালে এই অভ্যাস আরও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে এবং তার জের আজও আমাকে তাজা ও সজীব করে রেখেছে। হতাশাও মনোভঙ্গের হাত থেকে রক্ষা কচ্ছে। আজকের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অবস্থা দেখে যখন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, তখন এই পড়াশুনাই আমাকে নতুন সূর্যের সংবাদ দেয়; আঁধার রাতের অবসান হবেই, রবির কিরণে আবার জগৎ প্লাবিত হবে।

চুঁচুড়ায় হুগলি কলেজে (বর্তমান মহসীন কলেজ) পড়তে আসার ফলেই 'দুর্দিনের যাত্রীদের সাথে পরিচয় ঘটল, ঘনিষ্ট সংযোগ হ'ল, নতুন এক কর্মোন্মাদনায় মেতে উঠলাম। ক্লাব সংগঠন, শরীর চর্চা, ছোরা খেলা, লাঠিখেলা, পিস্তল-রিভলবার নিয়ে নাড়াচাড়া করা, দলে নতুন লোকসংগ্রহ ও সংগঠন করার জন্য আরামবাগে গিয়ে ছদ্মপরিচয়ে গোপন অবস্থান—ইত্যাদি কাজে, দিনগুলি যে কিভাবে ত্বরিৎ গতিতে কেটে যেত জানি না, মনে হত দিনটি যদি আরও একটু বড় হত! কাজের অসুবিধাও ছিল প্রচুর—পুলিশের নজর থেকে নিজেকে রক্ষা করা, অন্যদিকে লোকসংগ্রহ ও সংগঠন গড়ে তোলা—একদিকে আত্মগুপ্তি, অন্য-দিকে আমাদের লক্ষ্য "অত্যাচারী বিদেশী শাসককে হঠাবার জন্য গোপনে আত্ম-ত্যাগী দৃঢ়চেতা কর্মী সংগ্রহ"। এই কাজ বাস্তবে যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। প্রকাশ্যে সভাসমিতি করার নির্দেশ ছিল না, পুলিশের নজরে পড়বার আশঙ্কা সব সময়েই ছিল—তবু ওরই মধ্যে চলাফেরা করতে হত। শয়ন ভোজনের কোন স্থান-কাল ছিল না। এমনিভাবে কিছুদিন কাটিয়ে আবার

কলেজ জীবনে ফিরে এলাম।

তখন বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে, ভারতে বেকার সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। এসব সমস্যার গূঢ় রহস্য তখনও বুঝতে শিখি নাই, শুধু ভাসাভাসা কয়েকটি বুলি কপচাই। সোভিয়েট রাশিয়ায় তখন পরিকল্পনার যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন গরম। বরিশাল সহরে চৌদ্দ বছরের ছাত্রের (রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য) হাতে অত্যাচারী দারোগার মৃত্যু, কেন্দ্রীয় এসেম্বলি ভবনে বোমা বিস্ফোরণ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী যতীন্দ্রনাথ দাসের অনশনে আত্মদান, আপোষকামীদের শত আপত্তি সত্ত্বেও লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯) স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করায় দেশজুড়ে নবজাগরণ ও আইন অমান্য আন্দোলন, 'ধন্য চট্টগ্রামে' অস্ত্রাগার দখল। মেদিনীপুরের দাসপুরে জনতার হাতে অমিত শক্তিধর দারোগার মৃত্যু ও ছোটদারোগা নিখোঁজ, খাস কলকাতায় শাসকদের প্রাণপুরুষ চার্লস এলবার্ট টেগার্টের (CAT) উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-বাদল-দীনেশের অভিযান, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডী ও আলিপুরের জেলা জজ গার্লিকের (এর আদালতেই দীনেশের মৃত্যুদণ্ড হয়) গুলিতে মৃত্যু, কুমিল্লায় শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর হাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সের মৃত্যু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের সময় বাংলার লাট ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার জন্য বীণা দাসের গুলিবর্ষণ—এমনি সব শত শত চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসিক ঘটনার প্রবাহে সেদিনকার ছাত্রযুবকদের মনে আগুন জ্বলেছিল, আমিও তার শরিক না হয়ে থাকতে পারিনি।

এরপরেই আসে "ওয়াটসন পর্ব"। তার আগেই আমাদের অন্তরঙ্গসাথী সিরাজুল হক এবং অন্যান্যেরা ধরা পড়ে গেছেন। আমরা চঞ্চল ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছি। তখন শাসকদের মধ্যে কথা উঠেছে বাংলাকে non-regulated Province-এ পরিণত করার। এর প্রতিবাদ করা দরকার। জনগণের উপর নিপীড়ন আরও দুঃসহ করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে European Association। আর এদের তথা শাসক শ্রেণীর মুখপত্র হল দৈনিক Statesman আর এর সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসন। এই ওয়াটসন সাহেবই হলেন লক্ষ্য।

জয়নগরের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুনীল চ্যাটার্জী, হুগলীর বিজয় মোদক (ইনিও ইঞ্জিনিয়ার), চন্দননগরের তিনকড়ি মুখার্জী প্রভৃতি ছিলেন এই কাজের সংগঠক 'আমি তখন চুঁচুড়া ছেড়ে কলিকাতা এসেছি

দলের নির্দেশে আর ভর্তি হয়েছি স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলেজে যাই আসি, কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। আমার কাছে থাকত কিছু বোমা, পিস্তল ও কাগজপত্র—আমি ছিলাম store room রক্ষক; পুলিশ আমার সম্পর্কে কিছুই জানত না।

আলফ্রেড ওয়াটসনের উপর প্রথম আক্রমণ (৫.৮.১৯৩২) ব্যর্থ হল। খুলনার অতুল সেন ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। তারপর তিনি পটাসিয়াম সাইয়ানাইড খেয়ে আত্মোৎসর্গ করেন। (এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন এখন যেখানে মেট্রো সিনেমা সেখানেই ছিল তখনকার States-man কার্যালয়। অনেক পরে এই অফিস স্থানান্তরিত হয় সেণ্ট্রাল এভিনিউতে)। এরপর কিছু ধরপাকড় হয়। কিন্তু সংগঠকদের কাউকেই ধরতে পারেনি। বিপ্লবীরা হতাশায় বসে পড়েনি, আবার আক্রমণের পরিকল্পনায় ব্যস্ত হলেন। আক্রমণের জন্য মোটরগাড়ী কেনা হল, বিশ্বাসী ড্রাইভার সংগ্রহ করা হল; আক্রমণের দিনও স্থির করা হ'ল ২৮শে আগস্ট, ১৯৩২।

দিনের শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ ওয়াটসন সাহেব তার মহিলা সেক্রেটারীকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়েছেন। ময়দানে নেপিয়ার রোডের কাছা-কাছি আসার সময় একটি হুডখোলা গাড়ী এসে গেল। সেই গাড়ীর ভিতর ছিলেন তিনজন এবং ড্রাইভার। গাড়ী থেকে ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। ওয়াটসনের কাঁধে গুলি লাগল, বিশেষ ক্ষতি হল না। সাহেবের গাড়ীর পথ রোধ করে আরও গুলি ছোঁড়া হয়। কিন্তু সাহেবের জীবনহানি হল না; সাহেব গেলেন বেঁচে, তবে এদেশে আর থাকলেন না—আরোগ্যলাভের পরই বিলাতে চলে গেলেন। বিপ্লবীদের গাড়ী জীরাট ব্রীজ ধরে সাহাপুরের দিকে ছুটে চলল এবং একটা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খেয়ে বিকল হয়ে গেল। আরোহী তিনজন বীরেন রায়, মণি লাহিড়ী আর অনিল ভাদুড়ী নেমে এলেন আর ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। মণি ও অনিল বিপদের আশঙ্কায় পটাশিয়াম সাইয়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আর বীরেন রায় এক মোটর গাড়ীর মালিককে এক করুণ কাহিনী বলেন এবং তার মন করুণার্দ্র হওয়ায় তারই গাড়ীতে চড়ে বীরেন রায় কেশব সেন স্ট্রীটে আসেন আশ্রয় পাবার জন্য। এইখানে বেশ বদল করে তিনি চলে যান। পরে অবশ্য তিনি ধরা পড়েন এবং ডেটিনিউ হন। মোটর গাড়ীর মালিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুলিশকে খবর দেন। রাতে কোন খবর না পেয়ে সুনীল চ্যাটার্জী পরদিন সকালেই ঐ বাড়ীতে

আসেন। আর পুলিশ অনায়াসে তাকে ধরে ফেলে।

এরপর শুরু হল ব্যাপক ধরপাকড়। পুজার ছুটিতে কলিকাতায় থাকার নির্দেশ পেলাম, ফলে বাড়ী যাওয়া হল না। রামকান্ত বোস স্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল, সিকদার বাগানের বাসা ছেড়ে দেওয়া হল। সুশীতল রায় চৌধুরী, ইন্দুসুধা ঘোষ, বিজয় মোদক, প্রভৃতি অনেকেই এ বাড়ীতে থাকতেন। লক্ষীপুজার পরদিন (সম্ভবতঃ ১৫.১০.১৯৩২) সকালে আমার ঐ বাড়ীতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু ঘুম ভাঙতে দেরী হওয়ায় আমার ওখানে যেতেও একটু দেরী হয়। তাড়াতাড়ি ঢুকতে গেছি, এমনি সময় কয়েকজন এসে একেবারে জড়িয়ে ধরল, আমার হাত নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত রইল না। আমি ধরা পড়লাম। আমার পকেটে একটি চিঠি ছিল, সেটা নষ্ট করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলাম। পুলিশ আমার বাসার সন্ধান পেল। এই বাড়ীর সামনে ধরা পড়ে অনেকেই—বিজয় মোদক, তিনকড়ি মুখার্জী প্রভৃতি। আমাদের ধরে শ্যামপুকুর থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘর, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তল্লাসী হয় এবং বোমা, পিস্তল, কার্তুজ প্রভৃতি পাওয়া যায়। তল্লাসী শেষ হবার পর পুলিশ আমাকে বাসায় নিয়ে যায় এবং Search list-এ সই করতে বলে। আমি সই করতে নারাজ ফলে ব্যক্তিগত লাভ হল কিছু চড় আর লাথি, আর বাড়ীর আত্মীয়দের উপর নির্যাতন। বাড়ীর কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হল। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ আমি পরে জানতে পারি। পরে বোমা পিস্তল প্রভৃতির দায়িত্ব আমার বলে স্বীকার করায় এবং Search list-এ সই করায় ধৃত আত্মীয়দের ছেড়ে দেওয়া হয়। দেহ আমার মোটেই সবল নয়। তাই সামান্য কয়েকটা চড় আর লাথি খাবার ফলে আমার জ্বর হয় এবং হাওড়া জেলে স্থানান্তরিত হই। লালবাজার লকআপে এক রাত্রির বেশী থাকতে হয়নি দারুণ জ্বর হওয়ায় এবং ফলে আমাকে আর দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে আমার বিচারও স্বতন্ত্রভাবে হয়—আমাকে দশ বৎসরের নির্বাসন দন্ডে দন্ডিত করা হয়।

এরপর চেষ্টা হয় একটি ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করবার। মজিলপুরের সৌরেন দত্ত রাজসাক্ষী হবে—এমনি কথা শোনা যাচ্ছিল ; কিন্তু পরে সে বিগড়ে যায়। সৌরেনের এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে আই. বি. পুলিশ জানতে পারে গার্লিক হত্যাকারীর প্রকৃত পরিচয়। সৌরেনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিল গার্লিকের

হত্যাকারী কানাই ভট্টাচার্য ; বন্দুকের গুলিতে কানাই-এর ক্ষতবিক্ষত দেহের ফটো দেখে সৌরেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এতদিন পুলিশ এই বুলেটবিদ্ধ দেহের কোন পরিচয় সংগ্রহ করতে পারে নাই। পুলিশের চাপে পড়ে সৌরেন অনেক কথাই তাদের জানায়। সনাক্তকরণ প্যারেডেও অনেককে সে সনাক্ত করে। তার স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দেড় শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন—ডঃ ত্রিগুণা সেন, বিজয় মোদক, প্রাণতোষ চ্যাটার্জী, পরিতোষ চ্যাটার্জী বিমল কুন্ডু, নলিনীপতি ব্যানার্জী, মান্নান, সুশীল রায় চৌধুরী, ইন্দুসুধা ঘোষ, প্রভৃতি। সকলের কথা আজ ঠিক মনে নেই। আর অনেককে চিনতাম না। সৌরেন বিগড়ে যাওয়ায় এবং আর কোন রাজসাক্ষী সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশ এই ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিল। তবে ছাড়া পেল না কেউ—সকলকেই ডেটিনিউ করে রাখা হল।

ওয়াটসন গুলি চালনার মামলার ও স্বতন্ত্রভাবে বিচার চলে। এতে সুনীল চ্যাটার্জী প্রমোদ বসু ও অমর ঘোষের সাজা হয়; সুনীল চ্যাটার্জীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, প্রমোদ বসুর দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ড আর অমর ঘোষের দুই বৎসর কারাদণ্ড। বাকী সকলকে এই মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে ডেটিনিউ করা হয়। এই মামলার সকলকে এবং আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করা হয়।

দণ্ডিত হবার পর প্রথমে আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে আসে। এখানে খুব ভালই ছিলাম পরিচিত বন্ধুদের পেয়ে, খাবার কষ্ট বা বন্দী থাকার কষ্ট মনেই হয়নি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হল। এইখানেই সুরু হল প্রকৃত জেলজীবন; উঠতে বসতে ধমক আর গালাগালি, মেট পাহারার লাঠি। কথায় কথায় নির্জন সেলবাস, মাড়ভাত, ষ্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ, ডাণ্ডাবেড়ি, প্রভৃতি শাস্তি। রাজসাহী জেলে থাকার সুযোগ (?) যে সব ব্যক্তির হয়েছে, তাদের প্রায় সকলকেই এসব সৌভাগ্যকে (?) জলভাতের মত মেনে নিতে হয়েছে। আমার ভাগ্যেও সব কয়টিই জুটেছে। উপরন্তু জুটেছে কিছু শারীরিক ব্যাধি।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিউকের আমলে প্রত্যেককেই উঠতে লাঠি, বসতে ঝাঁটা খেতে হত। দণ্ডধর লিউক সাহেব দুর্দান্ত বিক্রমে জেল শাসন করতেন—কেউ ট্যাঁফু করতে পারত না। এই উৎপীড়নের খবর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৯৩২-এর নভেম্বর লিউক সাহেবের উপর গুলি চলে। আঘাত গুরুতর হলেও মারাত্মক নয়। ফলে সুস্থ হবার পরই লিউক সাহেব এদেশ থেকে পাততাড়ি

গোটান। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি রাজসাহী জেলে আসি, সাধারণ কয়েদীদের মুখে বিজন সেন নামে এক রাজনৈতিক বন্দীর কথা শুনি; সকলেই বলত—"খুব লড়াকু ছেলে, কিছুতেই মাথা নোয়াত না।" পরে সেলুলার জেলে বিজন সেনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯৩১ সালের নভেম্বরে পুটিয়া মেল লুট মামলায় বিজয় সেন আর অমলেন্দু বাগচীর প্রত্যেকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। দেশ ভাগের পর বিজন পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান এবং এই জেলেই তিনি শহীদ হন সামরিক বাহিনীর গুলিতে।

মা ও কাকার সঙ্গে শেষ দেখা হয় রাজসাহী জেলে বোধহয়। ১৯৩৩-এর আগস্টে। ধরা পড়ার পর কাকার সাথে এই প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ, কারণ ছাড়া পাবার পর আর তাকে পাইনি। কাকা কোন কথাই বলতে পারলেন না। গলা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম। মায়ের চোখে জল। আমি ভরসা দিলাম, কয়েকটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে—রোজগারের জন্য, পড়াশুনার জন্য কত ছেলেই ত দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যায়। কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথাই তাঁদের মনে দাগ কাটল বলে মনে হল না। সেপ্টেম্বরে আমাকে ফের আলিপুর জেলে নিয়ে আসা হল এবং দু'একদিনের মধ্যেই আন্দামানগামী "মহারাজা" জাহাজের খোলের লোহার খাঁচায় পুরে দেওয়া হল; আমরা কালাপাণি রওনা হলাম। জাহাজের গ্লানিকর কষ্টদায়ক দিনগুলি কাটিয়ে তিনদিনের মাথায় আমরা পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছলাম। সেলুলার জেলে ঢুকে মনে হ'ল আমরা এক বিরাট রাক্ষসের হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঢুকছি। অন্ধকার, ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকার; মুখ বন্ধ হয়ে গেলেই আমরা শেষ হয়ে যাব। কিন্তু হাঁকরা মুখ বন্ধ হ'ল না। আমরা ছয় নম্বর ওয়ার্ডে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। (সেলুলার জেলে সাতটা ওয়ার্ড ছিল, সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে গোলাকার চাকার মত সাতটা বাহু বেরিয়ে এসেছে। আজ অবশ্য মাত্র তিনটি বাহু আছে—এক, ছয় এবং সাত। আমরা যে ওয়ার্ড-গুলিতে ছিলাম, সেগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে—গোবিন্দবল্লভ মেমোরিয়াল হাসপাতাল; যেখানে গড়া উচিত ছিল শহীদ স্মৃতি হাসপাতাল, সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন গোবিন্দবল্লভ, যার সঙ্গে সেলুলার জেলের কোন সম্পর্ক নাই।)

আমাদের আসার কিছুদিন আগেই বন্দীদের ছেচল্লিশ দিনের (১২-৫-৩৩—২৬-৬-৩৩) মরণপণ অনশন সংগ্রামের অবসান ঘটে; মহাবীর সিং (লাহোর

ষড়যন্ত্র), মোহনকিশোর দাস (ময়মনসিংহ) এবং মোহিত মৈত্র (কলিকাতা অস্ত্র আইন) শহীদ হন এবং এদের জীবনের বিনিময়ে বন্দীরা দৈনন্দিন জীবনে কিছু সুযোগ সুবিধা পান—মশারি, আলো, খেলাধুলোর সুযোগ, পড়াশুনার সুযোগ, জেলখানার কাজের ব্যাপারে কঠোরতা হ্রাস, উপযুক্ত চিকিৎসা, খাবার জল ও আহার্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ফলে আমরা কালাপাণির যে ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা পড়েছি বা শুনেছি, তার চেয়ে একটু মোলায়েম রূপেই সেলুলার জেলকে পেলাম। ক্রমশঃ সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। দেখা হল পুরাতন বন্ধু সিরাজদার সঙ্গে। উত্তরপাড়ার ধ্রুবেশ চ্যাটার্জীর (দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা) সাথে। ডাঃ নারায়ণ রায়ের সঙ্গে কথা হল, মুক্তি পাবার পরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাঁর সম্পর্ক কি বলা উচিত বলতে পারি না—এক কথায় অপূর্ব। এত দরদ আর কোথায়ও দেখিনি। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হল বিমল দাশগুপ্ত, বঙ্গেশ্বর রায়, গোপাল আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে। শহীদ বিজয় সেনের কথা আগেই বলেছি। ব্যক্তিগতভাবে আরও একজনের কথাও বলা দরকার। তিনি একজন বিহারী, কেদারমণি শুকল। মতিহারী ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাছে যে প্রীতি পেয়েছি তা ভুলবার নয়। সাদাসিধে এই নীরব বিপ্লবীর সঙ্গে জেলের বাইরে এসেও যোগাযোগ ছিল। জেলে থাকাকালে কলিকাতার সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষা ব্যাপার তার অবদান ছিল যথেষ্ট ; এই ব্যাপারে রবি নিয়োগীর কাজকর্মও কম নয়।

সেলুলার জেলে থাকাকালে থিয়েটার করেছি। হৈ হুল্লোড় করেছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশী যা করেছি তাহ'ল পড়াশুনা ; এই কাজে সব সময়ের সাথী ছিল ময়মনসিংহের রবি নিয়োগী। (মুক্তি পাবার পর তার সঙ্গে আর একসাথে কাজ করার সুযোগ আসেনি। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কারণে দুঃসহ জেল নির্যাতন প্রভৃতি সহ্য করেও সে রয়ে গেছে ময়মনসিংহে, আর আমি কলিকাতায়। আজও সে বাংলাদেশে আছে) ভবিষ্যৎ পথের সন্ধানে তখন সেলুলার জেলের প্রায় সকলেই দিনরাত ব্যস্ত লেখাপড়ায় আর আলোচনায় সেলুলার জেল যেন পরিণত হয়েছে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর আমরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অবশেষে ১৯৩৫-এর এপ্রিলে জন্ম হল কমিউনিষ্ট কনসোলিডেশনের পঁয়ত্রিশ জনকে নিয়ে। আর তার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী, ইতালি-জার্মানীতে ফ্যাসিজমের উত্থান ও ব্যাপক ক্ষমতালাভ চীনের উপর জাপানের অবিরাম হামলা, সোভিয়েট রাশিয়ার সুনিশ্চিত অগ্রগতি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, কংগ্রেস গান্ধী-নেহরুদের খেলা—সব বিষয়েই আমরা দৃষ্টি রাখতাম।

দ্বিতীয় পর্ব

মাতৃ-মন্ত্রী-সাস্ত্রী

মাতৃ-মন্ত্রী-সান্ত্রী

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর শুভাগমনে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিলে (বাংলা ১৩০৮ সালের ২রা বৈশাখ) সোমবার মেদিনীপুর জেলার তমলুক-মহকুমা শহরে অজয় মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। গান্ধী-যুগে যেসব বাঙ্গালী স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম নিয়োগ করে দেশপ্রেমে, ত্যাগে ও জাতির সেবায় প্রথম শ্রেণীর নেতা হিসাবে প্রখ্যাত, বরণীয় ও স্মরণীয় অজয় কুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী প্রবর্তিত স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে দেশজননীর মুক্তিলাভ পর্যন্ত সকল প্রকার আন্দোলনে ও সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অক্লান্ত সেনানী জীবনের সায়াহ্নকাল পর্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

অজয়কুমারের পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছিল হুগলী জেলার উত্তরপাড়া। তাঁর পিতৃদেবের নাম শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শরৎ-বাবু বিয়ে করেছিলেন তমলুকে। অজয়বাবুরা ছয় ভাই এবং তিন বোন। উনি ভাইদের মধ্যে চতুর্থ। সর্ব কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও সুবক্তা। অজয়বাবুর মন্ত্রীসভায় তিনি তিনবারই মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী গীতা দেবী খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেত্রী এবং বর্তমানে সংসদ সদস্যা। অজয়বাবুর জীবনে তাঁর বংশ গৌরবের প্রভাব কম ছিল না। ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে মেধাবী ছাত্র বি. এস. সি পরীক্ষায় না বসেই গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯২১ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন স্থাপিত হয়। সেই সময় তমলুক মহকুমাও জাতীয় শিক্ষা প্রসারে পিছিয়ে থাকল না। মহিষাদল থানার কাঁকুড়দা গ্রামে যে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় তা অনিবার্য কারণে ১৯২৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এর পরেই তথাকার

অন্যতম শিক্ষক সতীশচন্দ্র সামন্ত তাঁর প্রায় সম বয়সী অজয়বাবুকে নিয়ে তমলুক থানার নিমতৌড়ি গ্রামে দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি গঠন করে কয়েকটি গ্রামের উপর কাজ আরম্ভ করেন। হয়ত এটাই অজয়কুমার ও সতীশচন্দ্রের মিলনের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ইঙ্গিত ছিল। আজীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এই দুই বন্ধুর প্রথম মিলনের দিনটি তাই স্মরণযোগ্য।

তাঁর কর্মজীবন এখানে আরম্ভ বটে কিন্তু প্রশাসনের গুরু দায়িত্ব পেয়েও সমাজ সেবা তথা জনসেবার কাজে তিনি চিরদিন ব্রতী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে নিমতৌড়ি পল্লী সেবা কেন্দ্রের অবদান অনবদ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ১৯৩০ থেকে প্রতিটি আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় অংশী ও দীর্ঘদিনব্যাপী কারাবাসী। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের আহ্বান এল এবং তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বরের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড এবং একুশ মাস জাতীয় সরকারের কীর্তিকলাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। আর এ সব কিছুর প্রধান রূপকার ও পরিচালক হলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

পন্থীদের যে আজ এত রমরমা—এরও মূলে সেই অজয় মুখোপাধ্যায়। তিনিই পথ দেখিয়েছিলেন। সেই যুগে যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন বিকল্প সরকার গঠন করা সম্ভব বলে কেউ আশা করতে পারেন নি—তখন তিনিই প্রথম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন—এককভাবে না পারি, মিলিত-ভাবে আমরা কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হতে পারি।"

মৃত্যুর পর অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে সব বিতর্কের অবসান ঘটেছে। এখন আমরা স্মরণ করব স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান ও কংগ্রেস রাজত্বে নীতি ও মূল্যবোধের জন্য তাঁর নির্ভীক লড়াইয়ের কথা। বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলিরও তাঁর প্রতি "কৃতজ্ঞতা-বোধের কারণ আছে। তাঁর হাত ধরেই এঁরা ক্ষমতার পট পরিবর্তন সম্ভব করেছিলেন।" ঠিক যেমন করে ১৯৪২ সালে ১৭ই ডিসেম্বর তমলুকে সমান্তরাল জাতীয় সরকার—(মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার) স্থাপনা এবং তার ২১ মাসের প্রচণ্ড কার্য-কলাপের মধ্য দিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদেরও বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যে সরকার সম্পর্কে তদানীন্তন বাংলার ছোট লাট 'কেশী'কেও তখনকার বড়লাটের কাছে ১৯৪৪ সালের ১৪ই আগষ্টে রিপোর্টে লিখতে হয়েছিল—(অনুবাদ) "মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় রাজনৈতিক অপরাধ এখনও প্রবল। স্থানীয় ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টকে এরা জাতীয় সরকার নামে অভিহিত করে এবং এখানের অধিবাসীদের বৃহৎ অংশ এই সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই জাতীয় সরকার কংগ্রেসী বিদ্রোহের শুরু থেকে বর্তমান আছে।"

শুভেচ্ছা বাণীতে লিখেছেন—"..মেদিনীপুর জেলার অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে সকলের কাছে এবং মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুরের আন্দোলনের প্রশংসা করেছেন ভূয়সী। দেশপ্রাণ যে আন্দোলনের স্রষ্টা তার শেষ অধ্যায় সম্পন্ন হয় বন্ধুবর শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী এবং তাঁর সহকর্মীদের নেতৃত্বে। সংগঠনের ক্ষেত্রে, গণবিপ্লবের ক্ষেত্রে, প্রশাসনে অজয়বাবুর কৃতিত্ব ভুলবার নয়। সর্বস্বত্যাগী,

নির্ভীক দেশকর্মী ও নেতা হচ্ছেন আমাদের অজয়বাবু। দুঃখের সঙ্গে বলছি যে কামরাজ প্ল্যানে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করা হয়েছিল উপদলীয় স্বার্থে এবং তাঁর বহিষ্কার সেইজন্য।... লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে বলছি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অজয়বাবুর প্রতি অবিচার করেছে—অকারণে তাঁর নিন্দা করেছে।"

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে যে স্মৃতিচারণ করেছেন তাই দিয়ে এই জীবনপঞ্জীর সমাপ্তি টানা যেতে পারে ঃ "আজকাল রাজনৈতিক নেতা বলতে আমরা সাধারণতঃ যে রকম লোককে বুঝি, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ঠিক সে ধরণের মানুষ ছিলেন না। বরং স্বাধীনতার আগে দেশের মানুষ যাঁদের 'দেশসেবক' বা 'বিপ্লবী বলে চিনত—অজয়বাবু ছিলেন—সেই ধাঁচের ভদ্র, নম্র, বিনয়ী• অথচ তেজী : নিঃস্বার্থ ; পরার্থেপ্রাণ উৎসর্গীকৃত, চালচলনে অত্যন্ত সাধারণ, অথচ ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল—এই ছিল আগের দিনের বিপ্লবী ও দেশসেবীদের ছবি। সেরকম মানুষ আজকাল আর বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে। সে যুগের অনেক বিপ্লবী ও দেশসেবক স্বাধীনতার পর ; কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মন্ত্রী বা এম, পি,—এম, এল, এ হয়ে পাল্টে গিয়েছিলেন। তাঁদের সে করুণ পরিবর্তন—অধঃপতন, আমরা অনেকে চোখের উপর দেখেছি। আবার দু'একজন বিপ্লবী বা দেশ সেবককে দেখেছি —যাঁরা পরে উচ্চরাজপদে থেকেও পালটাননি ; আগে যা ছিলেন পরেও মোটামুটি তাই থেকেছেন। সেই রকম একজন ছিলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, অর্থাৎ যখন তিনি বিপ্লবী ও দেশসেবক, তখনও চাল-চলন, আচার ব্যবহারে যেমন ছিলেন, পরেও তার কোন পরিবর্তন হয়নি—দীর্ঘ কাল মন্ত্রীত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রীত্ব করেও না।

সুশীল কুমার ধাড়া বলেছেন "স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয় মুখোপাধ্যায়কে দেখিনি, দেখেছি মন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়কে। খুব সাধারণ বেশভূষা, পরণে হাতে কাচা ধুতি, পাঞ্জাবী পায়ে রবারের স্যাণ্ডেল। অজয়বাবু তার পাঞ্জাবীও নিজেই বানিয়ে নিতেন, জামা কাপড় কাচতেনও নিজেই। রোজ সকালে আয়রণ করা বা ইস্ত্রি

করার ধার ধারতেন না কখনো। এমন কি যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী, তখনও না। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, কিন্তু তেজ ছিল প্রচণ্ড।

"ঐ শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী লোকটি কতটা দুর্বার ও তেজী হয়ে উঠতে পারেন পশ্চিম বাংলার সকল রাজনীতিবিদ দেখেছিলেন ১৯৬৬ থেকে '৬৯ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার।"

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত কামারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯১১ সালের ২রা মার্চ ডালহৌসী বোম কেসে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ঐ বছরই মার্চের ২৭ তারিখে প্রকাশিত বিচারের রায়ে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে আন্দামানে সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন।

জেল থেকে মুক্তির পর তিনি সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার দায়ে তিনি জামসেদপুর থেকে বিতাড়িত হলেও পরবর্তীকালে হুগলী জেলার শ্রমিক শ্রেণীর ভেতরে থেকে কাজ করেন।

১৯৪৪ এর ২১শে এপ্রিল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

নরেন ঘোষ চৌধুরী

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। বিশেষতঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন।

১৯১৫ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বরে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার শিবপুরে বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর আন্দামানে নির্বাসিত হন। দেশে ফেরার পরও বহু বছর কারান্তরালেই কাটে।

গোপীনাথ রায়

জন্ম :—অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার উধুনিয়ায়। জন্ম সাল—১৮৮৭।

পিতা—স্বগীয় ব্রজেন্দ্রলাল রায়।

রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক।

১৯১৫ সালের ৩০শে এপ্রিল নদীয়া জেলার খলিসপুরে এক দোকান লুঠের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এবং আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাদণ্ডের মেয়াদকালে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯২২ সালে দেশে ফেরৎ আসেন এবং জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। টেগার্ড শুটিং মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯২৭ সালে দ্বিতীয়বার জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

কুমারচন্দ্র জানা

দুর্ধর্ষ গান্ধীবাদী নেতা কুমারচন্দ্র জানার চরিত্র অংকন খুবই দুরূহ কাজ। দারিদ্র্যের কঠিন, বাস্তব ও রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে যে মানুষটির বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছিল, তাঁরই অগ্রজের স্নেহে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক রাখাল বালক থেকে মেদিনীপুর জেলার সর্বজনপ্রিয় আদর্শ কংগ্রেসী নেতা।

চিরোন্নতশির বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি, আর লক্ষ্য ছিল তাঁর মহাত্মাগান্ধীর আদর্শের সফল রূপায়ন—তাঁর স্বীয় জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলা তথা সুতাহাটা থানায়। তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনে বীরেন্দ্রনাথের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, গান্ধীজীর আদর্শ নিষ্ঠা, কথায়-চলায়-বলায় সম্পূর্ণভাবে মেদিনীপুরের গ্রাম্যভাব—যা তাঁকে কৃষিপ্রধান মেদিনীপুরের গ্রাম গ্রামান্তরে তাদের অতি নিকটজন, অতি আপন মানুষ করে তুলেছিল। সেই যে কবে কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি খদ্দর পরতে শুরু করেছিলেন এবং চরকায় সুতাকাটা ধরেছিলেন তার আর কোন বিরতি ঘটেনি তাঁর জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত। গান্ধী আদর্শের নির্ভেজাল নিদর্শন এই মানুষটিকে অনেকে যেমন পছন্দ করতে পারতেন না, তেমনি বহুজন তাঁকে ভালবাসত, ভক্তি করত পরমাত্মীয় রূপে, অতি কাছের লোক হিসাবে। চিরোন্নতশির শাসমল মহাশয়েরযোগ্য শিষ্য ছিলেন তিনি—তাঁরই পথ অনুসরণে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত

করেছিলেন—দীর্ঘপ্রায় ষাট বছর রাজনৈতিক জীবনে তার বহুমুখী প্রকাশ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল মেদিনীপুরের গ্রামে গঞ্জে।

অক্লান্ত কর্মী কুমারচন্দ্র দেশ সেবায়ও অক্লান্ত ছিলেন। তাঁর আদর্শবাদ অনেক সময় গোঁড়ামী মনে হলেও তিনি ছিলেন সেখানে নির্ভেজাল। গান্ধীজীর অহিংস আদর্শের সুউচ্চ শিখর থেকে এর সূত্রপাত এবং কুটির শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু চরকা পর্যন্ত এর সর্বব্যাপী বিস্তার। রোগ ব্যাধির আরোগ্য স্বভাব-চিকিৎসার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ এবং তার সাফল্য লাভের কাহিনী শুনলে অনেকে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাবেন।

কুমারচন্দ্রকে অনেকে দুর্মুখ বলে জানে; কঠিন কালো রং-এর এই প্রস্তর খণ্ডটির মধ্যে যে স্নেহ কোমল ভাবটি লুকিয়ে থাকত তারই আকর্ষণে শত-শত নিষ্ঠাবান কর্মী যুবক-যুবতী তাঁকে গুরুর মত ভক্তি করত, নেতার মত মান্য করত, আর তাঁকে বেষ্টন করে একটি নূতন সুবৃহৎ আশ্রমিক সংসার গড়ে তুলেছিল।

কুমারচন্দ্রকে বাইরের জগতে ও কার্যক্ষেত্রে রসো বৈ সঃ রূপে অনেকে দেখেছেন তেমনি পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামী চরিত্রের একটি মূর্ত প্রতীক রূপে তিনি প্রতিভাত হয়ে উঠেছিলেন তা অনস্বীকার্য।

গান্ধীজীর তিরোধান ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ৩০শে জানুয়ারী। তাঁর একনিষ্ঠ মন্ত্রশিষ্য সন্ত বিনোবাভাবে গান্ধীমন্ত্র 'ভূমি গোপালকী' জপ করতে করতে স্বীয় তপস্যায় প্রায় অর্ধযুগ অতিবাহিত করেছেন। তিনিও আজ ইহজগতে নেই। কুমারবাবুও নেই—যিনি এই ভূদান আন্দোলনকে মেদিনীপুর জেলায় বিস্তৃত করবার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও কঠোর পরিশ্রম করে আনন্দ পেতেন। সেই দিক থেকে গান্ধী ধারার এই নবগঙ্গা অনায়নের 'ভগীরথ' ছিলেন বহুজনের 'কুমারদা'।

এইরূপ একটি মানুষের চরিত্র অঙ্কন এবং তারই ভিত্তিতে তমলুক ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের দেশ মুক্তির সংগ্রামের তথ্যভিত্তিক ইতিহাস সৃষ্টি যে কত কঠিন কাজ আশাকরি তা সকলে অনুভব করতে পারবেন।

মেয়াদ অন্তে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারবাবু জেল থেকে মুক্তি পান; কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আসার কয়েকদিন পরে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্রিফিথ কুমারবাবুকে মহিষাদলের রাজবাটীর গেষ্ট হাউসে ডেকে পাঠান। কুমারবাবু সেখানে গিয়ে গ্রিফিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি কুমারবাবুকে বললেন, "আপনার উপর সরকারের বিশ্বাস নাই। আপনি ছাড়া পেলেই আবার গ্রামবাসীদিগকে আন্দোলনে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত ও সক্রিয় করে তুলবেন। সেজন্য সরকারী নির্দেশে আপনাকে হোমইনটার্ন করা হ'ল। আপনি বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না।" কুমারবাবু সরকারকে এই আদেশ অমান্য করবার কথা জানিয়ে দেন। গ্রিফিথের নির্দেশানুসারে একজন পুলিশ অফিসার কুমারবাবুকে বাসুদেবপুরে পৌঁছে দিয়ে যান। সেই থেকে কুমারচন্দ্র বাসুদেব পুরের একটি পড়ো পুষ্করিণীর পাড়ে একটি ডেরায় বসবাস আরম্ভ করেন। আর তাঁর বাস্তুভিটায় ফিরে যাননি। পূর্ব থেকে এখানে একটি কংগ্রেস শিবির পরিচালিত হ'ত। কুমারবাবু এই পুষ্করিণীর একপাশে বসবাসের উপযোগী কিছু ঘরবাড়ী তৈরী করে নাম দিলেন "গান্ধী আশ্রম"। সেই থেকে আজীবন তিনি সস্ত্রীক এইখানে কাটিয়েছেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী ইউনিয়ন জ্যাক তোলার দিন এসে গেল। আগেই সুতাহাটার বড় দারোগা গান্ধী আশ্রমে এসে খবর দিলেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসতে পারবেন না। তাঁর বদলে এ. ডি এম. সাহেব আসবেন। এদিন প্রবল বর্ষা হয়। এ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা শাসকের গাড়ীকে দেউলপোতা থেকে বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রম পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাইল পথ কাদা রাস্তায় আসতে হয়। তিনি যখন গান্ধী আশ্রমে পৌঁছলেন তখন বেলা তিনটা।

এ ডি. এম যখন আসেন তখন কুমারবাবু চরকায় সুতা কাটছিলেন। এ. ডি. এম. নীরবে তাঁর পাশ দিয়ে পতাকা উত্তোলন দণ্ডের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। উৎসুক এক বিরাট জনতা কি হয়, কি হয় দেখবার জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জমায়েত হয়েছিল। এ, ডি. এম. পতাকা উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত। তাঁর ইঙ্গিতে ডাকার উদ্দেশ্যে বড় দারোগা কুমারচন্দ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি সরকারী

নিমন্ত্রণ পত্রের উপর লিখে দিলেন "We the Indians specially the people of Midnapore are treated like cats and dogs, so I am not going to salute the Union Jack. দারোগা পত্র নিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন।

বিবাহের ২৬ বৎসর পরে ১৯৩৮ সালে কুমারচন্দ্রের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কন্যাটির নামকরণ করেছিলেন 'মুক্তি'। তাঁর বর্তমান সন্তান-সন্ততি বলতে একমাত্র ঐ মুক্তি।

কুমারচন্দ্রের জীবনধারণ প্রণালী ছিল চিরদিন সাদাসিদে। কোন প্রকার বাহুল্য তাঁর মধ্যে ছিল না। অর্থের প্রতি তাঁর কোন প্রকার মোহ কোনদিন দেখা যায় নি।

কংগ্রেস এই নামটি অতি অজগাঁয়ের ছেলে—বউয়ের মুখে কেউ যদি প্রথম তুলে দিয়ে থাকেন তবে তিনি হলেন কুমারচন্দ্র। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সংগঠনে কুমারচন্দ্রের অবদান অতুলনীয়।

অহিংস সাধনার পীঠস্থান গান্ধী আশ্রম হয়ে উঠল বিপ্লববাদের জন্মস্থান। ২৮শে সেপ্টেম্বর গভীর রাতে কয়েক ঘণ্টায় কয়েক শত বিশ্বকর্মা সকলের অজান্তে নীরবে বড় বড় রাস্তা কেটে, কালভার্ট ভেঙ্গে, বড় বড় গাছ কেটে রাস্তার উপরে ফেলে সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় থেকে পিপীলিকা শ্রেণীর মত হাজার হাজার নরনারী সুতাহাটা থানাকে লক্ষ্য করে চারদিক থেকে এসে প্রায় ১টার সময় থানার সামনে হাজির হ'ল এবং নির্বিবাদে থানা দখল করল।

সুতাহাটা থানা অধিকার সম্পূর্ণ অহিংসভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বিশ সহস্রাধিক নরনারী সেদিন এই থানা অধিকারে অংশগ্রহণ করেছিল। থানা দখল করতে গিয়ে বিপ্লবীরা সরকারের কোন লোকের গায়ে হাত তুলেনি। তাদের সযত্নে নিজ নিজ ঘরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। অথচ এই থানার পুলিশ ইতিমধ্যে সর্বসাধারণের উপর কতই না অত্যাচার ও উপদ্রব করেছে। বিপ্লবীরা সরকারী অর্থেও হাত দেয়নি। তবে তারা থানার ঘরবাড়ীগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল। কারণ বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব লোপ করে

দেওয়াই ছিল বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য। একথা সত্য যে, এই হাজার হাজার সংগ্রামীর স্রষ্টা কুমারচন্দ্রই। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাইশ বছর একমাত্র কুমারচন্দ্রের নেতৃত্বে সুতাহাটাবাসী একই মানসিকতায় স্বদেশী আন্দোলনের সর্বপ্রকার কর্মযজ্ঞে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ যেমন সমগ্র মেদিনীপুরবাসীকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন কুমারচন্দ্রও তেমনি সুতাহাটাবাসীকে একতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন। অহিংসভাবে সুতাহাটা থানা অধিকারে কুমার চন্দ্রের অদৃশ্য শক্তি কাজ করেছিল।

গঙ্গাধর জানা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত বল্লুক গ্রামে ১৯০৫ সালে জন্ম, পিতা দেবেন্দ্র জানা। গঙ্গাধর বাগবাজার মহারাজা কাশিমবাজার পলিটিক্যাল স্কুলের শিক্ষক G. W. Paterval সাহেবের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে প্রভাবিত হয়ে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য প্রচার করতেন। রসিকপুর গ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে ছয়মাস কারাবাস করেন। ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় আবার ছয়মাস কারাবাস করতে হয়। জেলে থাকাকালে পুলিশ এঁর বাড়ীর লোকজনের উপর দারুণ অত্যাচার করে এবং এঁর বাবা, দাদা ও জেঠাবাবুকে (স্পেশাল পুলিশ করে) তমলুক থানায় দৈনিক হাজিরা দিতে বাধ্য করা হয়। তাদের সারাদিন থানায় আটকে রাখা হত। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গোপন সংবাদ জানার জন্য পুলিশ মাঝে মাঝে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে মার-ধোর করত। একদিন তাঁকে নির্দয়ভাবে ৬০ ঘা বেত মারা হয়। পুলিশ অনেকবার এঁর বাড়ী তল্লাসী করেছে।

বরদাকান্ত সিংহ

১৯১২ সালে মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত কুলবেড়িয়া গ্রামে বরদাকান্তের জন্ম। পিতা নীলমণি সিংহ, বরদাকান্ত

লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পুলিশ নির্দয়ভাবে প্রহার করে, ৪ দিন পরে ঐ একই কাজ করতে গিয়ে আবার পুলিশের হাতে মার-ধোর খান। এরপর কোলাঘাটে আবগারি দোকানে পিকেটিং করলে পুলিশ ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে রোদে এক পায়ে কয়েক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখে। ম্যালেরিয়া জ্বরে অসুস্থ হলে তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে চিকিৎসা করানো হয়। ১৯৩২ সালে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সময় তমলুক কোর্টে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ছয়মাস কারাবাস করেন। পরে কলকাতা যাওয়ার সময় পুনরায় গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়। ঐ সময় ৫ মাস কারাবাস করতে হয়। কারামুক্তির পর নিমতোড়ি কংগ্রেস ক্যাম্পে যান। একদিন নিকাশী হাটে সবজি সংগ্রহ করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পুলিশ তমলুক থানায় নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করে অজ্ঞান করে দেয়। জ্ঞান ফিরলে পুলিশ ছেড়ে দেয়।

শরৎকুমারী সামন্ত

স্বামী—রজনীকান্ত, জন্ম—১৮৯৯, জেলা—মেদিনীপুর, থানা তমলুক, গ্রাম কাখরদা, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রায়ই এঁর বাড়ীতে আসতেন। তাঁর প্রভাবে ইনি লবণ সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বন্ধ ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে সহযোগী কর্মী হন। ১৯৩১ সালে পুলিশ এঁর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর আত্মগোপন করে কাটাতে হয়েছিল।

সন্তোষকুমার দাস

পিতা চৈতন্য, জন্ম ১৯২৩, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—তমলুক, গ্রাম শ্রীরামপুর। বাবা ও দাদার প্রভাবে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেন। বিদ্যুৎবাহিনীর একজন সেনানী। একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

হরিপদ মাইতি

পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র, জন্ম—১৯১০, জেলা—মেদিনীপুর, থানা তমলুক, গ্রাম—কালিকাপুর। ১৯৩০ সালে কানগোছিয়া মধ্য ইংরাজী

বিদ্যালয়ে পড়া ত্যাগ করে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। হিজলবেড়্যা কংগ্রেস ক্যাম্পের খরচ চালানোর জন্য ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ছয়মাস জেল খাটেন। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সময় চৌকিদারি ট্যাক্স আদায়কারী চেকবই ও খাতাপত্র ছাড়ানোর অপরাধে একমাস জেল খাটেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য ২৪পরগনার বাটানগরে আত্মগোপন করেন।

প্রবেশ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—ডিসেম্বর ১৯০৪, স্থান—উত্তরপাড়া, জেলা—হুগলী।

কারাজীবন—সর্বমোট ১২ বৎসর। কারাজীবনের প্রথম কয়েক বছর বার্মা জেলে ও পরবর্তী বছরগুলি আন্দামানে সেলুলার জেলে কাটে। সেলুলার জেলে থাকাকালীন বন্দীদের দ্বারা আহূত অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন। পরে ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন ১৯৩৭ সালে আন্দামান থেকে দেশে ফেরৎ আসেন।

১৯৩৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রবোধকুমার রায়

১৯০৩ সালে ঢাকা জেলার সোমভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে দশম শ্রেণী থেকে স্কুল ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন থেকে আদ্য পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই সময় কংগ্রেসের কাজ করার জন্য দেড়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে অভয় আশ্রমে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে ডঃ সুরেশ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে যে প্রথম দলটি কাঁথিতে লবণ আইন অমান্য করার জন্য যাত্রা করে সেই দলে সামিল হয়ে ৬ এপ্রিল পিছাবনিতে লবণ আইন অমান্য করেন। পরে কাঁথিতে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন পরিচালনার কাজে যোগ দেন, ১৯৩২-৩৪ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্দোলনের কোন সংবাদ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত না। সেই সময় খবর হাতে লিখে সাইক্লো-স্টাইল করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতেন গোপনে।

কানাইলাল মণ্ডল

পিতা—পঞ্চানন, জন্ম—১৯১৪ জেলা—মেদিনীপুর, থানা—সুতাহাটা, গ্রাম—চকলালপুর। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে, সুতাহাটা থানা দখল অভিযানে ও মহিষাদল রাজ কাছারী ধ্বংসের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। ঐ সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ৬ মাস হাজতবাস করেন।

কালিপদ আচার্য

পিতা—উমেশচন্দ্র, জন্ম—১৯১২, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—সুতাহাটা। গ্রাম—ডালিবচক। লবন আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ৭ মাস তমলুক হাজতে ছিলেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎবাহিনীর কর্মী ছিলেন। ১৯৪৪ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তমলুক হাজতে ৭ মাস ছিলেন।

গুনাকর জানা

পিতা -দেবেন্দ্র, জন্ম—১৯০৬, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—সুতাহাটা, গ্রাম—বাসুদেবপুর। মেদিনীপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কুমারচন্দ্র জানার দাদার ছেলে। কাকার প্রভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন। অনন্তপুরে জাতীয় বিদ্যালয়কে নানা-ভাবে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লবন সত্যাগ্রহ, ট্যাক্সবন্ধ ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন।

চারুশীলা জানা

স্বামী কুমারচন্দ্র, জন্ম—১৯০২, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—সুতাহাটা, গ্রাম—বাসুদেবপুর। স্বামী প্রখ্যাত নেতা কুমারচন্দ্র জানা অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলনে

নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরই সঙ্গীনীরূপে চারুশীলা দেবী লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। পরবর্তী সমস্ত আন্দোলনে স্বামীর সামিল হয়ে কাজ করেছেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে থানা দখলে অংশ নেন। এই সময় ও লবন সত্যাগ্রহে কারাবাস করেন। ভগিনী সেনার নেতৃত্ব দিতেন।

জ্যোতির্ময় মাইতি

পিতা—বিপিন, জন্ম—১৯০৯, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—সুতাহাটা, গ্রাম—রাজারামপুর। মায়ের কাছে শহীদ ক্ষুদিরামের গল্প এবং প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা শুনে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এঁদের বাড়ী স্বদেশপ্রেমী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন থেকে আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটিতে অংশ নিয়েছেন। থানা দখলে যোগ দেন। পুলিশ এঁর ঘর পুড়িয়ে দেয়। জাতীয় সরকারের বিচারক ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কর

পিতা—নীলমণি, জন্ম—১৯০৪, জেলা—মেদিনীপুর থানা—সুতাহাটা, গ্রাম—শ্রীকৃষ্ণপুর। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। এঁর স্ত্রীসহ পরিবারের প্রায় সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন ভাবে কাজ করেছেন। দাদা বিপিন বিহারী, কংগ্রেস নেতা কুমারচন্দ্র জানা ও স্বদেশী যাত্রা থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রেরণা পান। লবণ সত্যাগ্রহে বাবুপুর কেন্দ্রে পুলিশ এঁকে অন্যান্যদের সঙ্গে নির্মমভাবে প্রহার করায় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। ফলে গ্রামবাসীরা মিলিটারী দ্বারা অত্যাচারিত হন। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ পতাকা সেলাম না করায় ক্ষুদিরাম ডাকুয়া, বিল্বপদ জানা সহ ইনি পুলিশের মারে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে ছয় মাস জেল হয়। ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে পুলিশের প্রহারে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। বাসুদেবপুরের কংগ্রেস শিবিরের গান্ধী আশ্রম নামকরণের পর ইনি তার পরিচালনার দায়িত্ব নেন। "ভারত-ছাড়" আন্দোলনে থানা ও অন্যান্য সরকারী

অফিস দখল ও পোড়ানোর কাজে অংশ নিয়েছিলেন। জাতীয় সরকারের বিশিষ্ট কর্মী ও থানার শেষ অধিনায়ক ছিলেন। মহাত্মাজীর নির্দেশে আত্মপ্রকাশ করার পর আড়াই বৎসর জেল ও দুহাজার টাকা জরিমানা হয়। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অনন্তলাল সিংহ

জন্ম : চট্টগ্রামের নন্দনকাননে ১৯০২ সালে।

১৯১৮ সালে মাস্টারদার দলে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনন্ত সিং।

কলকাতায় লর্ড সিন্‌হা রোডে গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারের কাছে নিজে স্বেচ্ছায় ধরা দেন।

১৯৩৭ সালে সেলুলার জেলে বন্দীদের ডাকা দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৭ দিনের অনশনে যোগদান করেন।

১৯৩৮ সালে সেলুলার জেল থেকে ফিরে আসেন, এবং ১৯৩৯ সালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ৩৬ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন।

১৯৪৬ সালের ৩১শে আগস্ট জেল থেকে পুরোপুরি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৭৯ সালে লোকান্তরিত হন।

বিরাজ দেব

১৯১৫ সালের মে মাসে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার কালিকাটচা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র দেব।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং এ বছরই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

মুক্তি পাওয়ার পর কুমিল্লার "শ্রীসংঘ" দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৩২এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৩এর মার্চ অবধি আত্মগোপন করে থাকেন। কিন্তু ১৯৩৩এর ১৩ই মার্চ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। কালিকাটচাতে গুলি চালনা এবং আসামের সিলেটে ইটাখোলা ডাকঘর লুণ্ঠন এই দুই অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

মোট ১৪ বছর কারাজীবনের বেশ কিছুকাল আন্দামানের

সেলুলার জেলে ছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে সেলুলার জেলে ৩৭ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। পরে ১৯৩৯ সালে আলিপুরে সেণ্ট্রাল জেলে ৩৬ দিনের অনশন ধর্মঘটেও যোগ দেন।

১৯৪৬ সালে জেল থেকে পুরোপুরি ছাড়া পান।

প্রবোধকুমার রায়

বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার পুটিয়ানাতে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্ম।

পিতা—স্বর্গীয় রসিকরঞ্জন রায়।

মেধাবী ছাত্র প্রবোধকুমার পাঁচটি বিষয়ে লেটার মার্ক নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনা করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময়েই ১৯৩০ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে ঢাকার সদরঘাটে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে বহিষ্কৃত হন এবং আত্মগোপনে বাধ্য হন।

অবশেষে ১৯৩০এর ৩১শে অক্টোবর শালদাতে বিপ্লবী কাজ কর্মের সময় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

৭ বছরের কারাদণ্ডের মেয়াদের অনেকটাই কাটে সেলুলার জেলে। ১৯৩৩এর ৪৫ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগেদান করেন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার

১৯১৫ সালের ৫ই আগস্ট বর্ধমান জেলার রায়নার কুমারগরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র কোঙার।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্র থাকাকালীন ১৯৩২ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর অস্ত্রশস্ত্র রাখার অভিযোগে বর্ধমানের মেমারীতে গ্রেপ্তার হন এবং ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন এবং ১৯৩৩ সালে সেলুলার জেলের বন্দীদের দ্বারা সংগঠিত প্রথম পর্যায়ের ৪৭ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন।

১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফলতঃ ১৯৪২ সালে আবার কারাবাস। দুই পর্যায়ে মোট কারাবাসের মেয়াদ ৮ বৎসর।

১৯৭৪এর ২৫শে জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রমথনাথ মাইতি

পিতা—মহেন্দ্রনাথ, জন্ম ১৮৯২, জেলা—মেদিনীপুর, থানা সুতাহাটা, গ্রাম আকুবপুর। দেশবন্ধু ও দেশপ্রাণ এর প্রভাবে বি. এ. পড়া বন্ধ করে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। সুতাহাটা থানার অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। শিক্ষকতা করার সময় বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে জনমত গঠন করতেন। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে তিন মাস কারাবাস করেন। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় এঁর বাড়ীর সবরকম আসবাব সরকার নিলামে বিক্রয় করে দেয়।

প্রফুল্লকুমার দোলই

পিতা—ইন্দ্রনারায়ণ, জন্ম—১৯১৫, জেলা মেদিনীপুর, থানা সুতাহাটা, গ্রাম বরদা। লবণ কেন্দ্রে পুলিশের অত্যাচার দেখে প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। হাওড়ায় শিক্ষকতা করার সময় শিবনাথ ব্যানার্জীর সংস্পর্শে এসে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ সময় থেকে কংগ্রেসের সর্বপ্রকারের কার্যে অংশ নিতেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে থানা দখলের পূর্ব প্রস্তুতিরূপে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ও অন্যান্য সরকারী অফিস দখল ও ধ্বংসের কাজে অংশ নেন। জাতীয় সরকারের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। এই সময় কার্যরত অবস্থায় ধরা পড়েন ও ১০ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

বিধুভূষণ কুইতি

পিতা—বৈকুণ্ঠ, জন্ম—১৯০৫, জেলা—মেদিনীপর, থানা সুতাহাটা, গ্রাম—বড় বাসুদেবপুর। কুমারচন্দ্র জানা ও সূর্যকান্ত চক্রবর্তীর বিলাতি দ্রব্য বর্জনের বক্তৃতায় প্রভাবিত হন। লবণ সত্যাগ্রহ ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সময় দুবারই কারাবরণ করেন। জেলে বিপ্লবীদের

চাঞ্চল্যকর কাহিনীই এঁকে বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ধান পাচার বন্ধের দায়িত্বে ইনি ছিলেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে থানা দখলের মিছিলের পরিচালনা, থানা ও অন্যান্য সরকারী অফিস দখল এবং মহিষাদল রাজকাছারী বাড়ী পোড়ানোর কাজে নেতৃত্ব দেন। পুলিশ এঁর বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। জাতীয় সরকারের গরম দলের থানার প্রধান হিসাবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকজনদের শাস্তি দেওয়া, সরকারের জন্য অর্থ সংগ্রহ, বন্যাগ্রস্ত লোকদের জন্য ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে খাদ্য লুঠ করে আনতেন। ইংরেজদের গোয়েন্দা ও ডাকাত খুন করার কাজের নেতৃত্বে ছিলেন। গান্ধীজীর নির্দেশে ১৯৪৪ সালে আত্মপ্রকাশ করেন। ২১টি কেসের আসামী ছিলেন। প্রমাণাভাবে শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যান। দীর্ঘদিন হাজতবাস করেন।

অধরচন্দ্র করণ

পিতা- ভীমচরণ, জন্ম—১৯১৭, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—কাঁকুড়দা। লবণ সত্যাগ্রহ ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। মহিষাদল থানা অভিযানে যোগ দেন। সে সময় এঁর দাদা গোবিন্দ করণ তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

অনিলকুমার মাইতি

পিতা—পূর্ণচন্দ্র, জন্ম—১৯২৭, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—কাঁকুড়দা। বাবা কাঁকুড়দা জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক হওয়ায় ৮ মাস জেল খাটতে হয়। বাবার অনুপ্রেরনায় 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। মহিষাদল থানা দখল অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে ও পরে এতে যোগ দিয়েছিলেন।

অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১৯০৮, কৃষ্ণনগর—নদীয়া, পিতা—স্বর্গীয় পঞ্চানন মুখার্জি। ১৯২১ সালে ব্রিটিশ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে যুগান্তর দল তথা বিপিন গাঙ্গুলীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৩৪-এর ১০ই অক্টোবর ভারতীয় অস্ত্র আইনে কৃষ্ণনগরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

পাঁচ বছরের কারাবাসের মেয়াদের অনেকটাই কাটে আন্দামান সেল্‌লার জেলে। ১৯৩৭-এ সেল্‌লার জেলে অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে কারামুক্তির পর আবার ১৯৪০-এ গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন।

প্রভাকর বিরুনী

১৮৯৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার মালিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা—স্বর্গীয় শশীভূষণ বিরুনী। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কারাবরণ করেন।

এরপর অনুশীলন সমিতির সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৩৪-এর ২৮শে আগস্ট ভারতীয় অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার হন।

পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদকালে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯৩৭ সালে সেলুলার জেলের বন্দীদের ডাকা অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন।

১৯৩৯ সালে কারাজীবনের অবসান।

প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থানার অন্তর্গত মালহালি গ্রামে ১৯১৩ সালে জন্ম।

পিতা—স্বর্গীয় সুরেশ রায়চৌধুরী। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪-এর ২রা জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন। চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হয়। জেলে থাকাকালীন এক জেল ওয়ার্ডারকে তার জঘন্য ব্যবহারের জন্য মারধর করায় কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ সালে আন্দামানে সেলুলার জেলে দ্বীপান্তর। ১৯৩৭ সালের অনশনে যোগদান করেন।

ইনি একজন সুলেখকও ছিলেন।

জ্যোতির্ময় রায়

জন্ম—১৯১১, নাগরী-বীরভূম। পিতা—স্বর্গীয় শশধর রায়।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর "হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব-

লিকান আর্মি" দলের সান্নিধ্যে আসেন। এছাড়া সেণ্ট্রাল এ্যাসেম্বলি বোম কেসে অভিযুক্ত বটুকেশ্বর দত্তর সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতির স্থানীয় শাখার সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এবং ডিনামাইট রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। বিচারে ৭ বৎসরের জেল হয়।

জেলজীবনের বেশ কিছুটা কাটে আন্দামানের সেলুলার জেলে। ১৯৩৭-এর অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন। অবশেষে ১৯৩৯-এ কারামুক্তি।

শ্রীপতিচরণ বয়াল

১৯০২ সালে তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানায় এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে শ্রীপতিচরণ বয়ালের জন্ম। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সৎ, মেধাবী ও নৈতিক গুণের অধিকারী ছিলেন। আর্থিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। মহিষাদল রাজ হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি বিপ্লবী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজী ১৯১১—১৯১৯ মহিষাদলে অন্তরীণ ছিলেন। শ্রীপতিচরণ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে I Sc পাশ করার পর ১৯২০ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের অঙ্গরূপে মহিষাদল থানার কাঁকুড়দা গ্রামে গুণধর হাজরার নেতৃত্বে জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন বিদ্যালয়-গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হত তার নিন্দা করে গান্ধীজী বলেছিলেন ঐ বিদ্যালয়গুলি হল 'গোলামখানা'। তাই জাতীয়বিদ্যালয়ের প্রবর্তন। কাঁকুড়দার এই বিদ্যালয় ১৯২১—২৬ এই ছয় বছর চলেছিল। এই বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও তাঁত, চরকা, কালি তৈরী, সাবান তৈরী প্রভৃতি কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হত।

১৯২১ সালে মহিষাদল বাজারে একটি বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে শ্রীপতিচরণ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন।

ইহাই তমলুক মহকুমায় প্রথম গ্রেপ্তার। তাঁকে তমলুক জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে পাঁচদিন থাকার পর তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর তাঁকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি পদব্রজে শোভাযাত্রা সহকারে তমলুক থেকে পথে একটির পর একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান পূর্বক মহিষাদলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২১ সালে তিনি দ্বিতীয়বারে গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁর ছয় মাস কারাদন্ড হয় এবং তিনি পুরো সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ঐ দণ্ড ভোগ করেন। এই ছয় মাসের মধ্যে জেলের ভিতর এক আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে কুমারচন্দ্র জানা, ভবতোষ দাস এবং শ্রীপতিচরণকে পৃথক পৃথক নির্জন সেলে প্রায় দু মাসের জন্য রাখা হয়েছিল।

শ্রীপতিচরণ ১৯৩০ সালে ট্যাক্স বয়কট ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি হয়, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে আত্মগোপন পূর্বক মহকুমা সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে নির্দেশ দিলে তিনি তা পালন করেন।

তিনি তমলুক মহকুমার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে কল্যাণচক্ গৌরমোহন ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক। তাঁর প্রেরণায় উক্ত বিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করে এবং সাহস বীরত্ব ও দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। এই মহকুমার অন্য কোনও বিদ্যালয় থেকে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেনি। ২৯.৪.৪২ তারিখে থানা আক্রমণ কালে পুলিশের গুলিচালনার ফলে এই বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ও বহু সংখ্যক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। শ্রীপতিচরণ প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে বরখাস্ত হন এবং পুলিশ তাঁর বাসগৃহের দখল নেয়। ১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতার লেক ভিউ হাইস্কুল হতে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু প্রমাণ অভাবে থানা পোড়ান মামলা হতে মুক্তি পান।

অম্বুধ্বজ কুইল্যা।

পিতা—হেরম্ব, জন্ম—১৯০১, জেলা—মেদিনীপুর থানা—

মহিষাদল. গ্রাম—কালিকাকুন্ড। মহিষাদলে প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ও কুমারচন্দ্র জানা মহাশয়দের ভাষণে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বিলাতি দ্রব্য বর্জনের শপথ নিয়ে ঐ সভাতেই নিজ গায়ের বিলাতী দ্রব্য পুড়িয়ে দেন। ইনি নিজ গ্রামের লবণ মারা কেন্দ্রে এবং নরঘাট লবণ মারা কেন্দ্রে লবণ আইন অমান্য করেন। লালবাজারে পিকেটিং করে ইউরোপীয়ান পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। দুই সপ্তাহ জেলে থাকার পর ছাড়া পান। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় পুলিশ এঁদের পাড়ায় কেরোসিন ছিটিয়ে সমস্ত বাড়ী ছারখার করে দেয়।

অমিয়লতা বয়াল (সিংহ)

স্বামী—প্রভাত, জন্ম—১৯১৪, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—কাঁকুড়দা। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে মহিষাদল থানা দখল অভিযানে বহু মহিলা সংগ্রহ করে একটি নারী বাহিনী গঠন করে নিয়ে যান।

আশুতোষ রাউত

পিতা—জীবন, জন্ম—১৯৩৭, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—কুমারপুর। আগস্ট আন্দোলনের সময় পাঁচ বছরের শিশু। পিতা জীবনচন্দ্র ও মাতা চারুবালা 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক। পুলিশের হাতে তারা নিগৃহীত হন। একদিন পুলিশ বাহিনী এঁদের বাড়ী ঘেরাও করে কিন্তু বাবা জীবনচন্দ্রের সন্ধান না পেয়ে চারুবালার কাছে তার সন্ধান করার জন্য পুলিশ বার বার প্রশ্ন করে। চারুবালা নীরব থাকায় আশুতোষকে আগুনে ফেলে দেয়। আগুন থেকে ছেলেকে যখন তোলা হয় তখন সে জ্ঞান হারা, ডান হাতের কব্জী ও বাম পায়ের উরু পুড়ে গিয়েছে। বেশ কয়েক মাস চিকিৎসা করে ভাল হল বটে কিন্তু দাগ রয়ে গেল, ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের চিহ্ন হিসাবে।

আব্দুল গণি

পিতা—ইসমাইল, জন্ম—১৯১১, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—কাঞ্চনপুর। দানিপুর চাল পাচারের বিরুদ্ধে

আন্দোলনে যোগ দেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের কর্মী হিসাবে চিঠিপত্র ও বুলেটিন বিভিন্ন ক্যাম্পে পৌঁছাতেন। সরকারী অফিস দখল অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে সহকর্মীদের সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কেটেছিলেন। মহিষাদল থানা অভিযানে একটি মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইন্দুমতী চ্যাটার্জী

স্বামী—বিভূতি, জন্ম—১৯১৪, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—সুন্দরা। সুন্দরা লবণ তৈরী কেন্দ্রে লবণ সত্যাগ্রহ করেন। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের দ্বারা কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারে ব্রতী ছিলেন। চরকা চালনা ও সুতা কাটা শেখাতেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কংগ্রেস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নানাভাবে সেবা করে উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের জায়গায় কংগ্রেস অফিস ও বিদ্যুৎ-বাহিনীর ক্যাম্প থাকায় সরকারী আক্রোশে এঁরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হন। পুলিশ এঁদের বাড়ী কয়েকবার লুঠ করেছে। ইনি পুলিশের হাতে নির্যাতিত হন। এঁর স্বামী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে ১৮ মাস কারাবরণ করেন।

কমলাকান্ত মণ্ডল

পিতা—কেদার, জন্ম—১৯২৫, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—সরবেড়্যা। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, বিদ্যুৎবাহিনীর একজন সৈনিক। আত্মগোপন করে গোয়েন্দার শাস্তি-দানের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। পুলিশের হাতে বহুভাবে নিগৃহীত হন এবং ১৯৪৩ সালে ধরা পড়ে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—১৯১৫, ১৬ই জুলাই, আসানসোল, বর্ধমান, পিতা—স্বর্গীয় অমৃতলাল ব্যানার্জি, শিক্ষা—ম্যাট্রিকুলেট। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর অধীনে যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। বীরভূম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩৪-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হন এবং ৫ বৎসরের জন্য কারাবাসের সাজা হয়।

আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৭ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন।

১৯৩৮-এ দেশে ফেরৎ এলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দু'বৎসর বন্দী জীবন যাপন করতে হয়।

ভূপাল পাণ্ডা

জন্ম—নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর। অস্ত্র আইনে আটক এবং ৫ বৎসরের কারাবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত। আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন দ্বিতীর পর্যায়ের অনশন ধর্মঘটে যোগদান। ১৯৩৭-এ দেশে ফেরৎ। ১৯৩৮-এ কারামুক্তি।

অনন্ত চক্রবর্তী

জন্ম—৬ই এপ্রিল, ১৯০১, জন্মস্থান—রুকাদিয়া—বরিশাল, পিতা—স্বর্গীয় চন্দ্রমণি চক্রবর্তী।

মাত্র ১৪ বছর বয়সেই যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যতীন দাসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

ষড়যন্ত্র ও বোম কেসের অভিযোগে ১৯২৫ সালে গ্রেপ্তার হন। এবং সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে ভূপেন চ্যাটার্জিকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হয়।

প্রথমে বার্মা জেল পরে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেলুলার জেলে থাকাকালীন ১৯৩৩ ও ১৯৩৭ সালের দুটি অনশন ধর্মঘটেই যোগদান করেন।

১৯৩৮ সালে দেশে ফেরৎ আসেন এবং মুক্তি পান। সর্বমোট কারাবাসের মেয়াদ ১৩ বৎসরেরও অধিক।

পণ্ডিত রামরক্ষা

পাঞ্জাবে হোসিয়ারপুরে ১৯০৯ সালে জন্ম।

মণ্ডলয় বার্মা) ষড়যন্ত্র কেসে মুখ্য আসামী হিসাবে অভিযুক্ত। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তির মেয়াদের অনেকটাই কাটে আন্দামানের সেলুলার জেলে।

জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁকে তাঁর উপবিত্তটি পরতে না দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি অনশন করেন এবং অনশনরত অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফুল্লকুমার কুইল্যা।

১৯২০ সালে মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার মধ্যহিংলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অন্নদাচরণ কুইল্যা। ইনি কৃষি-নির্ভর সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীর ছেলে। কল্যাণচক্ স্কুলে দশম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় স্কুলত্যাগ করে ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেন। স্কুলের প্রভাব ও তৎকালীন সভা-সমিতিতে নেতাদের বক্তৃতা শুনে আন্দোলনে যোগদানের প্রেরণা লাভ করেন। 'বিদ্যুৎ বাহিনীর' সাহসী সৈনিক ছিলেন।

থানা দখলেও অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। পরে জাতীয় সরকারের কর্মী ও গরম দলের সদস্য হিসাবে সুপরিচিত। ইনি আন্দোলন চলাকালে একটি শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন। ছদ্মনাম ছিল 'অমল'। আত্মগোপন করে বিচার বিভাগের ও 'গরম দলের' কাজ করতেন। পুলিশের হাতে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

পরবর্তীকালে ঝাড়গ্রামে বেসিক ট্রেনিং নিয়ে মহিষাদলের শিশু সদনে বহুদিন শিক্ষকতা করেছেন।

বঙ্গভূষণ ভক্ত

জন্ম—১৩২৭ সালের ২০শে কার্তিক নন্দীগ্রাম থানার পাটনা গ্রামে। পড়াশুনা চলতে চলতে ১৯৩০—১৯৩২-এ Three Miles Limitation Ordinance বলে দু বছর এবং ১৯৪২—১৯৪৫ সালে আগস্ট সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় তিন বছর পড়াশুনা সম্পূর্ণ বন্ধ থেকেছে। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ' অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। আগস্ট বিপ্লবে কলেজ ছেড়ে অংশ নেন। আগস্ট বিপ্লবের জন্য ফেরারী নোটিশ ও পুরস্কার ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে থেকেছেন এবং আবার পড়াশুনা করেছেন। পড়াশুনার পাট শেষ করে প্রথম চাকুরি শুরু করেন অধ্যাপক হিসাবে মহিষাদল

রাজ-কলেজে, পরে সরকারী চাকুরিতে চলে যান। অবসর জীবনে ইতিহাসের কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বহু পরিশ্রমের ফসল হিসাবে তুলে ধরেছেন 'নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইতিহাসখানি।

বসাংগী পণ্ডু পাডল

১৮৯০ সালে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্নমে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯২২-২৪-এর রুমপা কৃষকযুদ্ধের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক।

এই কৃষক-যুদ্ধের নেতা আলুরী সীতারামা রাজুর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরই আহ্বানে এই যুদ্ধে ঝাঁপ দেন।

সরকার তাঁর মাথার জন্য বিশাল অংকের অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

ব্রিটিশ মিলিটারীর সাথে এক লড়াইতে সীতারামা রাজু নিহত হওয়ার পর পাডল ধরা পড়ে যান।

বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।

জেল থেকে মুক্তির পর আন্দামানেই বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালে লোকান্তরিত হন।

হৃদয়রঞ্জন দাস

পিতা—স্বর্গীয় নিত্যানন্দ দাস।

১৯২৮ সালে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এবং চট্টগ্রাম জেলে কারারুদ্ধ হন।

জেলে থাকাকালীন ডিনামাইট দিয়ে জেলের দেওয়াল উড়িয়ে দেওয়ার এক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁরই এক সঙ্গী ডিনামাইট সহ ধরা পড়ায় সব পরিকল্পনা বাণ্চাল হয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্রে হৃদয়রঞ্জন দাসকেও অভিযুক্ত করা হয় এবং ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। এই পর্যায়ে তাঁকে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। ১৯৩৭ সালে জেল থেকে মুক্তি পান।

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী

অধুনা বাংলাদেশের ঢাকাতে ১৮৯৪ সালে জন্ম। পিতা—স্বর্গীয় জগদীশ পাকড়াশী।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং অনুশীলন সমিতি (ঢাকা শাখার) সংস্পর্শে আসেন।

১৯১১ সালে ভারতীয় অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার হন এবং এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

মুক্তি পাওয়ার পর আত্মগোপন করেন এবং ১৯১৮ পর্যন্ত কলকাতায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যার চেষ্টা সহ আরও বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন।

১৯১৮ সালে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন

১৯২১ সালে মুক্তি পান।

১৯২৩ পুনরায় গ্রেপ্তার এবং ৫ বৎসরের কারাবাস।

তৃতীয়বার ১৯২৮ সালে মুক্তি পাওয়ার পর চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং কলকাতা—একযোগে এই তিন জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। এই সময়েই ১৯২৯এর ডিসেম্বরে ১৯ তারিখে মেছুয়াবাজারে আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এই পর্যায়ের কারাবাসের মেয়াদ ৭ বৎসর এবং এই পর্যায়েই আন্দামানে সেলুলার জেলে প্রেরিত হন।

সেলুলার জেলে থাকাকালীন অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। ১৯৩৭এ দেশে ফেরৎ আসেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২এ মুক্তি।

সর্বমোট কারাবাসের মেয়াদ ২১ বৎসরের অধিক।

- - - - - -

বিপ্লবী দিকটি ছাড়া তাঁর অন্য একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর লেখা বই 'অগ্নিযুগ' 'অগ্নিযুগের কথা' পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত।

কানাইলাল দাস

পিতা—হরিপদ। জন্ম—১৯০৯। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—

নন্দীগ্রাম, গ্রাম গঞ্জ আমেদাবাদ। লবণ সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ১৯৪০এ কুঞ্জবিহারী ভক্ত প্রভৃতি নেতাদের নির্দেশে সুতাহাটায় মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করেন। আগস্ট আন্দোলনে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা, থানা দখল প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় সরকারের কর্মী ছিলেন। ৬ মাস কারাভোগ করেন।

কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠি

পিতা - সুরেন্দ্র। জন্ম—১৯১০। জেলা মেদিনীপুর, থানা—নন্দীগ্রাম, গ্রাম—কূলাপাড়া। স্থানীয় নেতাদের বক্তৃতায় ও মুকুন্দ দাসের যাত্রায় প্রভাবিত হন। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করায় বাড়ীতে পুলিশের অত্যাচার শুরু হয়। ফলে তিনি সুন্দরবনে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। আগস্ট আন্দোলনে ভগবানপুর থানা দখলে অংশ নিয়েছিলেন।

অন্নদাচরণ মাইতি

পিতা—ধরণীধর, জন্ম—১৯১১, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—কৃপানন্দপুর। লবণ সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বন্ধ ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সময় পুলিশ তাঁর দোকান পুড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ বর্তমান মূল্যে প্রায় ৩০,০০০ টাকা।

অধীরচন্দ্র শাসমল

পিতা—ভাগবৎ। জন্ম—১৯০৮। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—কিয়াবানা। পিতার প্রভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। ঐ সময়ে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হন এবং ধৃত হন ও ছয়মাস জেল হয়।

কুশধ্বজ মাজী

পিতা—আনন্দ, জন্ম—১৯১৩, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—কিয়ারানা। দাদা উপেন্দ্রনাথ মাজীর প্রভাবে কংগ্রেসে

যোগ দেন। লবণ সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বন্ধ ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ দাস

পিতা—গোবিন্দ, জন্ম—১৯১০, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—মাসমচক্। লবণ সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বন্ধ ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করায় সরকারী নির্যাতন ও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

বাসুদেব মণ্ডল

পিতা—গোবিন্দ, জন্ম—১৯১৭, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—দক্ষিণ হরকালী। ১৯৪২এর আন্দোলনে যোগ দেন। ১ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

রাখালচন্দ্র মাইতি

পিতা—কেশব, জন্ম—১৯০৬, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম পূর্ব দক্ষিণ ময়না। লবন সত্যাগ্রহ ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দেন। একটি সভায় পুলিসের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশ দিয়ে পুলিশকে পিটিয়ে ছিলেন। এক বৎসর কারাবাস, পুলিশী নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছে।

কার্তিকচন্দ্র মাজী

পিতা—শ্রীপতিচরণ, জন্ম—১৯২৩, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—চংরা। পিতা ও গোপালচন্দ্র ভৌমিকের প্রভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। ৭।৮ বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে লবণ কেন্দ্রে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকাকালে উক্ত গোপালবাবুর ভাইঝি প্রফুল্ল বালাকে পুলিশ ভীষণভাবে প্রহার করে; ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে এঁর বাবার মাল ক্রোক হয়। এই দুটি ঘটনা এঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজীর অনশনের সমর্থনে ইনিও অনশন করেন। আগস্ট আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে

ঝাঁপিয়ে পড়েন। সভাতে ও মিছিলে যোগদান করার ফলে ১লা সেপ্টেম্বর ('৪২) ধৃত হন এবং ৯ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্ত হওয়ার পর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সৈনিক হিসাবে বিদ্যুৎ বাহিনীতে যোগদান করেন এবং তমলুক শাখায় কাজ করতে থাকেন। এই সময় বেশ কিছুদিন এঁকে আত্মগোপন করতে হয়। পরে গান্ধীজীর নির্দেশমত ৯ই আগস্ট ('৪৪) আত্মপ্রকাশ করেন এবং ৭ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। সেই থেকে রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন।

গোপালচন্দ্র ভৌমিক

পিতা—তারাচাঁদ, মৃত্যু—১৯৪৮, জেলা—মেদিনীপুর, থানা—ময়না, গ্রাম—চংরা। গান্ধীবুড়ো নামে পরিচিত এই সংগ্রামী মানুষটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। আজীবন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন এবং গান্ধীজীর আদর্শে প্রভাবান্বিত। ১৯২১ সাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের জন্য এঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়।

১৯২১ সালে কিছুদিন, ১৯৩০ সালে ৬ মাস, ১৯৩২ সালে কয়েকবার (বৃটিশ পতাকাকে সেলাম না করায়) ১৯৪২ সালে প্রথমে ৬ মাস কারাদণ্ড এবং পরে আটকবন্দী হন। বিদেশী দ্রব্য চিনি, নুন প্রভৃতি পরিবারের জন্য ব্যবহার করতেন না এবং স্বীয় সন্তানদেরকে ও বিদেশী শিক্ষা থেকে দূরে রাখেন। খুব ভাল সংগঠক ছিলেন এবং সমগ্র ইউনিয়ন এলাকায় বহু কর্মী তৈরী করেছিলেন।

গোবিন্দলাল বক্সী

পিতা—ঈশ্বর। জন্ম—১৮৯৪। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম—গুড়চাকলী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করতেন। ১৯২৮ সালে 'বিশ্বজিত' নামে একটি দেশাত্মবোধক নাটক লেখেন।

বইটি প্রকাশিত হলে সরকার সেটিকে বাজেয়াপ্ত করেন। এর সর্বশেষ একটি খণ্ড তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটিকে তাঁর সন্তানগণ অর্পণ করেছেন। ইনি লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। গান্ধীজী প্রবর্তিত গঠনমূলক কাজ করতেন। কৃষ্ণগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং পরে জ্যোৎঘনশ্যাম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। আগস্ট সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান আদর্শ দেশসেবক ছিলেন।

হাজরা সিং

পাঞ্জাব হোসিয়ারপুর জেলার ভাহুরী গ্রামে জন্ম। পিতা—স্বর্গীয় রাজা সিং।

১৯৩১ সালে প্রথম গ্রেপ্তার হন এবং লাহোর কোর্টে আটক থাকেন। কিন্তু সকলের চোখে ধূলো দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং আবার বিপ্লবাত্মক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন।

অবশেষে তামিলনাড়ুর উটকামণ্ডে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। অভিযোগ—উটিতে ব্যাংক লুণ্ঠন।

সাজা হল—দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আন্দামানে চালান।

মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৩৮-৩৯ এ জামসেদপুরে শ্রমিকদের সাথে শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত হন। এই সময়েই একদিন আন্দোলনরত অবস্থাতেই মালিকপক্ষের ভাড়া করা লরি তাঁকে ধাক্কা মারে এবং চাকার তলায় পিষ্ট করে প্রাণনাশ করে।

বিশ্বনাথ মাথুর

জন্ম—১৯১৪ সালে। বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার বৈকুণ্ঠপুরে।

Hindustan Socialist Republican Army এর সদস্য ছিলেন।

১৯৩০ সালে গয়াতে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন। অল্প কয়েকদিনের পরে মুক্তি পেলেও নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে ১৯৩২ সালে আবার গ্রেপ্তার হন।

এবার কারাদণ্ডের মেয়াদ সাড়ে সাত বৎসর। তৎসহ আন্দামানে নির্বাসন।

সেলুলার জেলে থাকাকালীন অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন।

১৯৩৭ সালে দেশে ফেরৎ এলেও ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ ভারত রক্ষা আইনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন।

সর্বমোট কারাজীবন ১২ বৎসর।

আব্দুল কাদের চৌধুরী

জন্ম—বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলান্তর্গত কান্তাহার থানার সামসিবা গ্রামে ১৯০১ সালে।

পিতা – স্বর্গীয় লতিফ চৌধুরী।

পেশায় ইনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে ইনি চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯২১ এর আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

এরপর ১৯৩০-৩১ এর আন্দোলনে যোগদান করায় পুনরায় গ্রেপ্তার হন। এই সময়েই তাঁর কাছ থেকে মাত্র ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁর ডাক্তারখানা বাজেয়াপ্ত করে।

পরবর্তী সময়ে ইনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং হিলি রেলওয়ে স্টেশনে হামলার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সাজা—যাবজ্জীন দ্বীপান্তর।

সেলুলার জেলে থাকাকালীন ১৯৩৭ এ বন্দীদের দ্বারা সংগঠিত অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন।

১৯৩৮ এ দেশে ফেরার পর ১৯৩৯ এ মুক্তি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বগুড়া জেলার সাধারণ মানুষের উন্নতি বিধানের কাজে নিজেকে সঁপে দেন।

সর্বমোট কারাবাস ৭ বৎসরের অধিক।

ইন্দুমতি ভট্টাচার্য

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার জোড়াপুকুর গ্রামের এক সম্পন্ন পরিবারের পুর-মহিলা ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন ডাক্তার এবং তাঁর বাড়ীতে কঠোর পর্দা চলতো। যখন তাঁরা তমলুক সহরে

বাস করতেন তখন নিজেদের পাড়া থেকে অন্য পাড়াতে আত্মীয় বাড়ী যেতেও তাঁরা পর্দা ঢাকা গোরুর গাড়ী ব্যবহার করতেন। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পরে তাঁদের সে পর্দা লোপ পেল, এবং তাঁরা সাধারণ পোষাকে বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে কংগ্রেসের বানী প্রচার করতেন। ১৯৩২ সালে প্রথমবার যখন তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তখন কারাগারে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার লোকের ছোঁয়াছুয়ির মধ্যে খাওয়া দাওয়া করা তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তিনি অতি কষ্টে সামান্য কিছু খেয়ে দিন কাটাতেন। তারপর মহকুমার একজন কংগ্রেস নেত্রী হয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে থাকেন এবং সভাদিতে যোগ দেন। ফলে তাঁর মন এক নূতন চিন্তাতে উৎসাহিত হল। একত্র থাকা, মেলামেশা এবং একত্র খাওয়া দাওয়ার ফলে পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের জঞ্জাল অপসারিত হতে লাগল এবং জাতি ভেদের প্রাচীর ভেঙে পড়তে লাগল। তাঁর দ্বিতীয়বার কারাবাসের সময় তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে বিনা দ্বিধায় কারাগারের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করতেন। দুবার কারাদণ্ড ভোগের পর তিনি বহু বৎসর বাইরে থেকে কংগ্রেসের কার্য করেছেন। তখন তাঁর মন পরিষ্কার ও হৃদয় একটি সমদৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত। গান্ধীজী সমগ্র জাতির মধ্যে সমতার যে ভাব প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন ইন্দুমতী দেবীর জীবনে তা অত্যন্ত গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর সন্তানগণ দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সময় এই উদার ভাবের স্পর্শে মহৎ হয়ে উঠেছিলেন।

গান্ধীজী ১৯৩২ সালে যারবেদা জেলে 'হরিজন অনশন' করেছিলেন, তার ফলে সমগ্র ভারতে এক বিপুল সাড়া জাগ্রত হয়েছিল। ইন্দুমতী দেবী তাঁর জোড়াপুকুর বাড়ীতে গৃহকর্ত্রীরূপে বহু কংগ্রেস কর্মীকে যে আশ্রয় ও স্নেহ দান করতেন তার ফল ছিল সুদূর প্রসারী।

১৯৩২ সালে পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হলে পাঁশকুড়া থানাতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছু পরিচয় দেওয়া হল। ১৯৩০—৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন থেকে গান্ধী আরউইন চুক্তিকাল পর্যন্ত থানাতে লবন আইন ভঙ্গ এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের কাজে থানাবাসী পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কংগ্রেসের আদেশে ১৯৩০ সালে জুন মাস থেকে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের

কার্যধারার উপর জোর দেওয়ার সময় এই থানাতে আইন অমান্য করে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়া এবং সেজন্যে পুলিশের অত্যাচার বরণ প্রভৃতি ভাল ভাবেই পরিচালিত হয়েছিল। সেজন্যে ১৯৩২ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির পর ১৯৩২-৩৩ সালে যে আইন অমান্য, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ ইত্যাদি আন্দোলন চলে তাতে থানার জনগণ অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দিয়ে ছিলেন। এই থানার অধিবাসী কংগ্রেস নেতা রজনীকান্ত প্রামানিক মহকুমা কংগ্রেসের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্মী সতীশ চন্দ্র সামন্ত ও ভবতোষ দাস প্রভৃতি এই থানাতে বহুদিন কর্মরত ছিলেন। এঁদের পরিচালনায় থানার কংগ্রেস সংস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দুইপুত্র ও দুই কন্যার জননী ইন্দুমতী দেবী। বড় পুত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার এবং ছোট প্রাক্তন মন্ত্রী (পঃ বঙ্গ) এবং অধ্যক্ষ ছিলেন— নাম ডাঃ কালীদাস এবং শ্যামাদাস ভট্টাচার্য। শ্যামাদাসবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কারা-দণ্ডভোগ করেছিলেন।

সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম :—১৯১৩, হাওড়া শহর।

পিতা :— স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ব্যানার্জি। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী দলে যোগদান।

১৯৩৩ সালে কলকাতায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার। অভিযোগ অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার। সেলুলার জেলে নির্বাসন। ১৯৩৭ সালে বন্দীদের ডাকা দ্বিতীয় পর্যায়ের অনশন ধর্মঘটে যোগদান।

১৯৩৮ এ মুক্তি।

সর্বমোট কারাবাস প্রায় ৭ বৎসর।

প্রভাত কুমার ঘোষ

জন্ম :— বীরভূম জেলার ভালাসে। সন—১৯১৬।

পিতা :— স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র ঘোষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

বীরভূম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩৩-এ গেপ্তার।

কারাবাসকালে আন্দামানে নির্বাসন।

১৯৩৭ এর ঐতিহাসিক অনশনে যোগদান।

ঐ বছরেই দেশে ফেরৎ এবং ১৯৩৯-এ মুক্তি।

দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়

পিতা ঃ—পূর্ণচন্দ্র। জন্ম ঃ—১৯১৩। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম—রাইন। লবণ সত্যাগ্রহের সময় দেশবাসীর উপর পুলিশের অত্যাচার তাঁকে আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বাড়বাসুদেবপুর কেন্দ্রে কাজ করার সময় পুলিশের হাতে নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হন এবং ৬ মাস কারাদণ্ডভোগ করেন। সতীশচন্দ্র সামন্ত ও সুশীল কুমার ধাড়ার সহবন্দী ছিলেন। আগষ্ট সংগ্রামের স্বেচ্ছাসেবকদেরকে গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন।

পঞ্চানন সরকার

পিত—ভূতনাথ। জন্ম—১৯০২। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম—বোরডাঙ্গী। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস থেকে লবন সত্যাগ্রহ করেন—২৪ পরগনা জেলার হোটরে। এই সময় ৬ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৩২ সালে বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুনরায় ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোষ্ট অফিস পোড়ান ও থানা লুট প্রভৃতি অভিযোগে ধৃত হয়ে এঁকে ৫ মাস হাজতবাস ও ৩ মাস টাউনবেসে তমলুকে থাকতে হয়। অতি নিষ্ঠাবান এই দেশপ্রেমিক অত্যন্ত তেজস্বী ও ত্যাগব্রতী ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদীতা বহুজন পরিচিত। এঁর বাড়ী ও গ্রামে তিনি বহুবার কংগ্রেস সভা ও কর্মী সম্মেলন করেছেন এবং তাতে জেলার প্রখ্যাত যে নেতৃবর্গ বিভিন্ন সময় যোগ দিয়েছেন—তাঁরা হলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, অনঙ্গমোহন দাস, রজনী প্রামানিক, অজয়কুমার মুখার্জী ও সুশীলকুমার ধাড়া। ইনি গান্ধী আদর্শের গঠনকর্মও করেছেন।

ফকির মহম্মদ

পিতা—সেখ কাচি। জন্ম—১৯০৬। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া। গ্রাম—সিন্ধা। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৪২ এর প্রতিটি আন্দোলনে যোগদান করেছেন। ফলে তাঁর বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ইনি এক ত্যাগব্রতী গান্ধীবাদী কর্মী ছিলেন। স্থানীয় নেতা রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, পঞ্চানন সরকার, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য এবং অজয়বাবু, সতীশবাবু ও রজনীবাবুর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

বিভারাণী চক্রবর্তী

স্বামী রাধাগোবিন্দ। জন্ম—১৯১৬। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম—মেছাদা। দেশপ্রেমিক স্বামীর অনুপ্রেরণায় অল্প বয়সে ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে যোগদান করেন। স্থানীয় নেতৃবর্গের প্রভাবে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহন করেন। শিক্ষক পিতার ম্যাট্রিক পাশ কন্যা বিভারাণীকে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়। স্বামী বারে বারে কারাবরণ করতে থাকেন। বিভাদেবীরও তিন মাস জেল হয় এবং সরকার তাঁদের ব্যবসার ও সংসারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি করে। যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। এঁদের কোলাঘাটের বাড়ী পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে এবং সর্বসময়ের জন্য পুলিশ প্রহরা বসিয়ে দেয়। এঁদের ব্যবসাও বাজেয়াপ্ত করে নেয়। ইনি ব্রত নিয়েছিলেন 'জীবনে ইংরাজী বলব না, ইংরাজী পড়বনা এবং ইংরাজী লিখব না'।

ভূপতিচরণ মাইতি

পিতা—হৃদয়। জন্ম—১৯১১। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম-চকরাধাগঞ্জ। লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সময় ৪ মাস জেল হয়। ট্যাক্সবন্ধ, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন।

রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী

পিতা—ভূতনাথ। জন্ম—১৭৯৬। জেলা—মেদিনীপুর, থানা – পাঁশকুড়া, গ্রাম—কোলাঘাট। শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে ২ বার কারাবরণ করেন। নরঘাট ও কোলাঘাট লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করার অপরাধে স্কুল থেকে বহিস্কৃত হন। একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী হিসাবে মেদিনীপুর জেলায় সুপরিচিত ছিলেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সস্ত্রীক যোগদান করায় এঁর কোলাঘাটের ব্যবসা কেন্দ্রটি পুলিশী অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি কলকাতায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ঐ সময় কলকাতায় ধৃত হন। তমলুক মহকুমার বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে সুপরিচিত। পত্নী বিভারাণী দেবীও সংগ্রামী কর্মী হিসাবে মহকুমায় সুপরিচিত। এই সময় সরকারী অত্যাচারে এঁদের আর্থিক যে ক্ষতি হয় তার বর্তমান বাজার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। জাতীয় সরকারের আত্মগোপনকারী কিছু কিছু কর্মীর গোপনে কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করতেন।

রাখালচন্দ্র নায়ক

পিতা—অমরনাথ। জন্ম—১৯০৫। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম—রাধাবল্লভচক। অসহযোগ আন্দোলনের সময় শিক্ষাত্যাগ করেন। কুমারচন্দ্র জানা ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি বি. ভি দলে যোগদান করেন। ঢাকার মিছিলে যোগ দেওয়ায় ধৃত হন এবং ৬ মাস জেল ভোগ করেন। কলকাতায় ফিরে এসে সরকার বিরোধী কাজের জন্য পুনরায় ৬ মাস জেল হয়। ১৯২৮ সালে ঢাকার দীনেশ মিত্রের প্রেরণায় লাঠি খেলার আখড়ায় যোগ দেন। লবণ সত্যাগ্রহের সময় পুলিশ তাঁর বাড়ীর ধান, চাল, কলাই কেরোসিন একত্র মিশিয়ে দেয়। তিনি বাধা দিলে তাঁকে ২০ ঘা বেত মারে। ফলে তাঁর দুটি পা—অসাড় হয়ে যায়। জোড়াপুকুরে ডাঃ কালীদাস ভট্টাচার্যের সাহায্যে তমলুকের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে রজনীবাবুর ব্যবস্থাপনায় দু' মাস চিকিৎসার পর

সুস্থ হন। বিভিন্ন লবণ কেন্দ্রে যোগ দেন। ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে পাঁশকুড়ায় গ্রেপ্তার হন এবং ২ মাস হাজতবাস করেন। আগস্ট আন্দোলনে রাসগাছতলায় বক্তৃতাকালে ধৃত হন এবং বিচারে একবৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সুধাংশুশেখর সামন্ত

পিতা—কেশবচন্দ্র। জন্ম—১৯২৭। জেলা—মেদিনীপুর, থানা—পাঁশকুড়া, গ্রাম—বৈষ্ণবচক। আগস্ট আন্দোলনের প্রারম্ভে হ্যামিল্টন হাইস্কুল ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য রামতারক হাটের কংগ্রেস শিবিরে যান। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে মহিষাদলের সুন্দরা কংগ্রেস শিবিরে যোগদান করেন। ঐ সময় এখানে বিদ্যুৎ বাহিনী সংগঠিত হচ্ছিল। ইনি তাতে ভর্তি হন। সুশীলকুমার ধাড়ার নেতৃত্বে ঐ বাহিনীর অন্যতম সৈনিক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। কয়েকদিন পরে বাহিনীতে ব্যাণ্ড পার্টি যুক্ত হয় এবং ইনি এর বিউগিল বাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর মহিষাদল থানা দখল অভিযানে পোশাক পরিহিত বাহিনীর অন্যতম সৈনিক হিসাবে সুবৃহৎ মিছিলের সম্মুখ ভাগে বিউগিল বাদকের কাজ করেন। এর পরে ইনি আত্মগোপন করে দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ বাহিনীতে কাজ করতে থাকেন।

বিভূতি ভূষণ দেবরায়

যশোরের নলডাঙার রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই মানুষটি পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিপ্লবী কাজের প্রয়োজনে নিজের সম্পত্তি বন্ধক রেখে দু-দফায় মোট বারো হাজার টাকা বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য এবং ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খাটেন।

ডাঃ অমূল্যচরণ উকিল

১৮৮৮ সালে বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে এম. বি. পাশ করে খুলনার দৌলতপুর কলেজে ডাক্তারী এবং উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপনা করার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯১৭ সালে আর্মেনিয়ান স্ট্রীট ডাকাতি মামলার সূত্রে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। মুক্তিলাভের পর বিধান রায়ের আনুকূল্যে তিনি ডাক্তারী শাস্ত্রে বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। দেশ ফিরে সুচিকিৎসক হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

বিভুতিভুষণ ঘোষ

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। যশোর খুলনা যুব সংঘের বিশিষ্ট সংঘটক ছিলেন। এদের পরিবারের সকলেই রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন। ১৯৩০ সালে তাকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেফতার করা হয়। বিভূতিভূষণ দীর্ঘ আট বছর বিনা বিচারে বন্দী থাকার সময় কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

জন্ম ১৯০৫ সালে। পিতা—রামলাল। শচীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর। মার্জিত রুচিসম্পন্ন এই মানুষটির অপরকে আকর্ষণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বিকন শক্তিতে তিনি বাগেরহাট অঞ্চলে এক যুব সংঘ গড়ে তুলে তার সর্বাধিনায়ক হন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি প্রথম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সাল থেকে সরকার বিনা বিচারে বিভিন্ন জেলে তাকে পাঁচ বছরের অধিককাল আটকে রাখে। ঐ সময়ে তিমি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। কারামুক্তির পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। এবং দীর্ঘদিন সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন।

জীবনানন্দ ভট্টাচার্য

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় যুগান্তর দলের কয়েকজন নেতার সংস্পর্শে আসেন এবং দেশের কাজে উদ্‌বুদ্ধ

হন। তারপর আইন অমান্য আন্দোলন করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪২ সালে ভারতরক্ষা আইনে প্রায় তিন বছরের কারান্তরালে বাস করেন। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের মেডিকেল মিশনের সঙ্গে মালয় গিয়েছিলেন। এছাড়া নানা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে ইনি যুক্তছিলেন।

আভা দে

১৯৩০ খ্রীঃ নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেআইনী শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩২ খ্রীঃ স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা ভাঙ্গবার জন্য ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছুটিয়ে দেওয়া হয়। এক মহিলাকে রক্ষা করতে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছিলেন আভা দে। অনেকের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। কারামুক্তির পর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বিপ্লবীদের বেআইনী জিনিসপত্রের রক্ষয়িত্রী ছিলেন তিনি। এই মহিলা সকলের অজান্তে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

জ্যোতিকণা দত্ত (বেরা)

১৯৩৩ সালে কুমিল্লায় মামাবাড়ীতে তাঁর জন্ম। পিতা মোহনী মোহন। মাতা চারুনলিনী। বাল্যকাল থেকেই জ্যোতিকণা পড়াশুনায় ভাল ছিলেন। বান্ধবী বনলতা দাশগুপ্তের প্রভাবে তিনি বিপ্লবীদের কাজকর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। বনলতা কয়েকটি পিস্তল জ্যোতিকণার হেফাজতে রাখেন। ১৯৩০ সালে ডায়োসেসন কলেজ হোস্টেলের এক ছাত্রীর টাকা চুরি যাওয়ায় সকলের বাক্স তল্লাশী হয়। সেই সময় জ্যোতিকণার বাক্সে পিস্তলগুলি পাওয়া যায়। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেয়। জ্যোতিকণা গ্রেপ্তার হন। চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর ডাক্তারী পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে মতিরাম বেরা নামে একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে বিবাহ হয়, বর্তমানে লণ্ডন নিবাসী।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণদাসের সহকর্মী ছিলেন। ১৯২৩

সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ মাস জেল খাটেন। ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের দিনে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার সুরেশ মুখার্জীকে কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সহকর্মী হিসাবে জার্মানী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে অস্ত্র আমদানী প্রচেষ্টায় অংশ নেন। বাঘাযতীন পরিচালিত বুড়িবালামের যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১৯১৯ সালে জন্ম। সেনাবিভাগের কর্মী চিত্তরঞ্জন জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফোর্থ মাদ্রাজ পোষ্টাল ডিফেন্সকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৯৪৩ খ্রীঃ সামরিক পুলিশ বারো জনকে গ্রেপ্তার করে মাদ্রাজ পেনিটেন-শিয়ারিতে ফাঁসী দেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। মৃত্যুর সময় তাঁরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে একে অপরকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

নিত্যগোপাল সেন

জন্ম চট্টগ্রামে। ১৯৩০ খ্রীঃ বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ মাষ্টারদা (সূর্য সেন) এবং তারকেশ্বর দস্তিদার-এর মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এবং আরো তিনজন যুবক ১৯৩৪ খ্রীঃ পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে পুলিশ সুপার পিটার ক্লুয়ারীকে নিহত এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে আহত করেন। মিলিটারীর পাল্টা আক্রমণে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সতীশচন্দ্র সামন্ত

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রথম সারির নেতা ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। ত্যাগ ও বৈরাগ্য, সেবা ও নিষ্ঠা, শৌর্য ও বীর্যে তার সংগ্রামী জীবন ছিল গৌরবোজ্জ্বল। সতীশচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সাহস, নেতৃত্ব ও সেবার দৃষ্টান্তে প্রোজ্জ্বল। তার বিদ্যালয় জীবনের

আদর্শ ছিলেন প্রধান শিক্ষক হরিপদ ঘোষাল। পনের বছর বয়সে তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে আসেন, পরবর্তী জীবনে তাঁরই প্রদত্ত বীজমন্ত্র অন্তরে লালন করেছেন। মহিষাদলে তারই গুরুর নামে 'প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতি-ভবন' গড়ে ওঠে তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায়।

সতীশচন্দ্র শৈশবেই মাতৃহীন হয়েছিলেন। পিতা তরেন্দ্রনাথ ও দাদুর স্নেহে তিনি বড় হতে থাকেন। অধিক স্নেহ তাঁর জীবন গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। ছোটবেলা থেকেই যে কোনো প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে মাথা উঁচু করে চলার মানসিকতা তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

সতীশচন্দ্র অকৃতদার। কিন্তু নারীদের সঙ্গে তাঁর পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সকলকেই তিনি মাতা, ভগিনী ও কন্যার দৃষ্টিতেই দেখতেন। কারও সঙ্গে তার মাসী সম্পর্ক, কাকেও বা ডাকতেন বৌদি। অজয় মুখোপাধ্যায়ের সহোদরা কাঁচিদি তাঁর দিদির স্থানই অধিকার করেছিলেন। কন্যা স্থানীয়া অসংখ্য যুবতী তার 'ভগিনীসেনা'র সেনানী ছিল। অনেকের দুঃখময় অন্ধকার জীবনে তিনি ছিলেন আলোকবর্তিকা। ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের কন্যা কুমারী তপতী তার পাঠ্যজীবনে ছিল সতীশচন্দ্রের 'মা'। এই অবিবাহিত মানুষটি এভাবেই নারীদের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত করেছিলেন।

নিমতোড়ি দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার কেন্দ্রে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশচন্দ্র। ১৯২৩-২৪ সালে কাঁকুড়দার জাতীয় বিদ্যালয়ের তিনি অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। সতীশচন্দ্র গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নিরক্ষর কৃষিজীবিদের মধ্যে 'মেজবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। গ্রামের যে কোনো বিবাদের তিনি ছিলেন শালিশী বিচারক। অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ভবতোষ দাস, রাখালচন্দ্র মাইতি প্রমুখের সহায়তায় প্রথমে এক গৃহস্থের বৈঠকখানায় এক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বয়স্ক ছাত্রর সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদেরই উৎসাহে এ'রা তমলুক শ্রীরামপুর জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে 'হানা' পরিবার প্রদত্ত কিছু জায়গায় একটি বাড়ি তৈরী করে মাইনর স্কুল স্থাপন করলেন। এই স্কুল বাড়ি তৈরী করার সময় সতীশচন্দ্র অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিজেও কাদামাটির কড়া বয়ে নিয়ে মিস্ত্রীদের

পৌঁছে দিতেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি। তমলুক হ্যামিলটন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মন্মথ হুতাইত তার পিতা নিতাইবাবুর অনুপ্রেরনায় মহকুমার সেরা হাইস্কুল ত্যাগ করে এই সামান্য হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল।

১৯৩০-৩১ সালে দমদম জেলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসেবে থাকার সময় সতীশচন্দ্রের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মেদিনীপুরেরই আর একজন বিপ্লবী সুশীলকুমার ধাড়া। সুশীলকুমার ধাড়ার 'আমাদের সতীশদা' নামক স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সতীশচন্দ্র নিমতোড়ি এবং আশেপাশের সাত-আটখানা গ্রামকে নিয়ে তার কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্যে এঁদো পুকুর পরিষ্কার ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতেন তার অনুবর্তীদের নিয়ে। কলেরা রোগীর সেবা এবং নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করে তোলাই ছিল তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের সাধনা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ জাগানোর জন্যে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন বক্তৃতারও ব্যবস্থা করতেন। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে তিনি বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও শুরু করেছিলেন। হোমিও H. M. B ডাঃ জানকীনাথ সিংহ মাঝে মাঝে এঁদের সাহায্য করার জন্য এইসব গ্রামে আসতেন। সতীশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে রাইজুন্দিনকে কলেরা থেকে আরোগ্য করেছিলেন। তাই তার মা সতীশচন্দ্রকে বলেছিলেন 'তুই মোর কোন কালের বাপ ছিলি।' সতীশচন্দ্র ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন। রাজনীতির কারণে সে পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। যেমন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে চলে এসেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য।

বৎসর অবিভক্ত কংগ্রেসের সর্বসময়ের কর্মী ছিলেন। পরে দু বছর বাংলা কংগ্রেসের নেতা এবং তারপরে আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। আট বছর পাঁশকুড়া ও তমলুক থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে কাজ করার পর, ১৯৩৯-৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটিতে। যে মানুষটি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়করূপে জাতীয় বাহিনীর হিংসার কাজকে অকুণ্ঠভাবে

সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি অহিংসার পূজারী মহাত্মাগান্ধীর আগমন উপলক্ষে ১৯৪৫ সালের শেষভাগে মহকুমাব্যাপী যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হল তার সর্বসম্মত সভাপতি নিযুক্ত হন। অর্থাৎ সমস্ত রকম কাজেরই উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব সতীশচন্দ্র। ১৯৩০ এ গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী যাত্রার পূর্বে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তুতির অন্যতম সূচী হল তমলুক রাজবাড়িতে স্বেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপন। ঐ শিবিরে সতীশচন্দ্র হলেন আচার্য এবং সুশীলচন্দ্র হলেন উপাচার্য। সতীশচন্দ্রের বাবা ত্রৈলোক্যনাথ সামন্ত ১৯১৮-১৯ সালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর কাছে আবেদন করেছিলেন যে তিনি যেন সতীশচন্দ্রকে বিয়ে করার অনুমতি দেন, তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন 'আমি আশীর্বাদ করছি যে, সে সারা ভারতে খুব নামকরা মানুষ হবে। বিয়ে করলে তার সে সুযোগ হবে না'। স্বামীজীর আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। সতীশচন্দ্র তার পিতাকে খুশি করতে না পারলেও দেশের অসংখ্য মানুষকে তিনি সেবা করে খুশি করতে পেরেছিলেন। তমলুক মহকুমা রাজনীতিতে সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'দুই দেহ একআত্মা'। উভয়ের মধ্যে মতান্তর হলেও কোনদিন মনান্তর হয়নি। সতীশচন্দ্র কখনো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতেন না। আবার পরাজয়ে ভেঙেও পড়তেন না। একটানা ৩০ বছর তিনি পরিষদীয় জীবন অতিবাহিত করবার পর ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি সুশীল ধাড়ার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সেদিন তার অনুগামী ভক্তের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন সেটাই সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের যথার্থ পরিমাপক, 'Satisbabu is not a politician ; he is a man—a man with all the noble Qualities'।

সতীশচন্দ্র সামন্ত-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জীর যাবতীয় তথ্যসূত্র শ্রী সুশীলকুমার ধাড়ার 'আমাদের সতীশদা' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদক—

সাহিত্য-কলা বিভাগ

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ রায়

পিতা স্বগীয় যজ্ঞেশ্বর রায়, মাতা স্বগীয় দক্ষবালা দেবী। জন্মস্থান—অধুনা বাংলাদেশ- গ্রাম ও পোঃ অফিস—ভারেঙ্গা, জেলা—পাবনা। বর্তমান নিবাস—ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ শহর লালবাগে। জন্মকাল—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি জন্মগ্রহণ করেন ঐ ভারেঙ্গায় মাতুলালয়ে। মাতুলকুলে কোন্ প্রকার রাজনীতির অনুপ্রবেশ ছিল না। পিতৃদেব ছিলেন একজন আইনজীবি, কর্মস্থল ছিল লালবাগ কোর্টে। আইন ব্যবসায় তিনি ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ। শ্রী জিতেন রায়ের প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটে লালবাগ বাংলা স্কুলে। কলেজ জীবন 'বহরমপুরের বিখ্যাত কৃষ্ণনাথ কলেজে। পরে কলকাতায় ল'কলেজেও অধ্যয়ন করেন। ইনিও পিতার ন্যায় জীবন জীবিকার স্বার্থে স্থানীয় লালবাগ কোর্টেই আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি চরিত্রে বিপ্লবী চেতনার ঢেউ আসায় তিনি আইন ব্যবসায় যশস্বী হতে পারেননি।

এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষটি দেশ সেবাব্রতে সর্বপ্রথম প্রেরণা পান কলকাতায় পাঠরত অবস্থায় সেখানকার জনৈক প্রফুল্লদা নামের এক মহান ব্যক্তিত্বের কাছে। এই আদর্শবাদী মানুষটি কেবলই বসে থাকতেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল কতকটা সাধু-সন্ন্যাসীর মত। অবসর সময় এই প্রফুল্লদা এঁদের ১৫/২০ জন যুবককে নিয়ে বৈঠক করতেন, নানান গল্প গুজব করতেন। বিশেষতঃ তিনি প্রত্যহ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শোনাতেন ও মহান অন্যান্য চরিত্রের গুণাবলী, নিষ্ঠার কথাবার্তা শোনাতেন। শ্রী জিতেন রায় সাক্ষাৎ ঋষি অরবিন্দের সাথে নিমিত্তমাত্র পরিচিত হন। এই ঋষি অরবিন্দের মাদার (ইংরেজ মহিলা) এঁর সাথে বার বার দেখা করেছেন। আসার সময় প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ লাভ করেছেন এঁর।

শ্রী রায় বর্তমানে জীবিত রয়েছেন, বিপ্লবী সুশীল ধাড়া প্রমুখদের সাথে কাজ করেছেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল ইসলাম, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু (যখন লালবাগে আসেন) জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, রাজাগোপালাচারী, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুর্শিদাবাদের নবাব স্যার ওয়াশেফ আলি মীর্জা,

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, এ, কে, ফজলুল হক সাহেব, মুখ্যমন্ত্রী অতুল্য ঘোষ, অজয় মুখার্জী, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত ছিলেন। এককথায় ইনি ছিলেন একমাত্র গান্ধীজীর ভক্ত। এই গান্ধীবাদী মানুষ অধিকাংশ সময় গান্ধীজীর সাথে ঘুরেছেন। ইনি আজীবন কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী। সারা জীবন নিজে হাতে খাদি সুতো কেটে তদ্দ্বারা তৈয়ারী খাদি পোষাক পরে চলেছেন। এঁর জীবনে প্রধান সখ ছিল সর্বদা ভারতবর্ষের মধ্যে যখন যেখানেই কংগ্রেসের সম্মেলন বসেছে ইনি তখনই আমন্ত্রণ পেয়ে সর্বত্র ছুটে গেছেন ও যোগদান করেছেন।

মানুষটি ভিন্ন চরিত্রের। ইনি সুপণ্ডিত। ইংরেজী ভাষায় এঁর দখল অসামান্য। তখন ১৯৪৭, তখন বঙ্গ বিভক্ত হওয়ার সময় এখানে গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে আসেন রাজা গোপালাচারী। পরে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের বিদায়ের পর রাজা গোপালচারী গভর্ণর হলেন। সে সময় মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে 'সুযোগ সন্ধানীরা সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করেন। ইনি জীবন দিয়ে সেই নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের মোকাবিলা করেন। ইনি মুর্শিদাবাদের প্রভাবশালী ও তৎকালীন বিচক্ষণ নবাবদের সাথে ও দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে উদ্যোগ নিয়ে সর্ব শ্রেণীর মানুষ তথা প্রশাসনের সহায়তায় মুর্শিদাবাদকে সাম্প্রদায়িক দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। ঐ রকম সময়ের মধ্যেই মুর্শিদাবাদের নবাব স্যার ওয়াশেক আলি মীর্জার তত্ত্বাবধায়নায় ও আয়োজনে নবাব কেল্লায় প্রকাশ্যে হিন্দু-মুসলিম 'ইউনিটি কনফারেন্স' হয়। ঐ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভাষণ দেন। রাজা গোপালাচারী, নবাব প্রমুখদের ইংরাজী ভাষণের তিনি তাৎক্ষণিক সরলভাবব্যঞ্জনায় হুবহু বঙ্গানুবাদ করে সকলের কাছে উচ্চ প্রশংসিত হন। তখন জেলা সমাহর্তা ছিলেন এ. কে. মিত্র I C. S স্থানীয় মহকুমা শাসক সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন এখানে।

ইনি ধর্মীয় ব্যাপারে কখনও গোঁড়ামী পছন্দ করেননি, সর্বদা বিপক্ষে ছিলেন। তৎকালে সাহানগর ঘাটে কেবলমাত্র একটি সনাতনী দুর্গাপূজা হত। তাতে বর্ণ হিন্দুদেরই আধিপত্য ছিল পুরোপুরি।

সেখানে অস্পৃশ্য জাতির সে পূজোয় অংশগ্রহণ বিলকুল নিষিদ্ধ ছিল। সেই অমানবিক কাজের ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রী জিতেন রায় নিজে ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সহায়তায় এই লালবাগে সর্বপ্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজার প্রচলন করেন এবং ঐ পূজায় তখন ডোম-মুচি ইত্যাদি হরিজনদের অংশগ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। প্রথমবারে কোন সনাতনী ব্রাহ্মন পুরোহিত পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সহায়তায় স্বর্গীয় টগর গোঁসাই পূজারী এবং ইনি স্বয়ং তন্ত্রধারকের দায়িত্ব নিয়ে পূজা সমাপণ করেন। তাতে প্রথম ঐ বেদীতে এসে স্থানীয় হরিজনেরা অঞ্জলি প্রদান ও পূজাদি করার সুযোগ পান। এটা গান্ধীজীর "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" কার্যসূচীর একাংশ।

কলকাতায় একবার কংগ্রেস দ্বারা আহূত এক প্রাদেশিক সম্মেলনে (গড়ের মাঠে/বর্তমানে শহীদ মিনার ময়দান) সেবাদানকালে ব্রিটিশ ঘোড়সওয়ার সার্জেন্টরা সেই কংগ্রেসী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য বেপরোয়া ব্যাটনচার্জ করেন, তাতে ইনি আহত হন ও একটি আঙ্গুলে গুরুতর আঘাত পান।

এছাড়াও ভূদানযজ্ঞে সহসঙ্গী হিসাবে আচার্য বিনোভাভাবের সঙ্গে ইনি পদব্রজে অংশগ্রহণ করেন। দুর্গাপ্রসাদ সিংহ একজন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী প্রমুখগণও এই পদব্রজে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি। ইনি মদের দোকানে পিকেটিং করা, আইন অমান্য ইত্যাদি বহুবিধ কারণে বিভিন্ন সময়ে ৩/৪বার রাজনৈতিক কারাবরণ করেন ১৯৩০ সালে (৬ মাস)। সম্পূর্ণ গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত। মাঝে মধ্যে তৎকালীন বিখ্যাত বিপ্লবীরা সশস্ত্র আত্মগোপনকালে এঁর সাহচর্য পেয়ে থাকতেন। ইনি ভারত সরকার আয়োজিত তাম্রপত্র প্রাপ্ত হন এবং বর্তমানে সরকারী রাজনৈতিক পেন্সন মাসিক ১০০০ টাকা পেয়ে থাকেন। জীবনে চলার পথে যে কোন ব্যাপারে অর্থাৎ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদির ব্যাপারে যুক্ত থাকলেও মূল উদ্দেশ্যই

ছিল—সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেসের আদর্শে দেশকে অনুপ্রাণিত করা, জাগানো৷ বাঁচানোর স্পৃহা তথা নিজ হাতেকরে সর্বপ্রকার নিঃস্বার্থ কাজ করা।

ইনি ওকালতি ব্যবসায় অংশগ্রহণ করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। উক্ত কংগ্রেসের আদর্শই তিনি সেরা পালনীয় ধর্ম বলে মনে করেছেন। এই জীবনের সেরা সংগ্রামে ব্রতী ও আদর্শ রক্ষার কারণেই সাংসারিক দারিদ্র্যের প্রধান সহায়িকা ছিলেন সহধর্মিনী রাধারানী দেবী। স্ত্রী ছিলেন বেনারসের বাঙ্গালী পরিবারের কন্যা। সে আমলের ম্যাট্রিক পাশ। ইনিও খুব ভাল ইংরাজী বলতে পারতেন। তিনি অকৃপণ হস্তে নিজের গয়নাগাটি বেচে, খাওয়া পরার তথা সর্বস্ব সুখ ত্যাগ করে অম্লান বদনে স্বামীর এই অসাধারণ চিন্তা চেতনাকে উজ্জীবিত করে গেছেন। বেনারসে আহূত এক কংগ্রেসী সভায় শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অনর্গল ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করেছেন।

শ্রী জিতেন রায় ব্রিটিশ কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যা-কাণ্ডের কথা শুনে মানসিকভাবে আহত হন এবং তা দেখতে সেখানে ছুটে যান। ফরিদপুর কনফারেন্সে গান্ধীজীর সাথে বাসন্তীদেবী, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সহ অনেক গুণীজনের সান্নিধ্যে আসেন। ঐ দিনই কাজী নজরুলের স্বকণ্ঠে গীত শ্রবণ করে ধন্য হন। ইনি সাক্ষাৎ বহু দেশবরেণ্য নেতার সাথে যুক্ত। বর্তমানে ৯৩ বৎসর বয়স, তাঁর পুরনো স্মৃতি অধিকাংশ বিলুপ্ত। পরবর্তীকালে ইনি সত্য সাঁইবাবার প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রী শ্রী প্রভু জগবন্ধু সুন্দরের আখড়ায় ভবা পাগলার কাছে, সাধু-সন্ত, পীর-বাবা; ফকীর আউলিয়াদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এঁর বর্তমানে ৪ পুত্র। যথা—বারীন্দ্রনাথ রায় কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী, রবীন্দ্রনাথ রায় ইঞ্জিনিয়ার, রথীন্দ্রনাথ রায় হাইস্কুলের শিক্ষক, সৌমেন রায়, মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। এঁরাও পিতার ন্যায় সমাজ স্বীকৃত ও আভিজাত্যের অধিকারী।

সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা স্বর্গীয় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা—স্বর্গীয় রাধারানী

দেবী। মাতুলালয়—গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ। মাতুল কুল—জমিদার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি আছে। জন্মস্থান—ঐ মাতুলালয়ে। জন্ম সাল—১৯১১ খৃষ্টাব্দ। প্রাথমিক পড়াশুনা—লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন—নবাব বাহাদুরস্ ইন্সটিটিউশন থেকে। কিন্তু ঐ পরীক্ষার ফল বেরুনোর আগেই তিনি রাজনৈতিক গ্রেপ্তার বরণ করেন। অপরাধ—ব্রিটিশদের হেনস্থা করা। তৎকালীন লালবাগ জেলে থাকেন তিন দিন। পরে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হয়ে থাকেন তিন মাস।

ইনি তাম্রপত্র প্রাপ্ত। বর্তমানে অসুস্থ প্রায়। ইনি পুরাতন স্মৃতি মনে রাখতে পারেন না। সকলকে ঠিকমত সব সময় চিনতেও পারেন না। আমি অনুলেখক তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বহু সময় একত্রে নানাপ্রকার কাজকর্মে লিপ্ত থেকেছি। কিন্তু সেদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রথমেই বললেন—তোমার নাম কি? বেশ কিছু সময় তিনি নিজের অতীত ইতিহাস সঠিকভাবে বললেন, পরক্ষণেই প্রাণ খুলে সুর করে গান গাইতে লাগলেন। এঁর স্ত্রী একজন শিক্ষিতা স্ত্রী লোক। তাঁর কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেল।

শ্রী সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গর্ভধারিনী মাতা ছিলেন বিশেষ গরিয়সী, মহিয়সী ও সর্বোপরি খুব সুন্দরী। ব্যবহার ছিল অতুলনীয়; মাতৃসুলভ তথা সকলকে আপন করার মত। সেই মাতা, পুত্রের জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক। অনুশীলন দলের লুকোচুরিতে এই বিপ্লবীর সাথে হামেশা যখন তখন নিরাপদ আশ্রয়ে ভারগ্রহণ করত। যেমন সেকালে এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। যথা—ঐ মাতা অর্থাৎ রাধারাণী দেবী নিজ গর্ভজাত পুত্রের প্রতি যেমন যত্নবতী ছিলেন এবং পুত্রের সুরক্ষার বিষয়ে সলক্ষ্যাও ছিলেন, তেমনই একই সময় সেই ব্রিটিশ রাজে পুলিশ বাহিনীতে শ্রী পূর্ণচন্দ্র দত্ত নামের এক যুবককে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন ভাড়াটিয়া হিসাবে। একে ত নিজ গর্ভজাত পুত্র অনুশীলন দলের কর্মী, আর আশ্রয়প্রাপ্ত ছিলেন একজন ব্রিটিশ পুলিশ। যেন সাপ-নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু মাতৃগুণে ঐ সমবয়সী পুলিশ অফিসারটা এমনই

মায়ের ভক্ত হয়েছিলেন যে তিনি প্রাণ দিয়ে এই বিপ্লবীকে উদ্ধার করতে দ্বিধা করেননি। তিনি তখন নবগ্রাম থানার অধীন কিরীটেশ্বরী গ্রামে ডিউটিরত। কোন কাজে তিনি সেদিন থানায় এসেছিলেন। আচমকা তিনি জেনে ফেলেন—সেই রাত্রে পুলিশ বাহিনী শহর মুর্শিদাবাদের কোন কোন বাড়ী রেড করবে। দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে অতদূর থেকে সেই পুলিশ কর্মচারী জল-ঝড়-বজ্রপাতকে মাথায় নিয়ে এসে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাকে খবর দিয়ে সাবধান করে দেন। ফলে সেদিন রাত্রে অতর্কিত লাল পাগড়ীর দ্বারা বাড়ী সার্চ করা গেলেও সেদিন কোন কিছু পাওয়া যায়নি। আসলে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে লুকানো থাকত অসংখ্য গোলা-বারুদ, আগ্নেয়াস্ত্রসহ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং নানাপ্রকার পুস্তকাদি।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, যৌবনকালে তাঁর ব্যায়াম চর্চা অব্যাহত ছিল। লাঠিখেলা, অস্ত্রচালনায় অভ্যস্ত ও সক্ষম ছিলেন। একবার হিজলীতে বন্দীদের উপর গুলি চালালে ও অকথ্য নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তেতালার ছাদ থেকে জানালা দিয়ে গলিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সেদিন ছিল অবধারিত মৃত্যুর হাতছানি। বহু সময় ব্রিটিশ প্রশাসনের দ্বারা শারিরীক নানাবিধ পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর দুই ভাইয়ের মধ্যে শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন দেশসেবক এবং বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে সাবুদা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার সাথে যুক্ত। তার কণ্ঠে গীত "নওজোয়ান বিশ্বে জেগেছে আগুয়ান···" একটি বিখ্যাত গানের রেকর্ড। মধ্যম ভাই পীরুদা।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় হিজলীতে বন্দীদের উপর একসময় পুলিশ গুলি চালালে ও মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অবশ্যম্ভাবী ধরা পড়ার হাত থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বাঁচেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে পুলিশ তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করেন।

তিনি অনুশীলন দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং ব্যক্তি চরিত্রে এঁর স্বভাব ছিল সাহসিক এবং যে কোন কাজে উদ্যোগ ছিল অগ্রভাগে

চলা। অটুট মনোবলের এই মুক্তিযোদ্ধা সেই সময় যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন। তৎকালীন যাদুগোপাল পাঁজা (বর্ত্তমান শ্রী অজিত কুমার পাঁজার কাকা), কালিপদ মুখার্জী (মন্ত্রী) শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় এঁর বাড়ীতে এসেছেন ও থেকেছেন। বিপ্লবী সূর্য্য সেন (মাষ্টারদা), বিপ্লবী বাঘা যতীন, ঢাকার প্রতুল গাঙ্গুলী, মুজাফ্ফর আমেদ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সুশীল ধাড়া, মায়া ব্যানার্জী, পূরবী মুখার্জী প্রমুখ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত ছিলেন। এককথায় এঁরা আলফার অনুশীলন দলের কর্মীরা সর্বদাই বড়দের যে কোন ফাই-ফরমায়েস খেটেছেন। স্থানীয় এলাকার বিখ্যাত রাজনীতিক ও বিপ্লবী শ্রী জিতেন রায়, টগর গোঁসাই প্রমুখদের কাছ থেকে, হাতে-নাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

শান্তি দাস (কবীর)

জন্ম ১৯০৫ সালে, দেরাদুনে। পৈতৃক ভূমি শ্রীহট্ট। পিতা হৃদয়চন্দ্র। মাতা অশোকলতা। ১৯২৮ সালে শান্তি দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম, এ. পাশ করেন। মেয়েদের স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি ও তাঁর ভগ্নী প্রীতি দাস কলকাতায় নিজেদের বাসভবনে 'দীপালি শিক্ষা-মন্দির' নামে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন শান্তি দাসকে প্রভাবিত করে। শান্তি দাস কয়েকজন কংগ্রেস নেত্রীর সহায়তায় কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠন করেন। সমিতির সত্যাগ্রহী নারীরা বড়বাজারে বিদেশী পণ্য বিক্রির দোকানে পিকেটিং করতেন। বেআইনী শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠানের জন্য তাদের পুলিশের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে। সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতে করতে শান্তি দাস, প্রীতি দাস ও তাঁদের মাতা অশোকলতা দাস গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে শান্তি দাসের বিবাহ হয়।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যশোরের ভুগিলহাট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। খর্বকায় আত্ম-

প্রচারে বিমুখ নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটির বিপ্লবী জীবনের হাতে খড়ি হয় মাত্র বাইশ বছর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবব্রত বসুর হাতে। ১৯০৮ সালে যুগান্তর পত্রিকায় রাজদ্রোহাত্মক রচনা লেখার জন্য তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোলে তিনি আত্মগোপন করেন। পরে বালুরঘাটে ধরা পড়েন। দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিন বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর ভুপেন্দ্রকুমার দত্তের সহযোগিতায় 'সত্যাশ্রম' স্থাপন করেন। জীবনের ষোল বছরের অধিককাল তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। বিখ্যাত সরস্বতী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল।

প্রেমানন্দ দত্ত

জন্ম চট্টগ্রামে, পিতা হরিশচন্দ্র। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রিভেণ্টিভ অফিসারের চাকরী ত্যাগ করে প্রেমানন্দ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন। এরপর আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে কর্মচারীদের ঘোষিত ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। অনন্ত সিংহের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা তিনি করতেন। বিপ্লবীদের উপরে নজর রাখার জন্য নিযুক্ত গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল রায়কে গুলি করে হত্যা করে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকার সময় মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে তাঁকে রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে পাঠান হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রোহিনী বড়ুয়া

জন্ম ১৯১৫ খ্রীঃ চট্টগ্রামের রাউজান থানায়। বিপ্লবী সন্দেহে ১৯৩২ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। ফরিদপুরের দৌলতপুর গ্রামে অন্তরীণ থাকাকালে দারোগা সৈয়দ এরশাদের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে দা-এর আঘাতে দারোগার মুণ্ডচ্ছেদ করেন, এবং থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন। ফরিদপুর জেলে তার ফাঁসী

হয়। রোহিনী বড়ুয়ার আত্মাহুতির ফলে সব থানার ডেটিনিউরা দারোগাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেতে থাকে।

সুরমা মুখোপাধ্যায়

১৮৮৪ সালে সুরমা দেবী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সত্যহরি চট্টোপাধ্যায়। মাতা ঈশানী দেবী। বর্ধমানের কাটোয়ার কালিকাপুর গ্রামের গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অল্প বয়সে তার বিবাহ হয়েছিল। স্বামীর কাছ থেকে তিনি দেশসেবার প্রেরণা পান। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সুরমা দেবী চরকা কাটতেন। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ বে-আইনী লবণ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করতেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে তিনি কাটোয়ার মহিলাদের নিয়ে পূর্ণ উৎসাহে যোগদান করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে তাঁর দুবারে ছমাস করে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বর্ধমান জেলে ও বহরমপুর জেলে তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমায় নারী জাগরণে তাঁর অবদান অনেকখানি।

মেধা ঘোষ

১৯২৩ সালে হাওড়া শহরে মেধা ঘোষের জন্ম। পিতা মহতাব। ১৯৪২ সালে মেধা যখন বি. এস. সি.-এর ছাত্রী তখন 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তিনি উজ্জ্বলা মজুমদারের সংস্পর্শে এসে আন্দোলনে যোগ দেন। অর্থ সংগ্রহ করা, গোপন ইস্তাহার রচনা ও বিলি করা ইত্যাদিই ছিল তার প্রধান কাজ, ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের এক গভীর রাতে তাঁকে বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ না থাকায় পুলিশ তাকে কোনো ষড়যন্ত্রে জড়াতে পারেনি। অবশেষে নিরাপত্তা বন্দীরূপে তাকে জেলে আটকে রাখা হয়। ১৯৪৫ সালের শেষদিকে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৬-এ বি-এ পাশ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর লণ্ডনে গিয়ে সোশাল সাইন্স কোর্সে ডিপ্লোমা নিয়ে আসেন।

যতীন্দ্রমোহন রায়

যতীন্দ্রমোহনের বিপ্লবী জীবনের দীক্ষা হয়েছিল বাবা যতীনের হাতে। তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৯১৫—১৯২০ সাল পর্যন্ত বন্দী করে রাখে। পরবর্তীকালে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, বীরেন্দ্র ঘটক প্রমুখ বহু নেতা তাঁর দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বগুড়ায় 'জনমঙ্গল' নামক এক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব

(১৮৯৩—১৯৩৭)। শ্রীহট্টের লাতুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সতীশচন্দ্র। করিমগঞ্জে শিক্ষারম্ভ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৯২০ সালে শ্রীহট্টে ওকালতি শুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। এসময় থেকেই সুরমা উপত্যকা অঞ্চলের নেতারূপে পরিচিত হন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ দলে যোগ দিয়ে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় প্রায় এক সহস্র মনিপুরী কৃষকের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন (১৯৩০)। দেড়বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। জনশক্তি, শ্রীভূমি, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন।

ইন্দুমতী সিংহ

১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোপাল সিংহ। ইন্দুমতী ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী অনন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তিনি মাস্টারদার বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধৃত বিপ্লবীদের মামলা চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইন্দুমতী। ভারতের নানা জায়গা পরিভ্রমণ করে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই দুঃসাহসী নারী লালবাজারে গিয়ে পুলিশের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার

করে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৩১ সালে ডিসেম্বরে অর্থসংগ্রহের জন্য কুমিল্লায় এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইন্দুমতী রাজবন্দী-রূপে হিজলী জেলে ছিলেন ছয় বছর। জেলে থাকাকালীন লীলা নাগের কাছে পড়াশুনা করে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে ইন্দুমতী জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অমৃতলাল সরকার

জন্ম ১৮৮৯ সালে, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে। মানিকগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় অনুশীলন সমিতির সদস্য তারক গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসেন। অল্প বয়সে বিপ্লবী দলের সদস্য হয়ে লাঠি ও ছোরা খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টায় তিনি যোগেন চক্রবর্তীর সহযোগী ছিলেন। অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন ছদ্মনামের আড়ালে থেকে। অবশেষে ১৯১৬ সালে ধরা পড়েন এবং ৩নং রেগুলেশনে বন্দী হন। বিভিন্ন জেলে বন্দীদশা কাটিয়ে ১৯২১ সালে মুক্তি পান। ১৯২৩ সালে তিনবার রেগুলেশন বন্দীরূপে দক্ষিণ ভারতের জেলসাড়ে চার বছর অতিবাহিত করেন।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম

জন্ম ১৯১৪ সালে, কুমিল্লা জেলায়। পিতা রজনীকান্ত ছিলেন মোক্তার। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কোর্ট বর্জন করেন। প্রফুল্ল পিতার কাছ থেকে বিপ্লবের দীক্ষা পেয়েছিলেন। কুমিল্লার যুগান্তর দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট সিটডেন্সকে গুলি করে হত্যার ষড়যন্ত্রে তিনিও লিপ্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালে পুলিশ প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করে এবং ডেটিনিউ করে রেখে দেয় কুমিল্লা জেলে, পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় হিজলী বন্দীশালায়। ১৯৩১ সালে কুমিল্লার ককেসার গ্রামে স্বগৃহে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। এই সময় তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় বিনা চিকিৎসায় ১৯৩৭ সালে তার মৃত্যু হয়।

দুকড়িবালা দেবী

জন্ম ১৮৮৭ সালে বীরভূমের ঝাউপাড়ায়। স্বামী ফণীভূষণ

চক্রবর্তী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত মহিলা প্রথম দিকে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুকড়িবালা অন্যতম। বোনপো নিবারণ ঘটকের প্রভাবে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিবারণের দেওয়া সাতটি মাউসার পিস্তল নিজের হেপাজতে রাখেন। পুলিশ তার সন্ধান পেয়ে বাড়ীতল্লাসী করে এবং পিস্তল গুলি উদ্ধার করে। তখন ১৯১৭ সাল। দুকড়িবালা গ্রেপ্তার হন। কোলের শিশুকে বাড়ীতে রেখে তিনি জেলে যান। দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিপ্লবীদলে তিনি 'মাসিমা' নামে পরিচিতা।

মেজর সত্য গুপ্ত

জন্ম ১৯০২ সালে, ঢাকা জেলার বেজগাঁওতে। ছাত্রাবস্থায় তিনি হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে গুপ্ত বিপ্লবীদলের নির্দেশে কর্মকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এখানেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর সংগঠনে তিনি নেতাজীর প্রধান সহযোগী ছিলেন। তিনি B.V. দলের মেজর নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের পর তিনি রাজবন্দী হন। ১৯৩১-৩৮ পর্যন্ত স্টেট প্রিজনার রূপে, আলিপুর, বকসা, মিনওয়ালী (পাঞ্জাব) ও বরোদা জেলে থাকেন। হিজলী জেল থেকে মুক্তির পর তিনি নেতাজীর সহকারীরূপে নেতাজীর সব কাজের সঙ্গী হন। ১৯৪১-৪৬ পর্যন্ত পুনরায় রাজবন্দী হন।

সৌরীণ মিশ্র

জন্ম ১৯১৩ সালে মালদহে। জমিদার পরিবারের ছেলে। কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩১ ও ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ হয়ে থাকেন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভায় যথাক্রমে শিক্ষা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

ইন্দুসুধা ঘোষ

জন্ম ১৯০৫ সালে, ময়মনসিংহে। পৈতৃক দেশ ঢাকা বজ্রযোগিনীতে। ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ

করেন। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের আচার্য নন্দলালের কাছে কলা শিল্প শিক্ষালাভ করেন। ঐ সময় (১৯২৩) যুগান্তর বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবীদের রিভলবার, নিষিদ্ধ পুস্তক প্রভৃতি রাখতেন। পুলিশের চোখ এড়ানোর জন্য জলপাইগুড়ির সামসিং চা বাগানে গা ঢাকা দেন। সেখান থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩২ সালে। প্রমানাভাবে মুক্তি পান। পরে তাঁকে প্রেসিডেন্সি ও হিজলি জেলে ডেটিনিউ করে আটক রাখা হয়।

কুসুম বাগদী

মেদিনীপুরের কুসুম বাগদীর সাত মেয়ের পর এক ছেলে। দশ মাসের সেই ছেলেকে বাড়ীতে রেখে ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে তাঁর প্রথম রাত কাটে। পরের দিন তাঁর স্বামী ছেলে নিয়ে জেলগেটে এলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বলে বন্ড লিখে দিলে ছেলে পাবে। সেদিন এই নারী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে জেলেই থাকেন। দেশের জন্য তিনি ছেলের মায়াও ত্যাগ করেছিলেন।

বিধুভূষণ বসু

জন্ম ১৮৭৪ সালে, খুলনায়। স্বদেশী যুগে তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দিয়েছে। সাহিত্য এবং দেশসেবার জন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। ১৯০৯ সালে 'শিকার' নামক উপন্যাস লিখে ইংরাজ সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন। এবং এই উপন্যাস রচনার জন্য তাঁকে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। একদা তার গল্প, কবিতা, গান দেশপ্রেমিকদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করত। বহু তরুণ-তরুণী তাঁর কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই এর ব্রত গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি প্রধানতঃ গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৯২৮ সালে তাঁর পুত্রবিয়োগ হয়। এই পুত্রশোক ভোলার জন্য তিনি এক মাসে একাধিক উপন্যাস রচনা

করেছিলেন। হিন্দী ও গুজরাটিতে তাঁর বেশ কিছু রচনা অনূদিত হয়েছে। ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিরাম লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর রচিত 'রক্তক্ষয়' ও 'মীরকাশিম' নাটক দুটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বিধুভূষণ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে 'অসির চেয়ে মসী বড়'—এ সত্য প্রমাণ করে গিয়েছেন।

সন্ধ্যারাণী সিংহ

উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলায় জন্ম। তাঁর বিবাহ হয়েছিল লালবিহারী সিংহের সঙ্গে। লালবিহারী বিহারের লোক হলেও বীরভূমে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। বীরভূম জেলার কংগ্রেস সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৩৩ সালে সন্ধ্যারাণী কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি বহু মহিলাকে সামিল করেছিলেন। এই আন্দোলনের সময় তিনি কিছু মহিলা সহকর্মী নিয়ে রামপুরহাট ফৌজদারী আদালত বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কোর্টের সামনে বসে পড়েন। পুলিশ সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর একবছর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পরবর্তী জীবনে ভূ-দান যজ্ঞে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন।

অনিলকুমার দে

জন্ম ১৯১৬ সালে। বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে। পিতা—অক্ষয় কুমার। প্রাথমিক শিক্ষা গৈলা হাই স্কুলে। ছাত্রাবস্থায় পুলিশি অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। পুলিশি নির্যাতনের কাহিনী হাতে লেখা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। ১৯২৮ সালে বিনয় বোসের যোগাযোগ হয়। ইংরেজ বিতাড়নের সংকল্প মনের মধ্যে দৃঢ় হতে থাকে। বরিশাল B.M. College এ B. Sc পড়ার সময় যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। বরিশালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় আচার্য রায়ের সেবা করার সুযোগ পান। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত স্বদেশী কাজকর্মের জন্য তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল।

উষা গুহ

জন্ম ১৮৯৯ সালে, ময়মনসিংহ জেলায়, পিতা-অভয়চন্দ্র। তাঁর দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণাস্থল ছিলেন গান্ধীজী। ১৯৩০ সালে নোয়াখালিতে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সালে নবাবগঞ্জের তালিমপুরে একটা ঘরোয়া মিটিং করতে গিয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মী সুনীতি বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের প্রথমে নবাবগঞ্জের থানায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে রাত্রি বেলা এক গভীর জঙ্গলে পুলিশ ছেড়ে দিয়ে আসে। এ জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব ছিল। পুলিশের ধারণা ছিল বাঘের কবল থেকে ওদের বাঁচার উপায় নেই। পরের দিন ভোরবেলা পুলিশ জঙ্গলে খোঁজ করতে গিয়ে দেখে ওরা জীবিত। যথারীতি আবার ওদের থানায় নিয়ে আসা হয় এবং তিন মাস হাজত বাসের সাজা হয়।

ফুলবাহার বিবি

জন্ম ১৯১৬ সালে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সুবাসপুর গ্রামে। অল্পবয়সে মা-বাবাকে হারান। বড়ভাই তমিজুদ্দিন একাধারে পিতা ও মাতার স্নেহ দিয়ে তাঁকে বড় করে তোলেন। তমিজুদ্দিন ছিলেন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ফুলবাহার ছিলেন দাদা অনুগামী, দাদার দৌলতে বহু দেশপ্রেমিক নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁকে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ঢাকা ও বহরমপুর জেলে তিনি কারাজীবন অতিবাহিত করেন।

নারায়ণ সেন

জন্ম ১৯১২ সালে, বগুড়ায়, পিতা-সুরেশচরণ। মাতুলালয় চট্টগ্রাম। সেখানে থেকেই তিনি পড়াশুনা করতেন। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালে যুব বিদ্রোহের তিনিও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধেও তিনি

যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধশেষে সূর্য সেনের নির্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ঢাকা, মজঃফরপুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন সাজে আত্মগোপন করে ১৮ বছর কাটিয়েছেন। কলকাতায় 'অনাথ রায়' ছদ্ম নামে বসবাস করেছেন।

আল্লুরি সীতারাম রাজু

অন্ধ্রপ্রদেশে আল্লুরি সীতারাম রাজু একটি বিপ্লবী নাম। ১৯২২ সালে স্থানীয় আদিবাসীদের অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন তিনি। তিনি সম্ভ্রশ্রেণীর মানুষ ছিলেন। আদিবাসীদের ওপর শোষণ বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে তিনি গোপনে ৩০০ আদিবাসী কৃষক তরুণ নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেন। এদের সাহায্যে ঝটিকা আক্রমণে একের পর এক থানা দখল করেন। সেই সময় তাকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার তৎপর হলেও স্থানীয় মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর বাহিনীর হতে স্কর্ট কাওয়ার্ড ও হেইটার নামে দু'জন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ নিহত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা তাঁর বাহিনী বিপর্যস্ত করে দিয়ে সরকারকে বিব্রত করেছিল। এরপর ইংরেজ সরকার তার বিরুদ্ধে সুবিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। কয়েক মাস যুদ্ধ চালাবার পর ১৯২৪ সালে ইংরেজের হাতে তিনি ধরা পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

যাদু নাঙ

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল ঝটিকা সারা ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ঝটিকার আলোড়নে পরাধীন অঞ্চলের নাগাদের বিক্ষোভ থেকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সমগ্র দেশে তখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত। এই সুযোগে আসামের নাগারা অস্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। এই নাগা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিলেন যাদু নাঙ ও তাঁর সম্পর্কিত ভগ্নী গুইদালো। যাদু নাঙ দীর্ঘদিন ধরে নাগাদের ছোট বড় বহু আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং নাগাদের ইংরেজ বিরোধী করে তুলেছিলেন। ১৯৩০ সালে তাঁর আহ্বানে নাগা পাহাড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে। বিদ্রোহের

নায়ক যাদু নাগুকে ধরবার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী নাগাপাহাড় তোলপাড় করে, বহু নাগা প্রাণ হারাল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে যাদু নাগু ধরা পড়েন। ইংরেজ সরকার নামমাত্র বিচার করে তাঁকে নরহত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেন।

রাসমনি

সুসঙ্গ পরগণার ভেদিপুরা অঞ্চলে এক দরিদ্র টঙ্কচাষীর ঘরে রাসমনির জন্ম। বারো বছর বয়সে এক টঙ্কচাষী দরিদ্র যুবার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরেই রাসমণি বিধবা হয়। গ্রামের লোকেদের কাছে সে হয়ে যায় ডাইনি। রাসমণি পরের জমিতে ধান বুনে কোনরকমে নিজের পেট চালাত। অবসর সময়ে নিজের হাতে হাজং মেয়েদের জন্য কাপড় ও ওড়না বুনত। রাসমনি সুসঙ্গ অঞ্চলে ধাই-এর কাজও করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সেই সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এই সংস্থার পতাকাতলে তার নূতন কর্মজীবন শুরু হয়। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন যোগানোর জন্য সে চাল সংগ্রহ করত। হাজং অঞ্চলে খাল কাটা বাঁধ বাধা প্রভৃতি কাজে তাকে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। ১৯৪৬ সালে রাসমণি তার এক সংগঠিত বাহিনী নিয়ে ইংরেজ বিরোধিতায় নেমে পড়ে, নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনকারী বিদেশী শাসকদের সে সমুচিত শিক্ষাও দেয়। দা ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী ইংরেজ সরকারের পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়।

তথ্যসূত্র

১। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান/সাহিত্য সংসদ

২। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী/কমলা দাশগুপ্ত

৩। মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জীর সিংহভাগ তথ্য আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা মেদিনীপুরের বিপ্লবী সুশীলকুমার ধাড়ার কাছ থেকে।

৪। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা/প্রধান সম্পাদক শ্রীসুকুমার মিত্র।

৫। Mukti Tirtha Andaman.

৬। শহীদ ক্ষুদিরাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে 'দলিল বার্তা'র সম্পাদক ফজলুল হক (প্রান্তিক, এনাইগঞ্জ, ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ) দু-জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনপঞ্জী পাঠিয়েছেন (জিতেন্দ্রনাথ রায় ও সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। আমরা জীবনী দুটি 'মাতৃ-মন্ত্রী সাল্গী' পর্বে সন্নিবিষ্ট করলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জীবনীদুটির অনুলেখক ফজলুল হক।

৭। মুক্তির সংগ্রামে ভারত—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৮। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক—সুপ্রকাশ রায়

———

তৃতীয় পর্ব

প্রবন্ধগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথের বঙ্গজননী / একটি পর্যায়

ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

একটা দেশের সঙ্গে সেই দেশের মানুষদের সম্পর্কে মোটামুটি ত্রিমাত্রিক: ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও আত্মিক। দেশের ভৌগোলিক সীমায় সে বসবাস করে, ঐতিহাসিক সময়ে দিনাতিপাত করে এবং আত্মিকলোকে সে শাশ্বত মর্যাদা লাভ করে। এই রকমের একটি বক্তব্য পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথেব 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের সংযোজন অংশে। মানুষ 'মানুষ' বলেই স্থান ও কালে বাস করতে করতে স্থানাতিক্রমী ও কালাতিক্রমী হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টায় সাফল্যের জন্য মানুষকে সাধনা করতে হয়—দীর্ঘকালের সাধনা। কাজটি সহজসাধ্য নয় বলেই জাতিগঠনে মানুষ উদ্যমী হয়, জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় আক্রমণ করে বসে অন্যকোন ভূ-খণ্ডকে। সমাজ নির্ভর ভারতবর্ষ কোনদিনই সেই অর্থে জাতিগঠনের চেষ্টা করেনি। কোন ঐতিহাসিক কালপুরুষ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে চেষ্টা করলেও জাতীয়তাবাদ বা 'ন্যাশানালিজম' এ দেশের রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অধ্যায় (chapter) নয়। উনিশ শতকের জাগ্রত ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসকদের আদর্শে জাতিগঠনের কথা ভাবতে শুরু করেছিল। সেই ভাবনার বাস্তব বিগ্রহ হল শতাব্দীর একেবারে শেষ পাদে গঠিত জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের যাঁরা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তাঁরা পৈতৃকসূত্রে বিত্তবান এবং সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান। জনমানসের দুর্নিবার আর্থ-সামাজিক চাহিদাকে জাতীয় কংগ্রেস বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংহত করতে চেষ্টা করেনি। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থেকে কংগ্রেসের জন্ম হলে এদেশের স্বরাজ সাধকেরা উনিশ শতকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষ এবং আন্দোলনের মূল spirit টা বোঝার চেষ্টা করতেন। তাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা একটা superstructure-এর ব্যাপার হয়ে রইল মাত্র, তৃণমূলের মানুষদের আকাঙ্খা থেকে জন্মাল না। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে অসংগঠিত সাধারণ শ্রেণীর মানুষদের একটি সংগ্রাম চলছিল। ঠাকুর বাড়িতেও দেশানুরাগের 'মৃদুমাদকতা' প্রভাব বিস্তার করে। দেশের প্রতি উষ্ণ অনুরাগ ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথের মনকে রাঙিয়েছিলেন

রাজনারায়ণ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। পারিবারিক ভাবপরিমণ্ডল দেশ অর্থাৎ বাঙলাদেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের উষ্ণ বাতাস ঠাকুরবাড়ির জানালা দিয়ে প্রবেশ করেছিল মাত্র। মুক্ত দ্বারপথে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বাঙলা দেশের প্রসন্ন পরিবেশকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পদ্মা-বিধৌত বাঙলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। এইভাবে দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ অনুভব করার সামান্য আগে থেকেই অবশ্য বিলাসী দেশপ্রেমিকদের অন্তঃসারহীন বাগাড়ম্বর যেন দুঃসহ মনে হয়েছিল কবির। যে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে বলেছিলেন তাঁর দীর্ঘকালের 'প্রেয়সী', পদ্মার বর্ষাকালীন ক্ষুব্ধ রূপ ও শরৎকালীন সোনালি মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রাক্-বর্ষার উষ্ণ বাতাসকে অনুভব করেছিলেন স্নেহময়ী জননীর তপ্ত নিঃশ্বাস রূপে, সেই-রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙলা দেশের নিসর্গপ্রকৃতি জননীর অথবা প্রেমিকার প্রতীক। রুক্ষ লাল মাটির দেশ বীরভূম ও রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল তার নৈসর্গিক রূপ ও মানুষদের জন্য। দেশকে তাই রবীন্দ্রনাথ স্থান ও কালের দর্পণে দ্যাখেন নি দেখেছিলেন আত্মিকলোকে।

আত্মিকলোকে দেশকে রবীন্দ্রনাথ কতটা অনুভব করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'কড়ি ও কোমল' থেকেই। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'নৈবেদ্য' রচনার কালপর্বান্ত পর্যন্ত অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এমন কিছু কবিতা যার মধ্যে বাঙলাদেশ সম্পর্কে তাঁর গভীর আবেগ উচ্চারিত হয়েছে নানা ছন্দে। 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই পর্বের কাব্য যখন হৃদয় অরণ্যে পরিভ্রমণের কাল চলছে। তবু নবযুবক কবি 'কড়ি ও কোমল'-এর বিভিন্ন কবিতায় আবেগোত্থ জীবন প্রেমকে যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি বাক্-সর্বস্ব দেশপ্রেমিকদের লক্ষ্য করে বিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি ঃ

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি।
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশিযাপনা।

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা। ("বঙ্গবাসীর প্রতি")

এখানে কবির আক্ষেপ মিছে আর ছলনায় ভরা বাঙালীর বাগাড়ম্বরের জন্য। দেশের কষ্টে যখন গুমরে মরেছে বুক-ফাটা দুঃখ তখন বঙ্গ জননীর লজ্জা দূর করা অপেক্ষা যশের আকাঙ্ক্ষা আর করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হওয়ার বাসনা বাঙালী কর্মবীরদের আবিষ্ট করে ফেলেছে—রবীন্দ্রনাথের দুঃখ এখানেই। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'-তে (১ম খণ্ড) এই কবিতাটির আগে স্থান পেয়েছে "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতাটি। দেশকে কবি দেখেছেন জননী মূর্তিতে। যে দেশ-জননী তার সন্তানদের দিয়েছে স্বর্ণশস্য, জাহ্নবীবারি, জ্ঞান, ধর্ম ও পুণ্যকাহিনী সেই দেশ-জননীকে তার সন্তানেরা দিয়েছে মিথ্যাভাষণের ডালি সাজিয়ে। দেশবাসীদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার কবিকে ব্যথিত করেছিল বলেই বেদনার্ত কবি লিখলেন :

এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে !
তুমিতো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি—
স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান কর্ম যত পুণ্যকাহিনী।

দেশের প্রতি মমতা এবং বচনসর্বস্ব দেশবাসীর আচরণে বিরক্তি আরও তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হল 'কড়ি ও কোমল'-এর পরবর্তী কাব্য 'মানসী'র "দেশের উন্নতি" ও "বঙ্গবীর" কবিতা দুটিতে। কবিতা দুটির মধ্যে রচনাকালের ব্যবধান মাত্র দু'দিনের। "দেশের উন্নতি"র প্রথম স্তবকেই যখন কবি লেখেন :

অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন groan
এ হেন কালে ভীষ্ম-দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে !'—তখন 'শোন', 'groan'

এবং 'দ্রোণ'-এর মিল রচনার কৌতুক শ্লেষে তীব্রতা পেয়ে যায়। এ দেশের ইংরেজ-বিরোধী রাজনীতি যে বচনসর্বস্ব সেই ক্ষোভই 'কড়ি ও কোমল' থেকে ফিরে ফিরে এসেছে। দেশের শিক্ষা এবং দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে বিস্মৃত হয়ে পরানুকারী বাঙালী তার নতুন 'কালচার' গড়ে তুলেছিল ইংরেজের জীবন, বসন, অশন ও বাচন অন্ধভাবে অনুকরণ করে। তাই এ দেশের উন্নতি-বিধায়কদের তামসিকতার উপর কবির আঘাত নেমে এল খর ভাষায় :

যাক, পড়া যাক 'ন্যাস্‌বি সমর'—
আহা, ক্রমোয়েক, তুমিই অমর !

থাক, এই খেনে, ব্যথিছে কোমর,
কাহিল হতেছে বোধ।
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।
আরে, আরে এসো। এসো ননিবাবু,
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু।
কালকের দেব শোধ। ("বঙ্গবীর")

'মানসী' কাব্যের কবিতা রচনার কাল থেকে (১৮৮৮) প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য Provincial Conference-এর সূচনা হয়েছিল। প্রথম দিকে ক'লকাতায় এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান নয়। কিন্তু ক'লকাতার বাইরে যে বৃহত্তর বঙ্গভূমি সেখানকার মানুষদের রাজনীতিগতভাবে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে ঐ সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯৫-এর জুন মাসে আনন্দমোহন বসু-র সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। রবীন্দ্রনাথের কবি জীবন যখন 'চিত্রা' ও চৈতালি'র কবিতা রচনার উপাদান খুঁজে পেয়েছে শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসর-এ। বেশ কিছুকাল রুদ্ধদ্বার জীবন ব্যাকুলতায় কেটেছিল অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বাঙলাদেশের সান্নিধ্য লাভের জন্য। কিন্তু লোহ-লোষ্ট্রে গড়া ক'লকাতা ক্রমে হয়ে উঠছিল পৃথুলাকার সরীসৃপের মত। তখন ঠাকুরবাড়ির চত্বরে সূর্যের আলো সড়াসড়ি নেমে আসত কখনও, কখনও নারকেলপাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে। আড়াল থেকে প্রকৃতিকে দেখার যাতনা কবিমনে বৃহত্তর বাঙলাদেশকে দেখা ও জানার বাসনাকে দিল বাড়িয়ে। 'সোনারতরী' ও 'চিত্রা' বিভিন্ন কবিতায় পদ্মাপারের বাঙলাদেশের সরস সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ ছড়িয়ে আছে নানাভাবে। 'চৈতালি'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "বঙ্গমাতা" নামে কবিতাটি। এই কবিতার পিছনে কবির ব্যক্তিজীবনের কিছু যন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনুমাদ করা হয়। প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল গয়াতে যখন কর্মসূত্রে বদলি হয়েছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র-বিদ্বেষ সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু যে লোকেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের বন্ধু তিনিও দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-বিদ্বেষ বর্ধনে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। "বঙ্গমাতা" কবিতাটি রচনার সময় কবির এই ব্যক্তিগত জ্বালা সাধারণভাবে বাঙালীচরিত্রের ক্ষুদ্রতার জন্য ব্যথাবোধের সঙ্গে মিশে যায়। কবি লেখেন:

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও। তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।

...   .

সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।

'চৈতালি'র "বঙ্গলক্ষ্মী" কবিতাটি যখন লেখা হয় তখন ভারতের বর্ণ বিহ্বল সৌন্দর্যমণ্ডিত বিলাসোচ্ছল জীবনরঙ্গের প্রতি কবি আকৃষ্ট এবং আকৃষ্ট একইসঙ্গে তপোবনের ধ্যানমহিমার প্রতিও। প্রাচীন ভারতের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচীনভারতের সৌন্দর্যের অমরাবতীতে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রধান কবিতা হল 'ভারতলক্ষ্মী' 'এবং বঙ্গলক্ষ্মী।' কবিতা দুটিতে যথাক্রমে 'ভুবন মনোমোহিনী ভারতলক্ষ্মীর প্রতি' এবং 'নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী' বঙ্গমাতার প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ভালোবাসা গভীরভাবে ধরা পড়েছে। এই কবিতা দুটির জন্মের আগেই নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আগ্রহে যে প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল সেই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বাঙলাভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করায় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রাষ্ট্রনেতা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, 'Rabi Babu, your Bengali was wonderful, but do you think your *chasas* and *bhusas* understood your mellifluous Bengali better than our English ?' রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'আমার এই সৃষ্টি ছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে ইংরেজী ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি।' সভার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। ১২ই জুন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হওয়ায় সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই গভীর অনুরাগ প্রকাশকালে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতাটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। পরাধীন দেশের মর্মযাতনা কবিকে গভীরভাবে বিদ্ধ করেছিল। বিভিন্ন ঋতুতে নানা সাজে সজ্জিতা এই দেশ এবং শত কষ্টেও তার 'প্রফুল্ল অধরে / বাক্যহীন প্রসন্নতা নিয়ে আবির্ভূতা।' মাতৃভূমি বাঙলাদেশের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে আবিষ্ট কবি লিখলেন :

এ বিশ্বসমাজে

তোমার পুত্রের হাত নাহি কাজে

নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু, মাগো,

নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ

মলয় বিজন করি।...রয়েছে মা ভুলি

তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি

সৌভাগ্য ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,

তোমার ললাটশোভা সীমান্ত রতন,

তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে

বহু দূর বিদেশের বণিকের কাছে।

ভারতের রাজনীতি ক্রমে মুক্তিকামনার দিকে সংহত হতে থাকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে নবভাবোন্মদনা। ওকাকুরা-নিবেদিতা-সুরেন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এল আর একটি নাম সরলাদেবী। স্বদেশী আন্দোলনের এই পরম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' কাব্য গন্থে লিখলেন :

আমি ভালোবাসি দেব এই বাঙলার

দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার

বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে

...ইত্যাদি ('নৈবেদ্য' : ৭৩)

এর পরের সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। 'গোরা' উপন্যাস রচনার পূর্বে এর চেয়ে বড়ো ঘটনা আর ঘটে নি। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয়তা সম্পর্কে ইংরেজ সরকার সচেতন হয়ে উঠেছিল আগেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হয়ত গভীর ব্যথার সঙ্গেই লক্ষ্য করে এসেছেন দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার পরিবর্তে দেশপ্রেমিকদের ইংরেজি প্রেমের বাড়াবাড়ি, লক্ষ্য করেছেন কংগ্রেসের ভিতরকার ন্যাশানালিস্ট গ্রুপের অভ্যুত্থান এবং কংগ্রেসের ভিতর নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ভাবগত দ্বন্দ্ব। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রাখীবন্ধনের মহোৎসবে রবীন্দ্রনাথও যুক্ত ছিলেন ঠাকুরবাড়ির আরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু বয়কট ঘোষণার পর শাসক ইংরেজ ও সলিমুল্লার মত শাসকগোষ্ঠীর বিশ্বস্ত অনুচরেরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে এক ধরণের সংকীর্ণতাবাদকে আধিপত্য বিস্তার করতে দেখে

ব্যথিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রে। তার আগেই ১৮৫৭-এর জাতক আইরিশ-জননীর সন্তান গোরা-র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণতা বিরোধী বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন। জন্ম নামক আকস্মিক ঘটনায় গোরা-র যে অসামান্য নিষ্ঠা ছিল তা বুদ্বুদের মত হারিয়ে গেল বিস্ময়কর এক আবিষ্কারের ফলে—গোরা হিন্দু নয়। ভারতীয় জননীর সন্তানও নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য গোরা-র মাধ্যমে ব্যক্ত হল তা-ই আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনার চরম প্রকাশ: 'ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল।' কথাগুলো আসলে গোরা-র মুখে রবীন্দ্রনাথেরই কথা।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন

অভ্র ঘোষ

বিপ্লবাচার্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী মহলে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ওয়াকিবহাল পাঠকের কাছে, খুবই পরিচিত একটি নাম। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্তর থেকে জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে জ্যোতিষচন্দ্র আরও অনেক বিপ্লবী নেতার মতই সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে দেশোদ্ধার করা সম্ভব নয়, সাধারণ মানুষের মুক্তি ছাড়া সর্বপ্রকার স্বাধীনতার চিন্তা অলীক। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে দেশ থেকে হঠিয়ে দিলেই স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যাবে, এমন স্বপ্নে চিড় ধরেছিল। বস্তুত বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজটাও যে জনগণের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়, এ-যে কোনও এলিট গোষ্ঠীর সাধ্য নয় বা সাধ্যাতীত না হলেও, সে-পদ্ধতি বা দর্শন যে সাধারণ মানুষের মঙ্গলকামী নয়—এই সহজ বোধ বিপ্লবীদের চিন্তা-ভাবনায় এসেছিল। জ্যোতিষচন্দ্র সেই ধারার ব্যতিক্রম তো ননই, বরং অন্য অনেকের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে থাকা মানুষ।

আন্দোলনে সাধারণের অংশগ্রহণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব জোরদারভাবে এই কথাটা তুলেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তাঁর কঠিন সমালোচনা ছিল সে-সময়কার নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে যে, এ-আন্দোলন কেবল আবেদন-নিবেদনের ভিক্ষাবৃত্তিই নয়, কংগ্রেস জনগণের সংশ্রববিচ্ছিন্ন। স্বদেশী আন্দোলনের ভরা জোয়ারেও তিনি দেখেছিলেন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-যাপনের বোধ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন বিদেশী দ্রব্য বয়কটের নেশাগ্রস্ত আন্দোলন। সমালোচনা করেছিলেন তখনই তা কড়া ভাষায়, বলেছিলেন সদর্থক দর্শন দিয়ে চালিত হয়ে জনসাধাণের হৃদয় ছুঁতে না পারলে গতি পাবে না স্বদেশী আন্দোলনের মত বড় মাপের আন্দোলনও।

কংগ্রেসের জনগণবিচ্ছিন্নতার ধারায় প্রথম মোড় ফেরাবার চেষ্টা করেছেন মহাত্মা গান্ধি—একথা আজ ইতিহাসস্বীকৃত। দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রত্যাগত গান্ধির নেতৃত্বকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অভিবাদন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও অনতি-বিলম্বেই। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বান' তার সাক্ষী।

তবে গান্ধির এই মোড় ফেরানোর চেষ্টা ধাপে ধাপে এগিয়েছিল। এক লাফেই জনগণের চেতনাকে কংগ্রেস ধরতে পারে নি। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও কংগ্রেস তা পুরোপুরি পেরেছিল কি না, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং গভীর সংশয় তো আছেই। তবে এক বিশিষ্ট দর্শন থেকে গান্ধি যে সে চেষ্টা করেছিলেন, একথা অবশ্যই তর্কাতীত। দর্শনটি সকলের মনঃপূত নাও হতে পারে। কিন্তু জনগণের নেতা হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা যে একমেবাদ্বিতীয়ম—সেকথা তো স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের নির্মোহ পাঠকমাত্রেই মানবেন।

কিন্তু ওই যে বললাম, কংগ্রেস জনগণের দল হয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় নিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করতে তার যথেষ্ট দেরি হয়েছিল, তার একটি নমুনা দেখানো আপাতত আমাদের এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

১৯২৮ সালে জ্যোতিষচন্দ্র তাঁর লেখা এক প্রবন্ধে বলছেন, 'দেশের কংগ্রেসী পলিটিক্স আজ ঠিক এইখানটাতে এসেই দাঁড়িয়েছে—শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের দারিদ্র্য, দুঃখ ও বেকার-সমস্যা দূর করবার জন্য স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে আজ সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য মিত্রশক্তি সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা জমিদার মহাজনদের সঙ্গে স্বার্থসংরক্ষণ ও তার বর্ধনের দিক থেকে আপনাদের মিলিয়ে ফেলেছে। সেই মিলনের পর তারা দাঁড়িয়ে দেখতে চেয়েছে যে, দেশে আর কারা কারা আছে এবং নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে তাদের জন্য কী কী ছাড়তে হবে এবং তার প্রতিদানে তাদের কাছ থেকে কী কী পেয়ে তাদিগে একেবারে চিরকালের জন্য বাধ্য করে বেঁধে ফেলতে হবে। তার ফলে নিজেদের জন্য হবে স্বাধীনতা, আধিপত্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তাদের জন্য হবে পরাধীনতা, দাসত্ব ও সাধ্যমত অভাবের দূরীকরণ। এই নূতন বর্ণবিভাগে শতকরা দশজন অভিজাত সম্প্রদায়ের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত এবং বাকি নব্বইজন 'প্রোলিটারিয়াট' শ্রেণীভুক্ত। এখন অবশ্য শতকরা দশজন শেষের শ্রেণীর অনেককে অর্থলোভে এবং ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের বশে রেখেছে, তবে যখন প্রশ্নটা অতি তীব্রভাবেই উঠেছে, তার মীমাংসাটা শীঘ্র হবেই।' (দেশের হাওয়া / জ্যোতিষচন্দ্র রচনাসংগ্রহ)

কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জ্যোতিষচন্দ্র এসব কথা লিখেছিলেন ১৯২৮-এর নভেম্বরে কলকাতা থেকে সমাজতন্ত্রীদের এক পত্রিকা 'স্বদেশী-বাজার'-এ। মনে রাখা দরকার যে, এ-সময়টা ছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের উন্মেষপর্ব। জ্যোতিষচন্দ্ররা অবশ্য খানিকটা স্বাধীনভাবেই সমাজতন্ত্রী চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

শিল্প-শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা, তাঁদের সচেতন করার আন্দোলন তাঁরা তখন করছিলেন খোলামেলাভাবেই। কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা তখন তৈরি হয়ে গেছে। পুরনো বিপ্লবপন্থী দলের নেতারা তখন অনেকেই বলশেভিক আন্দোলন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, প্রভাবিত হচ্ছেন। অনুশীলন সমিতির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা বহু বিপ্লবীই তখন মার্কসপন্থী হয়ে উঠেছেন। জ্যোতিষচন্দ্র অবশ্য মার্কসপন্থী ছিলেন না, তবে মার্কসীয় দর্শনে স্বনুপ্রাণিত। সমাজতন্ত্রের সাধনায় তাঁর অবস্থান ছিল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেই। শ্রমিক সংগঠনের রাজনীতিও তাঁর এই অবস্থান থেকেই।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন। ওই অধিবেশনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল, যার সঙ্গে ছিল জ্যোতিষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার আগে থেকেই জ্যোতিষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা এক পরিকল্পনা আঁটছিলেন, যার আঁচ আমরা পাচ্ছি 'স্বদেশী বাজার' কাগজের লেখাপত্র থেকেই। একটু আগেই জ্যোতিষচন্দ্রের যে প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছি, সে-প্রবন্ধেরই শেষাংশে অধ্যাপক ঘোষ লিখেছিলেন, 'আর দেড় মাস বাদে আমাদের কলকাতাতে কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশন হবে। যাদের দেশ তাদের সেখানে স্থান কোথায় তা এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই; কেবল সেদিন দিল্লীতে All India Congreess Committee-র অধিবেশনে স্বতন্ত্র সভা কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হয়ে কংগ্রেসের সনোনীত সভ্য পাঠালে তারা ডেলিগেট হতে পারবে এই মর্মে এক মন্তব্য সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ সে সভ্য-সংখ্যার অনুপাত নিরূপণ করা হয় নাই এবং কত দিনে যে তা কার্যে পরিণত হবে তাও আমাদের জানা নাই। কলিকাতার কংগ্রেসে যে দেশের স্বাধীন লোকমত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না এবং বিধিসঙ্গত উপায়ে এ জনমতকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আনা হয়েছে তা দূর করবার উপায় অচিরে উদ্ভাবন করা কর্তব্য কিনা তাও আমাদের বিবেচ্য। কংগ্রেস কমিটি আজ সব এমনভাবে সংঘবদ্ধ যে সেখানে যে দল প্রবল তাদের দলভুক্ত ছাড়া আর কারুর কংগ্রেসে প্রবেশ অধিকার নিষেধ। অথচ অন্য দলের মধ্যেও ত্যাগী অক্লান্ত কর্মী, নীতিবিৎ দেশসেবকের অভাব নাই। এরূপ অসামঞ্জস্যের মধ্যে যারা কংগ্রেসে ডেলিগেট হয়ে যেতে পারবে তাদের পক্ষে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু মন্তব্য গৃহীত করানো একরকম অসম্ভব বললেই হয়।...সেইজন্য আমাদের অনুরোধ যে, সারা বাংলাদেশ জুড়ে এবং সম্ভব

হলে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক-কর্মীদের এসোসিয়েশন (বা সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হোক—All Bengal বা All India Workers Assoociatin. তাদের স্বতন্ত্র দাবী ছাড়া তারা কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর স্বাধীনতা-সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মের সঙ্গে নিজদিগকে এক-পক্ষভুক্ত বলে ঘোষণা করুক এবং স্বতন্ত্র দাবী সম্বন্ধে উক্ত সংঘের সঙ্গে মীমাংসার জন্য কথাবার্তা শুরু করুক।'

মোদ্দা কথাটা ছিল এই যে জাতীয় মহাসভায় বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী মানুষেরা জড়ো হোক এবং মতামত বিনিময় করে লড়াইয়ের ভিৎ শক্ত করে তুলুক—এরকম এক আবহাওয়া তৈরি করা।

এই চিন্তা থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ কমিটিতে স্থির হয় যে, কলকাতা কংগ্রেসে প্রবেশ করার জন্য শ্রমিকদের এক বৃহৎ মিছিল পরিচালনা করা হবে শান্তিপূর্ণভাবে এবং শ্রমিকদের পক্ষে বক্তব্য পেশ করা হবে সে অধিবেশনে।

জ্যোতিষচন্দ্রের লেখা ছাড়াও কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রমিক মিছিল নিয়ে যাওয়ার লোমহর্ষক কাহিনীর কথা অনেকেই জানেন অন্য আরেক সূত্রে। তা হল, লিলুয়া রেলওয়ে কারখানাতে শ্রমিক ধর্মঘট বিফল হবার পর লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্ক শপ্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের চিন্তাভাবনার কথা। ওই ইউনিয়নের সভাপতি কিরণচন্দ্র মিত্র (জটাধারী বাবা), সম্পাদক দীনেশ রায়, শান্তিরাম মণ্ডল সহ বাইরের বামপন্থী শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজফফর আহমেদ, ফিলিপ স্প্রাট, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদের সিদ্ধান্ত হয় যে ২৮ হাজার শ্রমিকদের শোভাযাত্রা নিয়ে পার্কসার্কাস কংগ্রেস মণ্ডপের দিকে যাত্রা করা হবে ধর্মঘটীদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক স্মৃতিকথায় ('মাষ্টারমশায়কে যেমন দেখেছি'/ অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, জন্মশতবর্ষস্মরণিকা) লিখেছেন এই ঘটনার এক বিস্তৃত বিবরণ। এই রচনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন স্পষ্টতই যে শোভাযাত্রার পুরোভাগে 'যতীন বিশ্বাসের মোটরে চড়ে এলেন মাষ্টারমশাই। ......মিছিল যখন কংগ্রেস মণ্ডপের গেটে গিয়ে উপস্থিত হোল, দেখা গেল G. O. C. সুভাষচন্দ্র বসু ঘোড়ায় চড়ে প্রায় তিন চার শত ভলেন্টীয়ার বাহিনী নিয়ে গেট বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছেন। যতীন বিশ্বাস গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে উচ্চৈস্বরে বললেন, "গেট খুলে দিন, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এবং লিলুয়া ধর্মঘটী নেতরা ধর্মঘটীদের নিয়ে এসেছেন, কংগ্রেস প্যাণ্ডালে গিয়ে

মহাত্মাজী ও কংগ্রেস সভাপতিকে নিজেদের কথা নিবেদন করার জন্য এবং বক্তৃতা শোনার জন্য, আপনি দয়া করে গেট খুলে দিন।" সুভাষচন্দ্র চড়া সুরে বললেন, "বিনা টিকিটে কাউকে ঢুকতে দেব না, আর ধর্মঘটীরা দলবদ্ধ ভাবে ঢুকে যে কিছু বলবে, সেও হবে না, তবে তাঁরা প্রত্যেকে দর্শকের টিকিট কিনে কংগ্রেস দেখবার জন্য ভিতরে আসতে পারেন"। কিছুক্ষণ যতীন বিশ্বাস ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলল। সুভাষচন্দ্র গেট খুলতে রাজী হলেন না। যতীন বিশ্বাস ফিরে এসে মাষ্টারমশাইকে সব বললেন, আমরাও সব কথা শুনলাম। মাষ্টারমশাই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এখন কি করতে চাও'? সকলেই বললেন, 'আপনি আমাদের নেতা আপনি যা নির্দেশ দেবেন আমরা তাই করব'। মাষ্টারমশাই বললেন, আমরা ফিরে যাব না, আমরা জোর করে মণ্ডপের ভিতর ঢুকব।'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য শ্রমিক মিছিল জোর করেই ঢুকেছিল, অবশ্য ইতিমধ্যে খবর পেয়ে কংগ্রেসের মান্য নেতারা যেমন জহরলাল, মতিলাল নেহরুরা এসে মিছিলকে মণ্ডপের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাঁদের কথাও শুনেছিলেন।

এই বিবরণ পড়লে মনে হয় জ্যোতিষচন্দ্রের নেতৃত্বই ছিল এক্ষেত্রে প্রধান ও অবিসম্বাদিত। কিন্তু খটকা লাগে আমাদের এই ঘটনার অন্য আরেক বিবরণপাঠে। যে-বিবরণ দিয়েছেন একদা অনুশীলন দলের বিপ্লবী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কম্যুনিস্ট ধরনী গোস্বামী।

কারে তিনি বলেছেন, '…গেটের সম্মুখে যখন আমরা উপস্থিত হলাম এবং এই বিশ-তিরিশ হাজার শ্রমিক যখন উচ্চকণ্ঠে আকাশভেদী স্লোগান দিতে লাগল— 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে—ভেতরে যাঁরা ছিলেন— —একটা অতেঙ্কের সৃষ্টি হয় যে এরা তছনছ করে দেবে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সুভাষবাবু (সুভাষচন্দ্র বসু) তখন ছিলেন ভলেণ্টিয়ারদের সর্বোচ্চ অধিপতি যাকে বলে G. O. C…তিনি সেই ভলেণ্টিয়ারদের আদেশ দিলেন গেটে আটকে দেওয়ার জন্য। আমাদের অনুরোধ-উপরোধ কিছুই তাঁরা শুনতে চাইলেন না—ভলেণ্টিয়াররা। সুভাষবাবু নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগতভাবে এবং আরও অন্যান্যের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাতে হয় তো সেই ভুল ধারণা সেখানেই দূর হতো। কিন্তু কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার্সদের মধ্যে একদল ছিলেন উগ্রপন্থী অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন

আগেকার 'যুগান্তর' 'অনুশীলন' এই সমস্ত বিপ্লবী পার্টির নেতা। লাটি-সোটা নিয়ে বাধা দিতে গেলেন। তখন গেট ভেঙে শ্রমিকরা ভিতরে ঢুকে পড়েছে।'

তথ্যের একটা গরমিল এখানে স্পষ্ট সুভাষ বসুকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেটা প্রসঙ্গ নয়। ধরনী গোস্বামীর এই বয়ানে কোথাও জ্যোতিষচন্দ্রের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ নেই।

এই সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ধরণী গোস্বামী জানিয়েছেন যে মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষভাবে মণি সিং, গোপেন চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র, মণি মুখার্জী, কালী সেন, জটাধারী বাবা অর্থাৎ কিরণচন্দ্র মিত্র প্রমুখ। কোথাও জ্যোতিষচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন নি।

অবশ্য এই সাক্ষাৎকারে ধরণী গোস্বামী জ্যোতিষচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন নি বলে একথা প্রমাণ হয়ে যায় না যে, জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন না এই মিছিলের পুরোভাগে। তিনি ছিলেন অবশ্যই, তবে মিছিলের নেতৃত্বে তাঁর সঠিক ভূমিকাটি কী ছিল, তা খানিকটা অস্পষ্ট থেকে যায়, সেটুকুই আমাদের বক্তব্য।

বস্তুত এক সংক্ষিপ্ত আত্মস্মৃতিতে জ্যোতিষচন্দ্র নিজেই এই শোভাযাত্রা ও তাঁর নিজের ভূমিকা বিষয়ে এক বিবরণ দিয়েছেন সেটুকু উদ্ধার করেই এই নিবন্ধ শেষ করব। জ্যোতিষচন্দ্র লিখেছেন, এই শ্রমিক শোভাযাত্রার ওপর 'পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি করা হইতে আরম্ভ করিয়া কর্মী নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। অন্যপক্ষে কংগ্রেস শ্রমিকবাহিনীকে বাধা দিতে আসিয়া কতদূর অহিংস নীতি অবলম্বন করিবেন তাহাও জানা নাই,...এ অবস্থায় যাঁহারা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তাঁহাদেরই আগুয়ান হওয়া কর্তব্য। একজন বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা 'স্বদেশী বাজার' অফিসের তেতালায় নিজের সংসার লইয়া বাসা বাঁধিয়াছিলেন, তিনি শ্রমিকবাহিনী পরিচালার জন্য বাহির হইয়া যাইবার সময় সকলের ভার আমার উপর রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।' (আত্মপরিচয়/জ্যোতিষচন্দ্র রচনা-সংগ্রহ)

তাহলে বোঝা গেল শ্রমিকমিছিলে অংশগ্রহণ না করার পরামর্শই দেওয়া হয়েছিল জ্যোতিষচন্দ্রকে। কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সে-কথা মানেন নি, যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে অদ্ভুতভাবে। সে কাহিনীটা এরকম, 'এই ঘটনার তিন চারদিন পূর্বে শিখদের গুরুদ্বার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানরূপে সকলকে বিনা খরচায় প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমার পাঞ্জাবে অবস্থানকালীন আমি অনেক শিখ নেতাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং সেই সময় তাঁহাদের

সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হইবে, এই মনে করিয়া আমি শিখ গুরুদ্বারে উপস্থিত হইবার জন্য বাহির হইয়া নিরাপদে সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হই। কিছুক্ষণ তাঁহাদের গুরুদ্বারে উৎসবে, ভজনে যোগ দিই···সেখানে পাতা পাতিয়া সকলের সহিত বসিয়া ডাল, রুটি, তরকারী এবং কিছু হালুয়া খাই। খাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় শ্রমিকবাহিনী সেই গুরুদ্বারের সামনে আসিয়া হাজির হইল, Military Police (অশ্বারোহী) লাইন দিয়া ঐ বাহিনীকে দুইদিকে ঘিরিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সেই সীমানার ভিতরে আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা শৃঙ্খলার সহিত মজুরদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন, কোনরূপ গোলমাল হইলেই পুলিশ বাহিনীর পক্ষে তাহাতে হস্তক্ষেপ করার পথ সুগম হইয়াই আছে, অতি সহজেই সকলকেই গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। এমন সময় পুলিশবাহিনীর অলক্ষিতে এবং শিখ সর্দার ভাইদের পাছু হইতে সভাস্থলে বক্তৃতা দিবার জন্য ডাক উপেক্ষা করিয়া আমি শ্রমিক বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, আমাকে আটকানো অশ্বারোহী পুলিশের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমার যুবক শ্রমিক বন্ধুগণ আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে ভিতরে দেখিতে পাইয়া কী করা কর্তব্য ঠিক করিতে পারিলেন না, কেহ মানা করিবার অথবা আপত্তি তুলিবার পূর্বেই কাহাকেও কোন চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া 'আমি অতি অসুস্থ' এই অজুহাতে আমাকে মোটরের বসিবার সীটে বসাইয়া লইলেন। 'মোটরচালক বন্ধু'র দিক হইতেও কোন আপত্তি দিবার অবসর হয় নাই।······তাহার ফলে বাহিনীর শেষ দিকের পথটায় ভুল করিয়া আমাকেই নেতা হইয়া দেখা দিতে হইয়াছিল এবং আমার পরিচালনায় ও নেতৃত্বে ঐ শ্রমিক বাহিনী কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, ইহা প্রচার করিয়া দেশের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়······'।

শুধু এটুকুই নয়, এই আত্মস্মৃতিতে জ্যোতিষচন্দ্র আরও জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস শ্রমিক মিছিলকে সভামণ্ডপে ঢোকার অনুমতি না দিলে এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়। ব্যাপারটা অভ্যর্থনা সমিতির হাত থেকে হাইকম্যাণ্ডের হাতে যায় এবং '······দুইজন উচ্চস্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাতনামা দেশনায়ক আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। আমার কাছে দপ্তর নাই, আমাকে বন্ধু মোটরচালক কোন কথারই জবাব দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।······তাঁহারা এককথায় জিজ্ঞাসা করেন 'আপনার কী mandate?' আমিও নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলাম 'শ্রমিক বাহিনীকে কোনরূপ conditions না দিয়া প্রবেশাধিকার দিতে হইবে এবং ভারতীয় যুগমানবের

সামনে খানিক্ষণ দাঁড়াইতে দিতে হইবে'। বিনা বাক্যব্যয়ে দুইজন নামিয়া যান এবং আমার শেষ কথা মত বাঙলার High command-কে আদেশ দেন bugle দিয়া ভলাণ্টিয়ার বাহিনীকে সরাইয়া লওয়ার এবং শ্রমিক বাহিনীকে কংগ্রেসে ঢুকিতে দেওয়ার।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আগে থেকে ঠিক না থাকলেও জ্যোতিষচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্ব মিছিলে ঢুকে পড়ার পর তাঁকেই সর্বাগ্রগণ্য নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং সঠিকভাবেই তা হওয়ার কথা। অথচ ধরনী গোস্বামীর বিবরণ পড়লে এর আভাসও পাওয়া যায় না। এমন হওয়া স্বাভাবিক যে, বিশ-বাইশ হাজার মানুষের শোভাযাত্রার বিভিন্ন অংশের নেতৃত্ব ছিল বিভিন্ন নেতার কাঁধে। তা তো হবেই। কিন্তু পুরোভাগের নেতৃত্বের সঙ্গেই তো কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের মোকাবিলা হয়েছিল, বিবরণগুলির সেই অংশেই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, ধরনী গোস্বামী, জ্যোতিষচন্দ্রের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু অমিল দেখতে পাওয়া যায়। এই অমিল ঐতিহাসিক শ্রমিক শোভাযাত্রা বিষয়ে যে গুরুতর কোন সিদ্ধান্তগত ভুলের দিকে পাঠককে নিয়ে যায় তা নয়, তবে ইতিহাসচর্চায় অভ্রান্ত তথ্য খোঁজার তাগিদ কারুর থাকতে পারে—এই অনুমানে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা।

———

সেলুলার জেল

সংগ্রাম ঃ ভেতরে, বাইরে

(মুক্তিতীর্থ আন্দামান থেকে সংকলিত)

গনেশ ঘোষ

১৯২১ সাল থেকে, কিছু বাস্তব অসুবিধার কারণে বন্ধ রাখলেও ভারতের ব্রিটিশ সরকার প্রায় ১১ বছর পর ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের নির্বাসনের জন্য আবার আন্দামান তথা সেলুলার জেল খুলে দিলেন।

বিশের দশকের শেষার্দ্ধে বাংলা বা ভারতের অন্য কোন অংগ রাজ্যে, আর একটু ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে বলতে হয় যে ভারতের কোন প্রান্তেই সেরকম কোন বড়সড় আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। কিন্তু (সাইমন কমিশন গঠনের মাধ্যমে) বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্তে এবং লালা লাজপৎ রায়ের অকারণ হত্যার ঘটনায় ভারতবর্ষের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সংকল্পে ব্রতী হয়। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চট্টগ্রামে মাস্টারদার নেতৃত্বে সংগঠিত হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন। কলকাতায় ব্রিটিশ শাসকের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে পরিচিত রাইটার্স বিল্ডিং বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হল—এবং সেদিন ব্রিটিশ শাসকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল এই রাইটার্স বিল্ডিং।

দেশের চতুর্দিকে এমত অস্থির পরিস্থিতির সামাল দিতে শুরু হল ব্যাপক ধরপাকড়। আর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সমগ্র অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত তরুণদের নির্বাসনের জন্য খুলে দেওয়া হল আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেল।

এই পর্যায়ে প্রথম দলটিকে (মাত্র ২৩ জন) ১৯৩২-এর আগস্টের মাঝামাঝি আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই দলের বিভিন্নজন বিভিন্ন কেসে অভিযুক্ত ছিলেন—যেমন, মেছুয়াবাজার বোম কেস, বরিশাল পুলিশ হত্যার কেস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের কেস ইত্যাদি ইত্যাদি। অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, গনেশ ঘোষ এবং আরও ৯ জন অভিযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের মামলায়। মুকুল সেন ও নিশিকান্ত রায়চৌধুরী অভিযুক্ত ছিলেন মেছুয়াবাজার কেসের মামলায়। রমেশ চ্যাটার্জী অভিযুক্ত ছিলেন বরিশালে পুলিশ হত্যার মামলায়।

এই রমেশ চ্যাটার্জী সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, রমেশকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয় পরে উচ্চতর আদালত রমেশের অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করে—মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ জারী করে। 'এ' ছাড়া এই ২৩ জনের মধ্যে প্রবোধ রায় শিয়ালদহ ডাকাতি মামলায়, হরিপদ ভট্টাচার্য—আমানুল্লা হত্যার মামলায়, কালীপদ চক্রবর্তী চাঁদপুরে পুলিশ অফিসার হত্যার মামলায়, প্রবীর গোস্বামী ময়মনসিং অস্ত্র মামলায়, সুশীল দাসগুপ্ত পুটিয়া ডাকঘর ডাকাতির মামলায়, সুরেশ দাস কলকাতা হত্যা মামলায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কলিকাতা অস্ত্র মামলায়, বিমল দাসগুপ্ত পেডি হত্যার মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন।

যা হোক; ১৯৩২ সালের ১৮ই আগস্ট ২৩ জনের এই রাজনৈতিক বন্দীর দলটিকে সেলুলার জেলের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। কিন্তু জেলের ভেতরকার পরিবেশ ছিল অসহনীয়, অস্বাস্থ্যকর এবং বন্দীদের থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় এতই নগন্য ছিল যে, প্রথম দিন থেকেই বন্দীরা এই ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য একটা কিছু করার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। কারণ বন্দীরা সবাই বুঝতে পারছিল যে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেশীদিন থাকা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। কিন্তু যেহেতু তারা সংখ্যায় মাত্র ২৩ জন তাই তখনই কোন কিছু করা থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হল কেননা তারা ভালই জানত যে এই অল্প সংখ্যায় খুব বেশী কিছু করা সম্ভব নয়।

এরপর আরও কয়েকমাসের মধ্যে আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে সেলুলার জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়—এবং এভাবে যখন বন্দীদের সংখ্যা মোটামুটি একটা সংখ্যায় পৌঁছল তখন ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি সমস্ত বন্দীরা—জেলের অভ্যন্তরের পরিবেশের উন্নতির দাবীতে আমৃত্যু অনশন ধর্মঘটে সামিল হয়।

১৯৩৩-এর ১২-ই মে বন্দীদের তরফ থেকে এই অনশন ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষ তথা সরকার এই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্যে বন্দীদের জোর করে খাওয়ানো শুরু করে, ফলে ধর্মঘটের প্রথম তের দিনের মধ্যেই ৩ জন ধর্মঘটী প্রাণ হারান। সুদূর আন্দামানে নির্বাসিত দেশপ্রেমিকদের অনশন এবং ধর্মঘট এবং ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তিনজন দেশপ্রেমিকের মৃত্যুসংবাদ সারা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবধি এ-ঘটনায় বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং বন্দীদের উদ্দেশ্যে অনশন ধর্মঘট তুলে নেওয়ার এক আবেদনে বলেন "তোমাদের মাতৃভূমি তার প্রস্ফুটিত ফুলগুলিকে কখনও

ভুলবে না।" ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রগুলিও অনশন ধর্মঘট ও তিনজন দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু নিয়ে সরব হয়ে উঠল।

অবশেষে ধর্মঘটীদের দাবির কাছে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৩৩ এর ২৬শে জুন, ধর্মঘট শুরু থেকে ৪৬তম দিনে অনশন ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। ধর্মঘটিদের এই বিশাল জয় অর্জন করতে যদিও অনেক কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল—তথাপি এই জয়ের মূল্য এবং গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এই জয়ের ফলেই বসবাস করার জন্যে জেলের আভ্যন্তরিণ পরিবেশ উন্নয়ন এবং জেলের বন্দীদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধার দাবি অর্জিত হয়। অর্জিত দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ—

(১) জেলের বন্দীরা বই, সংবাদপত্র সহ অন্যান্য পত্র পত্রিকা কিনতে পারবেন এবং সরকারও বই পত্র সরবরাহ করবেন। বই বা পত্রপত্রিকাগুলি বন্দীরা একা একা অথবা দলগত ভাবে পড়তে পারবেন। এর ফলে বন্দীদের নিজেদের মধ্যে, বিতর্ক সভা, মিটিং এবং আলোচনার দ্বার প্রশস্ত হল।

(২) জেলের ভেতরে থেকে জেলের বাইরে অন্যত্র যোগাযোগের বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথিল করা হয়।

(৩) রাত্রিতে জেলের প্রত্যেক কুঠরিতে আলোর ব্যবস্থা করা হল।

(৪) অবসর বিনোদনের জন্য ইনডোর, আউটডোর খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা সহ গান বাজনা করার অধিকার, এমনকি অস্ত্রবিদ্যা অনুশীলন করার সুযোগও অর্জিত হয়।

(৫) জেলের ভেতরে কাজের সময়সীমা কমিয়ে আনা হল এবং কাজের পরিমাণও অনেক হাল্কা করা হয়।

পরবর্তী সময়ে একজন বন্দী এইসব অর্জিত সুযোগ সুবিধার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন "আগে কোন রকম সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ না থাকায় আমাদের জীবন যে রকম দুর্বিষহ ও অসহ্য হয়ে উঠেছিল—এই দাবিগুলি অর্জিত হওয়ায় আমরা সেই অসহ্য অমানবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ থেকে মুক্তি পেলাম। তখন থেকে আমরা দেশী-বিদেশী পত্র পত্রিকা কিনতে ও পড়তে পারতাম—শুধু এটুকুই নয়—সব মিলিয়ে একটা আমূল পরিবর্তন এল—এমনকি জেলের অফিসারদের আমাদের প্রতি এতদিনকার আচরণের মধ্যেও। জেলের অফিসারদের ব্যবহারে আর আমরা সৌন্দর্যের অভাব দেখতাম না। প্রাত্যহিক জীবনে পূর্বে যে অপমান আমাদেরকে সহ্য করতে হত, তা থেকে আমরা মুক্তি পেলাম।"

পড়াশুনা করা, আলোচনা সভা করার যে অধিকার অর্জিত হল তা ছিল জেলে বন্দীদের জীবনে এক চরম আশীর্বাদস্বরূপ। আমাদের মধ্যে অনেকেই—বন্দী জীবনের আগে ভালরকম পড়াশুনা করার সময় বা সুযোগ পাননি—তাঁরা সবাই জ্ঞানার্জনের এই সুযোগে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন এবং এই সময়ে বাস্তবিক ভাবেই সেলুলার জেল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পেল। এই জ্ঞানার্জনের কাজে কনিষ্ঠ, বয়স্ক সকলেরই ছিল সমান উৎসাহ। আসলে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব যে অপরিসীম এই উপলব্ধিটা সকলের মধ্যেই সমান ভাবে কাজ করেছিল—এবং সমস্ত বন্দীরা নিজেদেরকে আরও বেশী পড়াশুনা এবং সাংস্কৃতিক কাজে নিয়োজিত করল।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বছরের পর বছর কাটতে থাকল। বন্দীদের প্রধান কাজই ছিল আরও পড়াশুনা করা, পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা। এই সময়ে বন্দীরা ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা অবধি করেছিল। বন্দীদের মধ্যে শিক্ষিত চিকিৎসকরা, জীববিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান ইত্যাদি জানা বিষয়ে ক্লাশ নিতেন এবং বলাবাহুল্য সেই সমস্ত ক্লাশে ছাত্রের অভাব হত না।

এর মধ্যে বহু নূতন নূতন বন্দী আসতে থাকল আবার শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুরোন বন্দীদেরও দেশে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছিল। নূতন বন্দী যারা আসত তাদের কাছ থেকে আমরা দেশের মুক্তি সংগ্রামের গতি প্রকৃতি, ভারতীয় জনগনের বর্তমান দাবি দাওয়া, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে খোঁজ খবর পেতাম।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি অবধি মোট ৩৮১ জন বন্দীকে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ঐ সময়ের মধ্যেই শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ১৬৫ জনকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়। পরিসংখ্যানে এই ৩৮১ জন বন্দীর প্রদেশগত বিভাগটা দেখা যায় এইরকম ঃ—বাংলা থেকে ৩৩৯ জন, বিহার থেকে ১৯ জন, ১১ জন উত্তর প্রদেশ থেকে, ৫ জন আসাম থেকে, ৩ জন পাঞ্জাব থেকে—আর দিল্লী ও মাদ্রাজ থেকে ২ জন করে।

এই সময়ে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ১৯১৬ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সর্দার গুরুমুখ সিং। শ্রী সিংকে ১৯১৭ সালে একবার সেলুলার জেলে পাঠানো হয়েছিল—পরবর্তী কালে ১৯২০ সালে দেশে ফেরৎ পাঠানোর পর ইনি জেল ভেঙ্গে পালিয়ে যান। ১৯৩৬ সালে এঁকে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য সেলুলার

জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়। বাংলার নিখিল রঞ্জন গুহ রায় ইনিও ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য সেলুলায় জেলে নির্বাসিত হন। বন্দীদের মধ্যে একদিকে যেমন দিল্লীর ধনওয়ান্তারী ছিলেন তেমনি ভগৎ সিংয়ের সহযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত শিও ভার্মা, বিজয় সিনহা, জয়দেব কাপুর, বটুকেশ্বর দত্ত, ডাঃ গয়া প্রসাদ এবং কমলনাথ তেওয়ারীও ছিলেন। ছিলেন মেছুয়াবাজার মামলায় অভিযুক্ত সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুধাংশু দাসগুপ্ত এবং শচীন করগুপ্ত। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত অন্যান্য বন্দীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা ষড়যন্ত্র মামালায় অভিযুক্ত ডাঃ নারায়ন রায়, ডাঃ ভুপাল বোস। দক্ষিনেশ্বর বোমের মামলায় অভিযুক্ত অনন্ত চক্রবর্তী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী, এবং রাখাল দে। বিহারের যোগেন শকুল ও শ্যাম ভাটনার। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে গুলি চালনার দায়ে অভিযুক্ত নলিনী সুনীল দাস ও জগদানন্দ মুখার্জী। ওয়াটসনকে গুলি করার দায়ে অভিযুক্ত সুনীল চ্যাটার্জী, ব্রাহ্মনবেড়িয়া গুপ্তচর হত্যার দায়ে অভিযুক্ত বিরাজ দেব—ময়মনসিংহের খোকা রায়, চট্টগ্রামের সরোজ গুহ, কালী দেব, এবং মনি দত্ত, মাদারীপুরের সুরেন কর, হুগলীর সিরাজুল হক, বিনয় রায়, ভোলা রায় প্রমুখ।

বন্দীদের মধ্যে আবার অনেক বন্দী ছিলেন যাঁরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে উচ্চতর আদালত তাঁদের মৃত্যুদন্ড রদ করে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড সাজা দেয়। যেমন বাংলার গভর্নরকে হত্যার চেষ্টায় অভিযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, হিলি রেলষ্টেশন রেড করার দায়ে অভিযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, শরৎ বোস; পাটনায় পুলিশ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সুরথ নাথ ছানবে; বরিশালে পুলিশ ইন্সপেক্টর হত্যার মামলার আসামী রমেশ চ্যাটার্জী।

সেলুলার জেলের ভেতরে যা পত্র পত্রিকা পাওয়া যেত তা থেকেই জেলের অভ্যন্তরে বন্দীরা এটুকু বুঝতে পারছিল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর রাজনৈতিক আকাশে একটা কাল মেঘ দেখা দিয়েছে এবং অনতিবিলম্বেই হয়ত যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে কিছু আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কংগ্রেসের ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্বেও ১৯৩৫ এর সংস্কার আইন বলবৎ করা হয়েছে। অবশেষে গভর্নররা মন্ত্রিসভার কাজে নাক গলাবেনা এইরকম একটা প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ে ১১ টি প্রদেশের মধ্যে ৭ টিতে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। এ ছাড়া আসাম ও সিন্ধুপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে সহায়তা করেছে।

নির্বাচনে কংগ্রেসের এই জয়লাভ এবং ৭ টি প্রদেশে সরকার গঠন করার ঘটনা যেমন সারা ভারতে তেমনি আন্দামানে সেলুলার জেলে বন্দীদের মনেও একটা নোতুন আশার সঞ্চার করেছিল। তাঁরা এটাও বুঝেছিলেন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ যদি তাঁরা নিতে না পারেন তা হলে হয়ত তাঁদেরকে এই আন্দামানের মাটিতেই থেকে যেতে হবে এবং দেশে ফেরা তাঁদের কাছে এক স্বপ্নের ব্যাপারই হয়ে থাকবে।

নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েক প্রস্থ আলোচনার পর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও তাঁদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দু'জন প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই একই দাবীর প্রতিধ্বনি দিল্লী এ্যাসেম্বলীতে ও শোনা গেল এবং সংবাদপত্রগুলিও এই দাবীতে মুখর হয়ে ওঠে।...কিছু দিন পরেই দিল্লী এ্যাসেম্বলী থেকে আন্দামানে বন্দীদের মনোভাব বোঝার জন্য এবং বন্দীদের বসবাসেয় অবস্থা দেখে আসার জন্য দু'জন প্রতিনিধিকে আন্দামানে পাঠান হয়। এঁরা হলেন কংগ্রেসের রেইজাদা আনসারী আর মুসলীম লিগের ইয়ামিন খাঁন। বন্দীদের তরফ থেকে রেইজাদাকে গোপনে জানানো হল যে যদি সামনের দু'এক মাসের মধ্যে বন্দীদের দেশে ফেরানো সম্ভব না হয়— তাহলে তাঁদের মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসতে দেখা যাবে।

এদিকে জেলের ভেতর বন্দীদের মধ্যে দফায় দফায় আলোচনার পর সবাই একমত হল যে সরকারের কাছে (১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর (বিচারাধীন সমেত) আশু মুক্তি (২) আন্দামান থেকে সমস্ত বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদেরকে দ্বিতীয় ডিভিশন বন্দী হিসেবে চিহ্নিত করন—এই তিনটি দাবী করা হবে। এই তিনটি দাবীর মধ্যে শেষের দুটি দাবীর ব্যাপারে কোন কিন্তু থাকবে না অর্থাৎ এই দুটি দাবী না মানলে কোন মতেই বন্দীরা তাঁদের সম্ভাব্য সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসবেন না।

দেশের ভেতরেও বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বকে তিনটি দাবী ও সম্ভাব্য সংগ্রামের সূচী (অর্থাৎ অনশন ধর্মঘটের কথা) গোপনে জানানো হল।

জেলের ভেতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বন্দীদের নিয়ে সম্ভাব্য অনশন ধর্মঘট পরিচালনা করতে একটি কমিটিও গঠন করা হল।

ইতিমধ্যে অনশন ধর্মঘটের প্রাক্কালে যে সব বন্দী তাঁদের শাস্তির মেয়াদান্তে দেশে ফিরছেন তাঁদের হাতে ভার দেওয়া হল তাঁরা যেন দেশে ফিরে গিয়ে সমস্ত

বিচারাধীন বন্দীশালায় এবং জেলখানাতে—সেলুলার জেলের বন্দীদের দাবী সনদ ও দাবী আদায়ের পথে অনশনের সংগ্রামের কথা জানিয়ে দেয়।

সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। ধর্মঘটের ১৫ দিন পূর্বে ধর্মঘটীদের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সতর্কবানী পাঠানো হল। আবার ধর্মঘট শুরুর ২৪ ঘণ্টা পূর্বে আন্দামানে নিযুক্ত কমিশনারের কাছেও অনুরূপ সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হল—কিন্তু সতর্কবার্তায় কোন কাজের কাজ হল না। সরকার বাহাদুর একেবারে নীরব ও নির্বিকার রইলেন। যেন কিছুই হচ্ছে না। ফলত! ১৯৩৭-এর জুলাই-এর চতুর্থ সপ্তাহে শুরু হল সেলুলার জেলের ১৮৩ রাজনৈতিক বন্দীর আমৃত্যু অনশন। বন্দীরা তখন সংকল্পে অটল—প্রস্তাবিত দাবীসনদ থেকে কোন অবস্থাতেই সরে আসা হবে না—তার চেয়ে মৃত্যুও অনেক সম্মানের।

দু' তিন দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল সংবাদপত্র বেশ বড় বড় করে এই অনশন ধর্মঘটের খবর ছাপল এবং দিন পনেরর মধ্যে দেশের সমস্ত বন্দী শিবিরের (যেমন হিজলী, বক্সা, দেওলী) বন্দীরা এবং বহরমপুর, মেদিনীপুর, রাজশাহী, আলিপুর, প্রেসিডেন্সী এই সমস্ত জেলখানার বন্দীরাও আন্দামানের সেলুলার জেলের বন্দীদের অনশন ধর্মঘটের সমর্থনে অনশন ধর্মঘটে সামীল হল। ভারতবর্ষের সমস্ত ছাত্র ও যুব সংগঠন পথসভা ও বিক্ষোভের মাধ্যমে এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও আন্দামানে বিপ্লবীদের অনশন ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী পথসভা ও বিক্ষোভসভা সংগঠিত করার এক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করল। এমনকি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তাঁদের প্রাত্যাহিক কর্মসূচীর তালিকায় আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী জানানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করল।

১৯৩০ থেকে ৩২ অবধি সারা ভারতবর্ষে মুক্তি আন্দোলনের যে বন্যা বয়ে গিয়েছিল পরবর্ত্তী সময়ে সেই বন্যায় যেন কিছুটা ভাঁটার টান দেখা দিল—ঠিক এই রকম সময়েই ১৯৩৭ সালে সেলুলার জেলের বন্দীদের আমৃত্যু অনশন ধর্মঘট সমস্ত ভারতবাসীকে ভেতর থেকে নাড়া দিল—এবং এ ভাবে এই অনশন ধর্মঘট মুক্তি আন্দোলনে ভাঁটার টান ঘুচিয়ে আবার নতুন করে আন্দোলনের গাঙে যেন জোয়ার এনে দিল।

এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, অনশন ধর্মঘটকালে—সেলুলার জেলের সমস্ত বন্দীই—ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও—

ধর্মঘটের প্রতি এবং ধর্মঘটীদের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। সর্বমোট ২১৪ জন বন্দীর মধ্যে ১৮৩ জনের অনশনে অংশগ্রহণই সেই সাক্ষ্য বহন করে। সুধেন্দু দাস, শচীন চক্রবর্ত্তী এঁরা তো এঁদের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও যে ভাবে অনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা ভোলা যায় না। বাস্তবিক ভাবে যে কয়জন অনশনে অংশগ্রহণ করেনি তাঁরা নেতৃত্বের নির্দেশেই করেননি।

যা হোক ধর্মঘট যখন বেশ কিছুদিন গড়িয়েছে তখন দেশের নেতৃত্বের মধ্যে একটা আশংকার সৃষ্টি হয়—নেতাদের কাছ থেকে বন্দীদের কাছে অনশন ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পরামর্শ জানিয়ে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসতে থাকে। গান্ধীজী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউ বাদ রইলেন না টেলিগ্রামকারীদের তালিকায়। বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরাও টেলিগ্রাম পাঠালেন। অবশেষে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের তরফ থেকেও আন্দোলন তুলে নেওয়ার অনুরোধ আসে—এ ছাড়া বামদলভুক্ত মুজফ্ফর আহমেদ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জী এঁরাও টেলিগ্রাম পাঠালেন এই বলে যে আন্দোলনকারীদের দাবী শিগ্গীরই মেনে নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে—সুতরাং আন্দোলন এখনই প্রত্যাহৃত হোক্—।

এ সমস্ত টেলিগ্রাম থেকে একটা কথা সকলেরই মনে হল যে তাহলে তাঁদের দাবী পূরণ হতে যাচ্ছে। যাইহোক্ সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটা সভা ডাকার অনুমোদন চাওয়া হল এবং বলাবাহুল্য যে সেই অনুমোদন দিতে জেল কর্তৃপক্ষ ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলেন না। দীর্ঘ আলোচনার পর সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে অনশন ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং অনশন ধর্মঘট শুরু থেকে ঠিক ৪৫ দিনের মাথায় আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়।

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল সেপ্টেম্বর মাসে। আর ঐ মাসেই বাংলার ৫০ জন বন্দীসহ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজের বন্দীদের তাদের নিজেদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়। এইভাবে ১৯৩৮-এর ১৮ই জানুয়ারী তৃতীয় তথা শেষ দলটিকে দেশে পাঠানো হয়—ইতিমধ্যে বাংলার সমস্ত জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বিতীয় ডিভিশন বন্দী হিসেবেও গণ্য করার কাজও সারা হয়।

ব্যর্থ হয়নি

চম্পক দাস

(এক)

বর্তমান ভারতবর্ষের মানুষই শুধু নয়, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মানুষ আপনারা বিশ্বাস করুন। আমিও জন্মেছিলাম অভিভক্ত ভারতে। আমি আপনাদের সামনে সগর্বে ঘোষণা করছি—ব্যর্থ হয়নি ক্ষুদিরামের আত্মদান। আর ব্যর্থ হয়নি বলেই আমরা পেয়েছি কানাইলাল, সত্যেন বোস, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং, যতীন দাস, মাষ্টারদা সূর্য্যসেন, প্রীতিলতা, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ আরো অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত মাতৃমুক্তি বীর যোদ্ধা যাদের বীরত্ব গরিমায় ভারত উপমহাদেশ আজও গর্বিত। এঁরা কেহ কেহ আত্মাহুতি দিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু গলায় দিয়ে ; কেহ কেহ আত্মহত্যা করেছেন পটাসিয়াম সায়নাইডে, কেহ কেহ নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্রে, কেহ বা অনশন আন্দোলনে নিজেদেরকে নিঃশেষে মাতৃমুক্তিযুদ্ধে বিলিয়ে দিয়ে। সে একটা সময় ছিল, যখন তরুন যুবকরা কে কার আগে আত্মদান করবে তার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করত। কেন এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন ? কেন তরুন-যুবকরা মৃত্যু মহোৎসবে আত্মহুতি দেবার জন্য এত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—ক্ষুদিরাম বসুর নির্ভীক আত্মদান। বিপ্লবী কিশোর ক্ষুদিরাম বসুর আত্মদানের মধ্য দিয়ে ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নব নবীন সূর্যোদয়ের সূচনা হয়েছিল সেদিন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট। বলা চলে ক্ষুদিরাম বসু আত্মদানের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন জাতিকে সহসা জাগিয়ে তুলেছিলেন। একথা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে চিরদিনের সত্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থিরভাবে।

হ্যাঁ, জেগে উঠেছিল আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মদানের মহৎ প্রেরণায়। যার পরিনতিতে অনিবার্য্যভাবে সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট বিপ্লব এবং আজাদ হিন্দ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ। শুধু তাই নয়, আগষ্ট বিপ্লব এবং আজাদ হিন্দ সরকারের তাৎক্ষনিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত না হলেও এ কথা সত্য উপরোক্ত কারণের জন্যই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

(দুই)

৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনকে কেন আগষ্ট বিপ্লব আখ্যায়ভূষিত করেছে ঐতিহাসিকগণ, এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আগষ্ট বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলা দরকার তা হচ্ছে আন্দোলন কিংবা বিদ্রোহের আকারগত বিশালত্ব, ব্যাপ্তিসহ দেশের সাধারণ মানুষের বিরাট অংশের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়েই আন্দোলন এবং বিদ্রোহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিপ্লবে উপনীত হয়। সংক্ষেপে বলা চলে অনেক আন্দোলন এবং বিদ্রোহের সমষ্টিই হলো বিপ্লব। এইকারণেই ৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনকে ঐতিহাসিকগণ আগষ্ট বিপ্লব নামকরন করেছেন। অবিভক্ত বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অবিভক্ত পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলনে যে ভাবে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল, তা একাধারে যেমন আন্দোলনের পর্য্যায়ে থেমে থাকেনি অপরপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই আন্দোলনকে দমন করার প্রয়োজনে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল, এই উভয়ত কারণেই ৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনকে আগষ্ট বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যুক্তি যুক্তই হয়েছে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দেশের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যদি কোন আন্দোলন কিংবা বিদ্রোহ দেশের অভ্যন্তরে ব্যপকভাবে প্রসার লাভ করে তখনই তাকে বিপ্লব বলা হয়ে থাকে।

৪২ এর আগষ্ট বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক অন্য একটি ঘটনার কাহিনীও স্বাভাবিক কারণেই উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদিও সে কাহিনী বিপ্লব নয়। একটি স্বাধীন স্বীকৃত সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন যে সরকারের সর্বাধিনায়ক এবং রাষ্ট্রপতি ভারতীয় উপমহাদেশকে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিল আজাদ হিন্দ সরকার। এটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সীমারেখার বাইরে। কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেদিন আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে মণিপুর রাজ্যের ইমফল ও কোহিমায় প্রবেশ করে সেখানে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছিল। এবং সেখান থেকে সেই বাহিনীকে পিছু হটে যেতে হয়েছিল। তবে একথা সত্য, ঐতিহাসিক কারণেই সত্য যে, নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হলেও, স্বাধীনতার পথ তৈরী করে দিয়েছিল। এই কারণে অনেকে বলে থাকে দেশের অভ্যন্তরে ৪২ এর আগষ্ট বিপ্লব এবং বাইরে আজাদ হিন্দ সরকারের

সংগ্রামের মিলিত প্রয়াসের জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে।

(তিন)

আগষ্ট বিপ্লবের শুরু ১৯৪২ এর ৯ ই আগষ্ট থেকে ধরা হলেও, আমার মনে হয় এই বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল ১৯৪০ এর ১৯শে মার্চ সময় সীমা থেকে। এই সময় সুভাষচন্দ্র বিহারের রামগড়ে আপোষ বিরোধী সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকে সুভাষচন্দ্র সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়েছিলেন। এবং তখন থেকেই ভিতরে ভিতরে অনেকে ইংরেজকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিতাড়ন করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সে যাই হোকনা কেন, যেহেতু আগষ্ট বিপ্লবের সুবর্ণ-জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। আমি তাই বিশদভাবে আলোচনার অবতারণা ঘটাতে চাইছি না। সংক্ষেপে আগষ্ট বিপ্লবের ক্ষয় ক্ষতির সর্বভারতীয় পরিসংখ্যা তুলে আগষ্ট বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র কি ছিল তা জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করছি।

৮ ই আগষ্ট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুমোদন হয় 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব। অসহযোগ আন্দোলনের মন্ত্র—"ডু অর ডাই", "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। ৯ই আগষ্ট ভোর হবার আগেই দেশের সমস্ত অঞ্চলের কংগ্রেস নেতাদের ব্রিটিশ পুলিশ কারারুদ্ধ করে। সেদিন পলাতক নেতা শীলভদ্র যাজি ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন মহারাষ্ট্র অঞ্চলে। দেখতে দেখতে এই আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে দিকে প্রসারিত হয় কোথাও কোথাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষের নেতৃত্বে। যাদের সক্রিয় সংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পর্যুদস্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল তাঁরা হলেন—যানে গুরুজী, মুকুন্দলাল সরকার, আনসার হরবানি, হরিদাস মিত্র, নানা পাটিল, সিয়ারাম সিং, পরশুরাম সিং, ডঃ বি. সি. কেশকার, বি. এল. সুন্দররাও, পি. এস. চিন্নাদুরা, সতীশ চন্দ্র সামন্ত, মগনলাল বাগড়ি, শ্যামনারায়ন কাশ্মীরি, অরুনা আসফআলি, অচ্যুত পট্টবর্ধন, ডঃ রামমনোহর লোহিয়াসহ আরো অনেকে।

আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় হাজারিবাগ জেল ভেঙ্গে ফেরার জয়প্রকাশ

নারায়ন, রামনন্দন মিশ্র, যোগেন্দ্র শুক্ল, শালিগ্রাম সিং, আর. গুলোটি, গুপ্তা গোপন আস্তানায় ফিরে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগষ্ট বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হলো অনেক ক্ষেত্রে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষের সংগঠিত অংশগ্রহণসহ নেতৃত্ব দানে। এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অহিংসার পথে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও হিংসার পথেই বিপ্লব অনিবার্য্য ভাবেই পরিচালিত হয়েছিল। এই ঘটনার সত্যতা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে সহজেই অনুমেয়।—

(চার)

১৯৪২ এর আগষ্ট বিপ্লবের সময় সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশে যে সন্ত্রাস এবং সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল যার পরিণতিস্বরূপ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরকারের পরিসংখ্যান থেকে নিম্নলিখিত তথ্য উদঘাটিত হয়েছে ঃ—পুলিশ গুলিচালনা করেছে ৬০১ জায়গায়, মিলিটারী গুলি চালিয়েছে ৬৮ জায়গায়। মিলিটারী বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে ৫ জায়গায় এবং বোমাবর্ষণ করেছে ৬৬৪ বার। পুলিশের গুলিচালনা এবং অত্যাচারে নিহত হয়েছে ৮২৬ জন এবং আহতের সংখ্যা ৩৯৫৩ জন। মিলিটারীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা ২৯৭ জন এবং আহতের সংখ্যা ২৩৮ জন। মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১,৫০,০০০ জন। মোট পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হয়েছে ৯০·০৭ লক্ষ টাকা।

বেসরকারী পরিসংখ্যান পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মতে আগষ্ট বিপ্লবে মোট নিহতের সংখ্যা ১০,০০০ জন। গ্রেপ্তার হয়েছে ৬০,২২৯ জন। এদের মধ্যে শাস্তি পেয়েছে ২৬,০০০ জন এবং বিনাবিচারে আটক ছিল ১৮,০০০ জন।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারী সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ ঃ আগষ্ট বিপ্লবের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ২৫০ টি রেলষ্টেশনের ক্ষতি করা হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় ৮০০ টি ডাকঘর। টেলিগ্রাফের তার কাটা হয় ৩৫০০ জায়গায়। ধ্বংস করা হয় ৭০০ টি থানা এবং ৮৫ টি সরকারী ভবন।

পাশাপাশি চলেছে পুলিশ মিলিটারীর নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা এবং বর্বরোচিত নারকীয় অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম জুড়ে চলেছে নির্বিচার গণহত্যা।

কিন্তু কোন অত্যাচার নির্য্যাতনই পারেনি সেদিন আন্দোলনের পথ থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। এই সময় সাতারা, মেদিনীপুর

বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন সরকার গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি ছিল একশ্রেণীর ভারতীয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করার মধ্য দিয়ে বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা পালন। কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেই আগষ্ট বিপ্লবের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। এই ব্যর্থ না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ—আগষ্ট বিপ্লব ভারতীয়
ব্যর্থ হয়নি। এই ব্যর্থ না হওয়ায় অন্যতম প্রধান কারণ আগস্ট বিপ্লব ভারতীয়
উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তপোক্ত শাসনের ভিত্তিমূলকে সবলে ধাক্কা দিয়ে শাসনকে নড়বড়ে করে তুলেছিল। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মনে সৃষ্টি করেছিল গভীর ত্রাস।

(পাঁচ)

পরিশেষে ৪২-এর বিপ্লবে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান সম্পর্কে সামান্য তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আলোচনায় ছেদ টেনে দিচ্ছি। সেই সময়ে আন্দোলনের কর্মপন্থা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনসহ গৃহিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভূমিকা আশানুরূপ ছিল না। এর অন্যতম প্রধান কারণ কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বের গ্রেপ্তার বরণ। একমাত্র কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি, শ্রীগুরু সংঘ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ডব্লক এবং বিপ্লবী সমাজবাদী দল, বেঙ্গল ভলান্টিয়াস। এই সমস্ত দলেরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কোথাও কোথাও কোন দলের সাহায্য ছাড়াই সাধারণ মানুষের নেতৃত্বেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। এই কারণে অনেকের মতে আগষ্ট বিপ্লব ছিল নেতৃত্বহীন। সামগ্রিক-ভাবে না হলেও আংশিকভাবে এ মন্তব্য সত্য।

সর্বোপরি আগস্ট বিপ্লব সম্পর্কে বলা চলে যা, তা হচ্ছে ৪২-এর আগস্ট বিপ্লব ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ মানুষের যে জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল তা অভূতপূর্ব।

"হে বীর পূর্ণ কর"

সুনীল পাল

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পণ্ডিত নেহেরু আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানকার গণ্যমান্যরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, গান্ধীজীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিষ কি? তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন, হয়ত শান্তির দূত-টুত এই রকম কিছু মাহাত্ম্যের কথা বলবেন। পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন—"অকুতোভয়তা"।

অশেষ শক্তি সম্পন্ন না হলে অহিংসা জীবনে পালন করা যায় না। অহিংসা বীরের ধর্ম। শক্তির সঙ্গে যদি ত্যাগ, প্রেম, ক্ষমা এইসব মনুষ্যগুণ জড়িত না থাকে সেই শক্তি সম্পন্ন মানুষ বীর হয় না। গুণ্ডা হয়, পরলোভী হয়, লুণ্ঠন করে রাজ্য জয় করে। কেউ আলেকজাণ্ডার হয়। চেঙ্গিস্ হয়, বাবর হয়, নেপোলিয়ন হয়, রাজা হয়, সম্রাট হয়। এইসব ইতিহাস নিয়ে সাধারণ মানুষ আর গৌরব বোধ করে না।

দেশে-দেশে সাধারণ মানুষ জাগছে। একদিন সব দেশে সবাই জাগবে। এই জাগরণের কথা যারা বলে যায়, যারা নিঃশেষে আত্মবলি দেয় তারা সবাই বীর, তারা সবাই অহিংস, সবাই মনে প্রানে অকুতোভয়।

কোন্ কাল থেকে কথাটা আমরা শুনে আসছি—অহিংসা পরম ধর্ম। কিন্তু জীবনে আমরা তা মানি না। আমরা মানুষ হলেও আমাদের জীবন বড় ছোট, কোনো বড় জিনিষ আমাদের মধ্যে টেঁকে না। দেখতে কত সুন্দর—কুকুরের মত পরস্পর কত ভাব, কত গা চাটা-চাটি। আমরা মৈত্রী করি, কালচার করি, কত মাখা-মাখি। যেই আঁস্তাকুড়ে উচ্ছিষ্ট পড়ে অমনি খেয়োখেয়ি, কামড়া-কামড়ি। সব ভাব ভালবাসা নিমেষে হয় শত্রুতা। অসহায়ের জীবন আমাদের, তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়, একটু অন্নর জন্য এত হিংসা। সমাজে অন্নর শান্তি ফিরে না এলে অহিংসা সম্ভব নয়।

পরিপূর্ণ মানুষের মূল লক্ষ্য সত্য। অহিংসা জীবন-যাপনের একটা প্রণালী মাত্র। অহিংসা, সাম্য এসব খুব কাছের জিনিষ, পিঠো-পিঠি আদর্শ। প্রেম-ভালবাসার একটা জীবন-চর্য্যা, অল্পে তুষ্ট হওয়ায় এবং "প্লেন-লিভিঙ, হাই-

থিঙ্কিংকে" জীবনে গ্রহণ করবার সভ্যতা। এই ভাব নিয়ে জীবন ও সমাজকে পরিচালনার কথা ভাবতে হবে।

সত্য নিয়ে আমাদের মনে কোন প্রশ্ন নেই। সত্য সম্বন্ধে আমরা সবাই শ্রদ্ধাশীল। জীবনে সত্য পালন করতে না পারলেও আমরা মিথ্যাকে কখনো বড় বলি না। এখনো চক্ষুলজ্জা আছে। কিন্তু অহিংসার প্রতি আমাদের আস্থা নেই, যেন অহিংসা একটা বাতুলতা। তবে কি, হিংসাই বড় অহিংসার চেয়ে। তবে কি, মিথ্যাই বড় সত্যের চেয়ে। কোন মহৎ আদর্শকে আমরা জীবন দিয়ে ছুঁতে পারি না। সাম্য নয়, অহিংসা নয়, আমরা কাররই নাগাল পাই না, এ আমাদের দীনতা। সত্য, অহিংসা, সাম্য, আমরা যে-যতটুকু পালন করতে পারি, ততটুকু চেষ্টাই আমাদের মানুষ হবার চেষ্টা সবই towards, শুধু লক্ষ্যর অভিমুখে চলা। যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হই। শুধু অভিমুখে।

এই আত্মসুখের সংসারে, চোরাধন বেশী পাব বলে আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে, হিংসা দিয়ে অহিংসাকে আড়াল করি। সত্য, অহিংসা এসব নিছক ভাল মানুষি ছাড়া আর এর কোম সামাজিক মূল্য নেই। কপটতা আমাদের জীবন যাপনের সিস্টেম। এই সিস্টেম, এই শঠতা ভাল নয়। এই কথা যারা বলে যায় তারা অহিংসার কথাই বলে। যীশুখ্রীষ্টের কথা বলি, এক পতিতাকে তিনি কোল দিলেন। এক বেশ্যাকে ঘিরে ধরেছে ক্রুদ্ধ লোকেরা, হাতে তাদের ঢেলা, সে পাপী, তাকে ঢিল মেরে, পাথর মেরে, মেরে ফেলবে। সেখানে যীশুখ্রীষ্ট উপস্থিত হলেন। তিনিও এই উচিত কর্মকে সমর্থন করলেন, শুধু বললেন— "প্রথম পাথরটা সেই ছোঁড় যে জীবনে কোন পাপ করনি।" সকলকার বিবেক চমকে উঠল। হাত গুটিয়ে গেল। আর পাথর ছোঁড়া হল না।

হিংসা বৃত্তিকে প্রশমিত ও প্রতিরোধ করবার জন্য যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, "এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও।" নির্ভয়ে যে গাল পেতে দেয় তাকে চড় মারবার সাহস পাবে কে। ভয়শূন্য হলে তবে হিংসাকে জয় করা যায়। নইলে একদল কেবল চড় মারবে আর একদল অসহায়ের মত গাল পেতে থাকবে এটা অহিংসার শিক্ষা নয়। সমাজের কোন নীতি কারুর কারুর জন্য নয়। প্রত্যেকের জন্য, এক নিয়ম, এক শাসন। আমিও সত্য বলব, তুমিও সত্য বলবে, আমিও মিথ্যা বলব না, তুমিও মিথ্যা বলবে না। প্রতিটি মানুষ যদি গাল পাততে শেখে চড় মারবার লোক সমাজে থাকবে কোথায়। শক্তি কম বেশী বলেই

কেউ চড় মারে, কেউ চড় খায়। সমাজে যদি সাম্য থাকত, কেউ কাউকে চড় মারত না, আর কেনই বা মারবে।

এ যুগে আমাদের দেশে অহিংসা রূপ পেয়েছে গান্ধীজীর জীবনে। আমাদের অনুন্নত সমাজের পশ্চাতগামিতা দূর করবার জন্য ধৈর্যসহকারে অহিংস আচার আচরণের প্রয়োগ করেছেন, মানুষের মনকে উন্নততর করবার জন্য তিনি আমরণ এজিটেশন বা আন্দোলন করেছেন। অহিংসা পদ্ধতির পরীক্ষা জগতে অন্যত্রও হয়েছে। এক সময় চোর-ডাকাত-দুষ্কৃতিদের হিংস্র শাসনে সাজা দেওয়া হত। এখন অনেক ক্ষেত্রে তাদের অন্যভাবে শাসন করা হয়। পরিবেশ পরিবর্তন এবং তাদের শোধন করে ভদ্র জীবন যাপনের শিক্ষা দেওয়া হয়। মার-ধোর না করে তাদের মন নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এ-ও অহিংসার প্রয়োগ।

মারের বিরুদ্ধে মার, ছলের বিরুদ্ধে ছল, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, এতে কোন সুফল মানুষ পায়নি। বরং জীবনযাত্রা জটিল ও বিকল হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীই প্রথম সাধারণের সমাজজীবনে অহিংসা প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন।

আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা তাঁর যে অহিংসা দেখেছি বা শুনি, সে একটা পলিসি। গান্ধীজী অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হিংস্র। ইংরেজের সুখের রাজত্বকে ভারতছাড়া করে তবে ছাড়লেন। নন্‌কোঅপারেশন, নন্‌ভায়োলেন্স, প্যাসিভ্‌ রেজিস্টেন্স, সবই যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্রের অস্ত্র। অহিংসার দীক্ষায় সঙ্ঘশক্তি বাড়ালেন, ভারতবর্ষকে জাগালেন।

এক ধরণের যুদ্ধে মাও-সে-তুঙ্‌ নির্দেশ দিলেন "offence is the best defence", আর এক ধরণের যুদ্ধে গান্ধীজী হাঁকলেন "মরব তবু মারব না"। জীবন-যুদ্ধে এ একটা নতুন আহ্বান। তবু, মানুষের সংসার যুদ্ধক্ষেত্র কেন হবে। এটা ভুল প্ররোচনা। জীবন পালনের জন্য প্রতিটি মানুষ অবশ্য পরিশ্রম করবে কিন্তু আজকের মত এভাবে স্ট্রাগ্‌ল করে মরবে কেন? আমরা মুখে বলি ভ্রাতৃত্ব, কিন্তু অন্ন নিয়ে কি বিরোধ, কি বিদ্বেষ কি কাড়াকাড়ি!

সভ্যতার নামে সংসারের জাঁক-জমক যত বাড়ছে, বিরোধ তত প্রকট হচ্ছে। যত ভোগ বাড়বে, আত্মসুখ বাড়বে, সাধারণ মানুষ তত পরিত্যক্ত হবে। সমাজে এক সঙ্গে থাকতে শেখা একটা আর্ট। যদি একসঙ্গে থাকা কাম্য হয় ভোগের আদর্শ কমাতে হবে। Practice চাই। কম বাসনার উপর, কম লিপ্সার উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। "দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার তাহার ঐশ্বর্য যত"। যদি স্বেচ্ছায় সবাই কম-কম ভোগ করি তবেই সবাই সমান ভাগ পাব। এই প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের আর একটা কথা বড় মনে পড়ে। কোথায় পড়েছি মনে নেই। কিন্তু ভাবটা ভুলিনি যে,—যখন আমরা নির্বিশেষে একসঙ্গে বসে খেতে চেয়েছিলাম। আমরা তখন কলাপাতায় সন্তুষ্ট ছিলাম। এখন বাছাইকরা দুদশ জনকে আপ্যায়ন করি, টেবিল-চেয়ার, কাটাচামচে ইত্যাদির আড়ম্বর করি। এই জাহির করা আড়ম্বর দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিঙ নয়। সব লোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ে যে-ভাবনা নয়, সেটা শুধু সভ্যতার চাকচিক্য পণ্য-ব্যবসায়ীর হয়ে দালালী।

সমাজের সকলের মনে সাহস যোগাতে হবে, বল যোগাতে হবে মুখে অন্ন যোগাতে হবে। বলহীনের দ্বারা কোন বড় জিনিষ লভ্য নয়। কোন আদর্শই টিঁকবে না। ষড় রিপুর মধ্যে সব চেয়ে প্রবলতম রিপু লোভ। অহিংসার আড়াল যাদের সবচেয়ে প্রয়োজন সেই ঠিক-ঠিক লোকেরাই অহিংসাকে আগে বেছে নিয়েছে, তারাই বলছে, অহিংসা পরমধর্ম, তারাই বলছে সত্যমেব জয়তে, তারাই পিঁপড়ের গর্তয় চিনি দেয়, আর কলকারখানায় যন্ত্রাবিছিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে শুষে নিয়ে হাড় বার করে দেয়।

ইম্পিরিয়ালিজমের পর ক্যাপিটালইজম যে অবধারিত, আমাদের যে ব্যবসাদারদের হাতে মরতে হবে। এ বুঝে প্রতিকারকল্পে গান্ধীজী গ্রাম্য সমাজকে মোটা ভাত-কাপড়ে স্বয়ংনির্ভর রাখবার মানসে খাদি, সমবায় প্রভৃতি প্রচলনের প্যারালাল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। একটা নির্লোভ জীবন-চর্য্যার সামাজিক পথ নির্ণয় করেছিলেন।

তাই, আমাদের গভর্ণমেণ্ট থেকে গান্ধীজী ধুয়ে 'মুছে' নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। তাই আজ ব্যবসাদররা সারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে দেশে দেশে মন্ত্রীদের বসিয়ে।

হিংসা, অহিংসা এ সব অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির রূপভেদ, প্রকাশভেদ মাত্র। আসলকথা অভি, ভয়শূন্যতা। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, তার মূল কথা এই যে, অহিংসা মুণি, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসীর ধর্ম। অহিংসা বলে,—প্রকৃতিতে যা চলছে তাই চলবে। সেখানে প্রতিকারের ইচ্ছা পর্যন্ত থাকবে না। তোরা গৃহস্থ, তোরা পারবি কেন অহিংসাকে সামলাতে, এক চড় মারলে চার চড় ফিরিয়ে দিবি। আর বললেন—"I never speak of revange, I always speak of strength"। এ অহিংসার আর এক মন্ত্র আর এক উদ্দীপনা। গাল পেতেই দাও বা চড় ফিরিয়েই দাও মূল কথা strength, অভি, অকুতোময়তা।

ষড়যন্ত্র মামলা

শ্রী জীবনকৃষ্ণ মাইতি

(রাজবন্দী)

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ (গীতা ৪।১৩) **গুণের উপর** জাতি নির্দেশ অনুসরণ না করে **কাজের উপর** জাতি প্রথা অনুসৃত হওয়ায় দ্যুলোকে ভূলোকে হিংসা-দ্বেষ-দলাদলি-মারামারি-কাটাকাটির সুযোগে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়।

আবার বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের সুযোগে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে **লর্ড ক্লাইভ** বিনাযুদ্ধে ভারতে বৃটিশ রাজত্ব স্থাপন করেন।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, লাভের জন্য, পাওয়ার জন্য—(১) ১৭৭৪ সালে খাসি বিদ্রোহ (২) ১৭৬০-১৭৮০ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (৩) ১৭৬০-১৮০০ চুয়ার্ড বিদ্রোহ (৪) ১৭৭২ পাহাড়ী বিদ্রোহ (৬) ১৭৭৮ নাগা বিদ্রোহ (৬) ১৭৮৯-১৭৯৯ মুণ্ডা বিদ্রোহ (৭) ১৮১২-১৮১৭-১৮১৯ মুণ্ডা বিদ্রোহ (৮) ১৮৩১ সিংভূমে 'হো' বিদ্রোহ (৯) ১৮৩৬ কেরালা মালাবারে মোপালা কৃষক বিদ্রোহ (১০) ১৮৪৬ খন্দবিদ্রোহ (১১) ১৮৫৫ সাঁওতাল বিদ্রোহ (১২) ১৮৫৭-৬০ নীল বিদ্রোহ-নেতা দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুপদ বিশ্বাস (১৩) ১৮৫৭ সালে পাবনা কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি উত্থান ঘটে।

এবার এল **ব্যাপক সিপাহী বিদ্রোহ**—১৮৫৭ সালে (১) বারাকপুরে মঙ্গলপাঁড়ের ফাঁসি ও মেদিনীপুর শহরের স্কুল মাঠে এক তেওয়ারী ব্রাহ্মণের ফাঁসি হল (২) কানপুরে (৩) যুক্তপ্রদেশে (৪) সাঁতারায় (৫) নাগপুরে (৬) সম্বলপুরে (৭) দিল্লীতে ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ এর যুদ্ধে জীবন দান (৮) অযোধ্যা (৯) কর্ণাটক (১০) তাঞ্জোর (১১) বেরার-বিহারে কণওয়াল সিং (১৩) জৌনপুরে নানাসাহেব নেপালে পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা (১৪) তাঁতিয়া টোপী (১৫) এবং নবাবগণ গদিচ্যুত হয়ে পৃথকভাবে যুদ্ধ করে ত্যাগ স্বীকার করে কত মরেছেন, কত অত্যাচার সহ্য করেছেন—পরাজিত হয়ে শাসকদের নীতি স্বীকার করেছেন।

এবার ৪।৩।১৮৫৮ তারিখে সিপাহী বিদ্রোহী ২০০ জন আন্দামানে প্রেরিত হয়েছেন এবং সিপাহী বিদ্রোহে যুক্ত থাকায় শেষ মুসলমান সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছেন।

আবার অন্যদিকে ১৮১২-১৮১৪ জেনারেল ডেভিড অকটারলোনী নেপাল যুদ্ধে জয়লাভ করায় কলকাতায় গড়ের মাঠে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৫২ ফুট উঁচু **'অকটরলোনী মনুমেন্ট'** স্থাপিত হয়েছে। (প্রকাশ থাকে যে ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট দ্বিতীয়বার জয়লাভ করায় পূর্তমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী ইহার নাম দিয়াছেন—**"শহীদ মিনার"**।)

২৭।৮।১৯১৪ তারিখে কর্তার সিং এর নেতৃত্বে আমেরিকা থেকে **কামাগাটামারু** জাহাজে স্বাধীনতাকামীগণ বজবজে নামবার জন্য ১৭৭ জন গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অবশিষ্ট বন্দী হয়ে দ্বীপান্তরিত এবং কারারুদ্ধ হলেন।

১৮৯৭ (১৩০৪) খ্রীষ্টাব্দে মিঃ র‍্যাণ্ড এবং লে আষ্টারের হত্যায় বোম্বাইএ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়েব ফাঁসি হইলে কলকাতায় **রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয়ের বাড়ীতে **আত্মোন্নতি সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সমিতিতে শ্রীঅরবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী এবং সন্ত্রাসবাদীর দল প্রায় সকলেই যোগদান করেন।

১৯০৭।১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে বালক সুশীল সেন **"বন্দেমাতরম"** দেওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে পনর ঘা বেত্রদণ্ড খেয়ে অজ্ঞান হইয়া যাইলে সন্ত্রাসবাদীরা কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করিতেছে জানিতে পারিয়া তাহাকে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অধীন মজঃফরপুর ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত করেন। মেদিনীপুরের সন্ত্রাসবাদী নেতা শহীদ সত্যেন্দ্র নাথ বসু বালক ক্ষুদিরামকে হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর তৈরী বোমা এবং মুরারিপুকুর রোডের সন্ত্রাসবাদী নেতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রফুল্লচাকিকে রিভলবার এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ২৭।৪।১৯০৮ তারিখে নানা উপদেশ দিয়া উভয়কে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন। তাঁরা ২৮ এবং ২৯ তারিখে লক্ষ্য করিলেন কিংসফোর্ড সাহেব টেনিস খেলিয়া এক বিশেষ ফিটন গাড়ীতে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজ কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসেন। ৩০।৪।১৯০৮ তারিখে ঐ ফিটন গাড়ীতে পড়ল বোমা। দুর্ভাগ্য ঐদিন সেই ফিটন গাড়ীতে ছিলেন মিস কেনেডি মিসেস-কেনেডি। তাঁরা নিহত হলেন। অন্ধকারে গা ঢাকা

দিলেন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল। ৯নং (কলকাতা) সার্পেনটাইন লেন নিবাসী নন্দলাল ব্যানার্জী সি আই ডি ১।৫।১৯০৮ তারিখে সকালে 'উইনি' নামক স্থানে ক্ষুদিরামকে ধরে ফেললেন। প্রফুল্ল ধরা পড়বার পূর্বে মোকামা ঘাট ষ্টেশনের নিকট মুখের ভিতর রিভলবারের মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রিগার টিপে মাথা উড়িয়ে দিয়ে জগৎ থেকে চলে গেলেন। ১১।৮।১৯০৮ তারিখে মজফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল এবং গণ্ডক নদীতীরে নশ্বর দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল। স্বাধীনতা লাভে ভারতের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চলে গেলেন এবং কয়েকদিন পরে সন্ত্রাসবাদীরা ৯নং সার্পেনটাইল লেনে নন্দলাল ব্যানর্জীকে জগৎ থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁদের সন্ত্রাসনীতি অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

১৯০৮ মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা

আসামী —১৫৪

নরেন্দ্রলাল খান, উপেন্দ্র নাথ মাইতি, দেবদাস করণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু দিগর। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আলিপুর বোম কেসে আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হয় দ্রষ্টব্য—স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরে

১৯০৮ আলিপুর বোম কেস

আসামী—৩৪+২=৩৬ (৩৬)

সেশন জজ—বীচক্রুফ্ট—বিচার শেষ হয় ৬।৫।১৯০৯। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার অপরাধে (জেলের মধ্যে) এবং অন্যান্য অপরাধে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ২১/১১/১৯০৮ তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ১০/১১/১৯০৯ তারিখে কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়।

(১) মুক্তি পায়— ২২ জন (শ্রীঅরবিন্দ সহ)।
(২) জেল হয়— ৫ জন।
(৩) ফাঁসি হয়— ২ জন।
(৪) দ্বীপান্তর হয়— ৭ জন আন্দামান সেলুলার জেলে।

---

৩৬ জন

দ্বীপান্তর—(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো),
(৩) উল্লাস করদত্ত, (৪) হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল,
(৫) অবিনাশ ভট্টাচার্য, (৬) ইন্দুভূষণ রায়,
(৭) বিভূতিভূষণ সরকার।

কানাইলাল দত্ত—জন্ম ১৮৮৭ চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ছাত্র। মানিকতলা মুরারিপুকুর রোডে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে একসঙ্গে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ১০/১১/১৯০৯ তারিখে ফাঁসি হয়।

কৌঁসুলি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—ব্যারিস্টার জুরী সম্বোধনে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, prophet of nationalism, lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echced and re-echced not only in India, but across the distant seas and lands.

দ্রষ্টব্য—১ম খন্ড আত্মচরিত। চয়নিকা ডাইরী

১৯০৭-১৯০৯ নারায়নগড় বোমার মামলা

মেদিনীপুর বিভাগ বন্টন সমর্থক বাংলার ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন—নারায়নগড় ষ্টেশনের অনতিদূরে ট্রেন লাইনের নীচে উল্টোভাবে সন্ত্রাসবাদীদের রক্ষিত বোমা বিদীর্ণ না হওয়ায় নির্বিবাদে লাইন পার হয়ে চলে আসে। বিষয়টি ধরা পড়ে। ৭৮ জন কুলীকে আসামী করিয়া মোকদ্দমা চলে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের (ব্যারিস্টার) জুরী সম্বোধন ঐতিহাসিক রেকর্ডেড হয়। আসামীদের জেল দ্বীপান্তর, কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপে সকলেই মুক্ত হয়। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করার অপরাধে ১৯/৩/১৯০৯ তারিখে চারুচন্দ্র বসুর ফাঁসি হয় ও শ্যামসুল আলমকে হত্যা করা হয়।

১৯০৮—নাগলা ষড়যন্ত্র মামলা

অনুশীলন সমিতি—কাসুন্দিয়া যশোহর

১৮/৪/১৯০৮ অশ্বিনীকুমার বসুর দ্বীপান্তর।

১৯০৯ হাওড়া গ্যাং কেস

Emperor vs. Nani Gopal Gupta tors.

বাঘা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ধরা পড়েন—প্রমাণ অভাবে মুক্ত।

প্রকাশ পাঞ্জাব অধিবাসী মদনলাল ধিংড়া ভারত সচিবের রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতা উইলিয়ম কার্জনকে গুলি করিলে লণ্ডনে ফাঁসি হয়।

১৯১৪—১৭/১২/১৯১৪

হিসার জেলার পাপলি গ্রামে বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্যের জন্য গান্ধী সিং ডাকাতি করেন। ধরা পড়ায় ১৭/১২/১৯১৪—তারিখে পণ্ডিত কাশীরাম ও অনুচরের ফাঁসি হয়।

১৯১৬—লাহোর রাজদ্রোহিতা মামলা।

৩০/৪/১৯১৫—নেতা ভাইপারা এবং ২৩ জনের ফাঁসি হয় এবং ২৭ জন. দ্বীপান্তরিত হয়।

১৯১২ দিল্লীর দরবার

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ হইতে কলকাতায় রাজধানী আনয়ন করেন। ১২/১২/১৯১২ তারিখে কলকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ২৩/১২/১৯১২ তারিখে শোভাযাত্রায় ভাইসয়ার লর্ড হার্ডিঞ্জের গাড়ীতে দেরাদুন উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত **রাসবিহারী বসুর** নির্দেশে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বসন্ত বিশ্বাস বোমা ছুড়েন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বেঁচে যান। ১১/৫/১৯১৫ তারিখে আম্বালা জেলে ২০ বছর বয়সে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁস হয় এবং ১২/৫/১৯১৫ তারিখে তিনি (রাসবিহারী বসু) কবি গুরুর জাপান যাত্রী জাহাজে ছদ্মবেশে **পি. এন. টেগোর** নাম ব্যবহারে জাপানে পালিয়ে যান।

বসন্ত বিশ্বাস—জন্ম ১৮৯৫, পিতা—মতিলাল বিশ্বাস, মাতা—কুঞ্জবালা বিশ্বাস, পোড়া গাছা—নদীয়া, **ফাঁসি** ১১/৫/১৯১৫।

দ্রষ্টব্য—(১) দিল্লী লাহোর অশান্ত—অমর শহীদ বসন্তমোহন কালী বিশ্বাস, (২) রাসবিহারী বসুর জীবনী, (৩) সন্ত্রাসবাদ—অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, (৪) নীল বিদ্রোহ—দীনবন্ধু মিত্র, (৫) ডাইরী ১ম খণ্ড। আত্মচরিত।

১৯১৫ উড়িষ্যা বুড়াবালাম নদী তীরে কাপ্তিপোতায় সম্মুখ সমর।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৯।১১।১৮৭৭, মৃত্যু, ৫।৯।১৯৩০ গ্রাম নানা জেলা বর্দ্ধমান—এলাহাবাদ কলেজে পড়াশুনা। ১৮৯৬ সালে **যতীন্দর উপাধ্যায়** নাম গ্রহণে বরোদাগাওকোয়াড সৈন্য দলে ভর্তি হইয়া ফৌজি কৌশলে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিবার সময় ১৯০৫ সালে ধরা পড়িলে **শ্রীঅরবিন্দের হস্তক্ষেপে**—কলকাতা সারকুলার রোডে সমিতি স্থাপন করেন – ১৯১৬ (স্বামী) **নিরালম্ব সোহং স্বামীর** নিকট জ্ঞানমার্গ শিক্ষালাভ করেন—এবং সংগঠন-বাদী হিসাবে উত্তর ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান সুদৃঢ় করিয়া ৫।৯।১৯৩০ তারিখে **বরাহনগরে দেহত্যাগ করেন।**

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) জন্ম ১৮৮০ নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম—পিতা উমেশ চন্দ্র মুখার্জী মাতা শরৎশশী দেবী। তাঁহার মামা বসন্ত কুমার কৃষ্ণনগর কোর্টের বড় উকিল—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলকাতায় সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্তি হইয়া বিখ্যাত কুস্তী-গীর **অম্বুগুহের আখড়ায়** যোগদান খালি হাতে বাঘ হত্যা—সর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপরাইটিং শিখিয়া ১৯০০ সালে মজঃফরপুরে কেনেডি সাহেবের অধীন চাকুরী করিরা আসিতে থাকা অবস্থায় চাকুরী পাইয়া কলকাতায় চলিয়া আসেন ১৯০৩ বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত পরিচয়—শিবাজী উৎসবে তরবারি পূজো—হুইলার সাহেবের অধীন ষ্টেনোগ্রাফার—১৯১০ হাওড়া গ্যাং কেশে ধৃত প্রমানাভাবে মুক্ত—১৯১৪ দুইজন পুলিশ ইন্সপেক্টর খুন—বসন্ত চ্যাটার্জীর বাড়ীতে বোমা—জার্মান হইতে মেজারিক জাহাজে অস্ত্র-শস্ত্র আনিবার বন্দোবস্ত করেন।